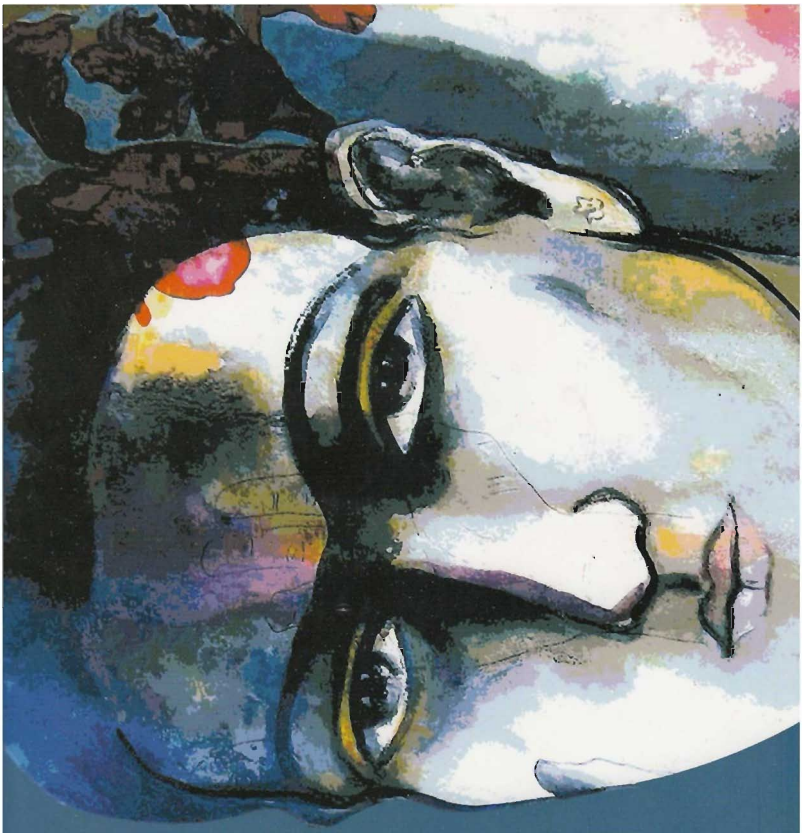

পাহাড় আর নদীর গল্প

তানবীরা তালুকদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

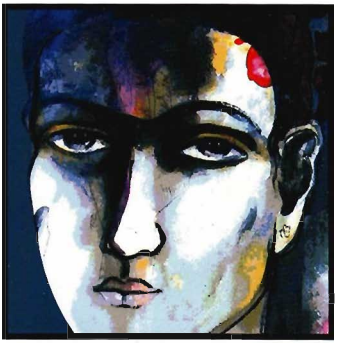

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ব্যক্তিগত উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতা থেকে এই গল্পগুলো লেখা। কিছু গল্প পরিবারের লোকদের মুখ থেকে শোনা, তারা খুব কাছ থেকে ঐ ঘটনাগুলো দেখেছেন, জেনেছেন। প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়ই আলাদা। যখন যা মনকে ছুঁয়ে গেছে, দ্রবীভূত করেছে তাই নিয়েই লেখা। কোন লেখাই খুব ভেবেচিন্তে, রূপরেখা এঁকে, পাঞ্চ লাইন ঠিক করে, লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে লেখা হয়নি। গল্প আপন গতিতে মনে এসেছে, শুরু হয়েছে আবার শেষ হয়েছে।

কিন্তু সব গল্পের একটি জায়গায় মিল আছে। প্রত্যেকটি গল্পই কারো না কারো "জীবন থেকে নেয়া।" নিছক বানানো কিংবা কল্পনাপ্রসূত গল্প নয় এগুলো। এ গল্পগুলো দিনরাত আমাদের চারপাশে ঘটে যাচ্ছে তবে বেশির ভাগই চার দেয়ালের মধ্যে গুমরে মরা কান্নার গল্প। আমার সবসময়ই মনে হয়েছে, আমার চারপাশে এতো সত্যি গল্প ছড়িয়ে আছে যে দুহাত ভরে সেগুলো লিখলেও শেষ হবার নয়। লেখার মান অতি সাধারণ, আমি নিজেও খুব সাধারণ, আবেগপ্রবণ মানুষ। কিন্তু মনে একটা প্রতিজ্ঞা লালন করি, যা লিখবো সত্যি লিখবো। আর সে গল্পগুলোই বেশি লিখবো, যেগুলো মুখ ফুটে কাউকে বলা যায় না কিন্তু যার গ্লানি প্রত্যেকটা মেয়েকে কুরে কুরে খায় সারাটা জীবন, হোক সে দেশি কিংবা বিদেশি।

.....

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তানবীরা তালুকদার, জন্ম ২৯শে আষাঢ়, ঢাকা। আপাতত নেদারল্যান্ডস প্রবাসিনী। কিন্তু দেশের সাথে নাড়ির যোগাযোগ কাটেনি। পেশায় একাউনটেন্ট। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে আছেন। অবসর সময়ে আবৃত্তি, নাচ ও নাটকের পাশাপাশি লেখালেখি করার চেষ্টা করেন। লেখালেখিতে নিছক গল্প নেই; সত্যের ওপর দাঁড়ানো, আর জীবন দিয়ে উপলব্ধি করা অনুভূতি তার লেখার উপজীব্য। ২০১১ সালে ডয়েচে ভেল আয়োজিত 'ববস' সেরা ব্লগ নির্বাচন প্রতিযোগিতায় তার নিজস্ব ব্লগ http://ratjagapakhi.blogspot.nl/ মনোনয়ন পেয়েছিল।

tanbira.talukder@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড় আর নদীর গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তানবীরা তালুকদার

পাহাড় আর নদীর গল্প

জাগৃতি প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড় আর নদীর গল্প

তানবীরা তালুকদার

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক : ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৩২৩০

কার্যালয় : ৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট
২য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৪২১৮

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান

মুদ্রণ : দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা

মূল্য : দুইশত পঁচাত্তর টাকা

ISBN : 978 984 90514 2 8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

'যে আমারে দেখিবারে পায়,
অসীম ক্ষমায়,
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি'–

তার ও তাদের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প সূচি

না বলা কথা	৯
যে কথা	১৪
সেই ছেলে ও মেয়েটির কথা	১৮
বলতে না-পারা গল্পখানি	২৪
কইতে নারি সই	৩৩
একজন সগীরউদ্দিনের দিনকাল	৩৬
প্রেম... ঢাকা স্টাইল	৪৩
মানুষ কি জাত সংসারে?	৫৫
তিনশো টাকা	৫৮
স্মরণ	৬৩
আমাদের মজিদ মিয়া	৬৯
চৌধুরী আলমের গল্পখানা	৭২
ব্রেইন সমস্যা	৮০
কেঁদেছে একেলা	৮২
বকুলকথা	৮৬
এলোমেলো প্রেমের গল্প	৯৬
পলাশ ফুটেছে শিমুল ফুটেছে	১১৬
পাখি আমার নীড়ের পাখি	১২২
নারী দিবসের ব্যস্ততা	১৩৫
অপালার ঘরে ফেরা	১৪৫
পাহাড় আর নদীর গল্প	১৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না বলা গল্প

সব বান্ধবী মিলে কলেজের প্রথম বছরটা হৈ চৈ করে খুব ভালোই কাটালো। কি করে যে সময় কেটে গেলো, নিশিরা বুঝতেই পারলো না। এসএসসির রেজাল্টের আনন্দ, কলেজে আসার আনন্দ, স্কুলগার্ল পরিচয় থেকে মুক্তি পেয়ে বড় হওয়ার আনন্দে বিভোর ছিল সবাই ওরা। এ আনন্দের রেশ কাটতে না-কাটতেই দ্বিতীয় বছরে বেশ কটি দুর্ঘটনা ঘটলো। কলেজে সাতজনের গ্রুপ ওদের, তাদের মধ্যে চারজনই টুপটাপ প্রেমে পড়ে গেলো। আর বাকি দুজনের বিয়ে ঠিক; পরীক্ষার পরই বিয়ে। বান্ধবীদের এহেন কর্মে যারপরনাই বিরক্ত নিশি। তার সাথে দিনভর চৌপর আড্ডা দেয়ার মতো এখন আর কেউ নেই। কলেজে আগে সদলবলে মাস্তানি করে বেড়াতো ওরা আর এখন ধরতে গেলে একদম একা সে। নিশিকে ফোন করার নাম করেই প্রেমিকদের সাথে ফোন করে কথা বলে ওরা, নিশির বাড়ি বেড়াতে যাবার নাম করে প্রেমিকের সাথে ডেটিং-এ যায়। তার আগে ফিসফিস করে বলে নেয়, আমি তোর বাসায় যাবার কথা বলে বেরোচ্ছি, তুই কিন্তু জানিস। বান্ধবীদের প্রেম-পর্ব কারো জন্য এতো অসহ্য হতে পারে কল্পনাও ছিল না নিশির। মেজাজ খারাপ হলেই ঝট করে বলে ফেলা স্বভাবের মেয়ে হলেও এই বিরক্তি তাকে হজম করতে হচ্ছে দিনের পর দিন, ঘরে বাইরে কাউকে সে বলতে পারছে না।

আজকে ঈদের দিনটা খুবই ম্যাড়ম্যাড়ে গেলো; যাকে বলে একেবারে পানসে। এমন পচা ঈদ কখনো করেনি নিশি। বান্ধবীরা সব অন্য বান্ধবীদের বাড়ি যাবার নাম করে যার যার প্রেমিকের সাথে মধুমিলনে ব্যস্ত, যাদের বিয়ে ঠিক, তারা হবু বরের সাথে। কলেজে পড়া মেয়েরা তো আর ঈদের দিনে বাবার হাত ধরে বেড়াতে যায় না! তাই সারাদিন নিশি একা একা বাড়িতেই কাটালো, আত্মীয় স্বজনদের চা-নাস্তা দিয়ে, ছোট ভাইবোনদের আনন্দ ফুর্তি দেখে।

সন্ধ্যেবেলা যখন আব্বু আম্মি ছোট দুইবোনকে নিয়ে বেড়াতে গেলো হঠাৎ বাসাটা একেবারে সুনসান হয়ে গেলো। ভাইয়া গেলো বন্ধুদের সাথে ঈদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পেশাল আড্ডা দিতে। বুয়ারা সব গোল হয়ে টিভিতে ঈদের প্রোগ্রাম দেখছে। টিভির প্রোগ্রাম এতো বোর লাগছিলো যে নিশি উঠে নিজের ঘরে চলে এলো। কি করবে কি করবে বুঝতে না পেরে পড়তে বসাই মনস্থ করল। রোজার পরে পরীক্ষা, এতোদিন এটাই ছিল সান্ত্বনা; রোজা তো বটেই, ঈদও শেষ। এখন আর মনকে ফাঁকি দেয়ার মতো কোনো কারণও নেই।

হেলাফেলা করে বই টানলেও কিছুক্ষণ পর কখন যে পড়ায় মনোযোগ এসে গেলো নিশি নিজেই টের পেলো না। কতোক্ষণ পড়েছিল সে নিজেও জানে না। হঠাৎ পিছনে পিঠের কাছটাতে কেমন যেনো একটু অস্বস্তি লাগলো, মনে হলো কারো উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে পিঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে নিশি তাকাতেই তার চোখ ছানাবড়া। ভাইয়ার বন্ধু আতিক ভাইয়া ঠিক তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়ানো, ঘাড় ঝুঁকিয়ে নিশি কি পড়ছে তাই পিছন থেকে দেখার চেষ্টা করছে।

নিশি তাকাতেই দাঁত কেলিয়ে হেসে বললো আতিক ভাই, ঈদের দিন কি পড়তেছো?

রাগে প্রথমে দিশেহারা হয়ে গেলেও পরে কেমন একটা যেনো ভয় গ্রাস করে নিলো নিশিকে। সারা বাসায় কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এই নচ্ছার জীবনে যা করেনি তাই করে বসেছে। উপস্থিত হয়েছে তার ঘরে। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমে বসার ঘর, তারপর খাওয়ার ঘর, আব্বু আম্মির ঘর। এরপরে লম্বা করিডোর পেরোলে বাড়ির ডান পাশের সবচেয়ে শেষের দুটো ঘরে নিশির চারবোন দাদুর সাথে থাকে। মেয়েদের প্রাইভেসির দরকার বেশি; বাইরের লোক যাতে ঘরে আসতে না-পারে, সেজন্য আব্বু আম্মির এই ব্যবস্থা। বাইরের দিকের ঘরে ভাইয়া থাকেন যাতে ওর বন্ধুরা আসলেও বাসায় প্রাইভেসির কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। সেসব পেরিয়ে আতিক ভাইয়া এই ঘরে ঢুকলো কি করে, নিশির মাথায় সেটাই আসছে না। স্বাভাবিক বুদ্ধি কাজ না-করলেও স্বভাবজাত তেজটা কাজ করলো।

ঝাঁঝিয়ে উঠলো নিশি, আপনি এখানে কি করেন?

পড়ার টেবিলের এক পাশে ড্রয়ার আর অন্যপাশে আতিক ভাই চেয়ারের এতো কাছে দাঁড়ানো যে নিশি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াবে সেই উপায়ও নেই।

ফিঁচলা হাসি দিয়ে সে বললো, কিছু না। তোমার সাথে ঈদের দেখা করতে এসেছি।

কিন্তু আতিক ভাইয়ের চোখ অন্যকথা বলছে। এই চোখ যেকোনো মেয়েই চেনে। চোখের দৃষ্টিতে সাপের আনাগোনা নিশিকে ভয়ে অস্থির করে তুলছে। সাপের হাত থেকে বাঁচার আশায় কোনোরকমে চেয়ারের পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে লাফ দেয় নিশি। দেয়ালের ওপর পড়তে পড়তেই ঘাড় ঘুরিয়ে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে, কাজের ছোট মেয়েটা অবাক বিস্ময়ে নিশির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।

নিশির মরিয়া লাফে কিছুটা দমে গিয়ে আর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আতিক ভাইয়াও দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখলো। তারপর কি ভেবে আস্তে আস্তে পিছু হটে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। যেতে যেতে কাজের মেয়েটাকে বললো, টেবিলে অনেক খাবার দেখলাম। দেখি তো কি কি বানালি ঈদে!

আতিক ভাইয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও নিশির শরীরের কাঁপুনি থামছে না। ভয়ে, অপমানে তার শ্যামলা মুখখানি তখন রক্তবর্ণ। চোখের কোন আপনা থেকেই ভিজে উঠেছে। ভাবছিলো দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ফেলবে, কিন্তু শরীর যেনো পাথর হয়ে গেছে, একটুও নড়তে পারছে না। ঐদিকে সবাই টিভি দেখছে, কেউ এদিকে আসছে না। কাউকে যে বলবে, দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে যা, সে উপায়ও নেই। ভীষণ ভয় লাগছে; আবার যদি এদিকে আসে আতিক ভাইয়া! ভয়ে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু পর দরজা বন্ধের শব্দে নিশি বুঝতে পারলো আতিক ভাইয়া চলে গেছে।

একটু স্থির হয়ে নিজেকে সামলে নিশি ঘর থেকে বেরিয়ে কাজের ছোট মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো কেনো সে আতিক ভাইয়াকে তার ঘরে নিয়ে এলো?

মেয়েটাও হতবিহ্বল এ ঘটনায়। সে বললো সে নিয়ে আসে নাই, দরজা খোলার পর আতিক ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো বাসায় কে আছে, কোথায় আছে। তারপর সে নিজে নিজেই আপনার ঘরের দিকে গেলো।

প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুযন্ত্রণা মনে নিয়ে নিশি অপেক্ষা করতে লাগলো কখন আম্মি আব্বু বাড়ি ফিরবেন। এক একটি মুহূর্তকে তখন এক একটি শতাব্দী মনে হতে লাগলো। না পড়ায়, না টিভিতে– কোনো কাজেই মন লাগাতে পারছে না সে আর। অবশেষে অপেক্ষার পালা ফুরালো, আম্মি আব্বু বাড়ি ফিরলেন।

মাকে কাছে পেয়ে নিশি রাগে দুঃখে হুঙ্কার দিয়ে মায়ের ওপর পড়তেই মা অবস্থা বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি নিশির ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। সব শুনলেন, কেঁদে-কেটে নিশিকে একটু শান্ত হওয়ার সুযোগ দিলেন। তারপর নিশির হাত নিজের হাতে নিয়ে নিশির কাছ থেকে কথা নিলেন যেনো এ ঘটনা নিশি কোনোদিন ভুলেও তার ভাইকে না-জানায়।

মায়ের এ আচরণে হতভম্বের মতো নিশি তার মায়ের দিকে তাকাতেই মা বললেন, ভাইয়া আর নিশি প্রায় সমবয়সী। ভাইয়ারও মাথা গরম। এ ঘটনা ভাইয়া জানতে পারলে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে দলাদলি হবে, তাতে মারামারি হবে, এসব নিয়ে তো কতো ঘটনাই ঘটে। বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন হয়। দিনকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতো খারাপ, চারপাশে কত কি হয়, সে কি পেপারে সেসব পড়ছে না? বোন হয়ে নিশ্চই চায় না তার কারণে অঘটন ঘটুক।

না, তা নিশি চায় না; কিন্তু তাই বলে এত বড়ো অপমানের কোনো প্রতিকার হবে না?

মা আশ্বস্ত করলেন, হবে প্রতিকার হবে। মা তার নিজের মতো করে সমাধান করবেন।

নিশি গুম হয়ে রইলো। কাউকে বলতে পারলোনা একথাটি কোনোদিন। উলটো মা প্রতিকারের এমন ভাব নিলেন এ যেনো নিশির অন্যায়, তার অপরাধ। তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন, শাসন বাড়িয়ে দিলেন, খেয়াল রাখলেন মনের দুঃখেও যেনো নিশি একথা কারো কাছে বলতে না-পারে। নিশিকে সমানে বুঝিয়ে গেলেন, এতে লোকে তাকেই অপবাদ দেবে, ক্ষতি তারই হবে, অন্য কারো নয়। কোন্ অপরাধে সে শাস্তি পাবে বুঝতে না-পেরে নিজের ভিতরে আরো কুঁকড়ে গেলো নিশি। কেউ তার ঘরে অসৎ উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ঢুকে গেলে সে-ই বা কি করতে পারে? কিন্তু তাই বলে সত্যি বলা যাবে না? তাকেই অপমান বইতে হবে? মানসিক শাস্তির মধ্যে দিয়ে অনেক প্রহর কেটেছে তার তখন।

এরপরেও আতিক ভাইয়ার সাথে কতোবার দেখা হয়েছে। দেখা হলেই একটা অকারণ রাগ আক্রোশ মনে মনে কাজ করত, মুখে যদিও কিছুই বলতে পারতো না। প্রতিবার ইচ্ছে করতো শার্টের কলার ধরে, নাকে ঘুষি মেরে জিজ্ঞেস করে, হারামজাদা, তুই আমার ঘরে ঢুকেছিলি কোন্ সাহসে? আরো অনেক কিছুই করতে প্রচণ্ড ইচ্ছে করে-কোনোদিন না করতে পারা অনেক কাজের মতোই এটাও সারাজীবন না-করাই থেকে গেলো। কিন্তু অসংখ্য নির্ঘুম রাতে যতোবারই এ ঘটনাটা মনে পড়েছে, ইচ্ছেমতো আতিক ভাইয়াকে সে শাস্তি দিয়েছে। অনেক অনেক দিন পরে নিশি যখন আরো অনেক বড় হয়েছে, এ ঘটনাটা নিয়ে সে তার মনোজগতে অনেক বিশ্লেষণ চালিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা শুনতে নিরীহ লাগলেও ঘটনাটা যে মোটেও নিরীহ ছিল না সেটা নিশি জানে। কিন্তু নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে কেনো সে এতো ভয় পেলো? নিজের ঘরে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না এতো দুর্বল ভাবছিলো কেনো সে নিজেকে সে মুহূর্তে? মেয়েরা কি তাহলে এতোটাই দুর্বল হয়! আসলে বয়ঃসন্ধির সে সময়টা বড় অচেনা থাকে। নিজেকেই হয়তো ঠিক করে চিনতে পারা যায় না। আবার মা ও সে সময়টাতে নানা কারণে অনেক কড়া শাসনে রাখতেন, যেটা অনেক সময় দ্বিধায় ফেলে দিতো, মনে হতো সত্যি বললেও মা হয়তো বিশ্বাস করবেন না। নিজের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে অনেক সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের শরীরকেই যে জায়গায় শত্রু বলে মনে হয় তখন বাইরের অন্য সবকিছুর কথা না হয় বাদই থাকলো। আজ মনে হয় পাশে মা শক্ত হয়ে পাশে ছায়া দিয়ে দাঁড়ালে, নিজের আত্মবিশ্বাসে এধরনের অনেক সমস্যা মোকাবেলা করা কতো সহজ হয় সে বয়সে! নিজের মেয়ের পাশে তাই সবসময় ছায়া হয়ে থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় নিশি।

২৪.১১.২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কথা যায় না বলা

পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের সূর্যালোক এসে কনার চোখ ছুঁয়ে দিল। অভ্যাসমতো হাত তুলে ঘুম-চোখ রগড়ানোর জন্যে হাত তুলে চোখের কাছে নিতেই কনা তার ভেজা গালটা অনুভব করলো। দশ সেকেন্ড অবাক হয়ে এলোমেলো ভাবতেই মনে পড়লো কাল রাতের কথা। আর সেটা মনে পড়তেই ভোরের সতেজ মনটা মরে সেখানে জায়গা নিলো রাজ্যের বিষণ্নতা। তখনই খেয়াল করলো কনা, সারাটা রাত ঠিক করে শোয়নি সে, এক কোণে পড়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল, কাঁদছিল না, চোখ দিয়ে আপনাতেই জল গড়াচ্ছিল। কখন যে তার মধ্যেই চোখ লেগে গিয়েছিল, টের পায়নি। সারাদিনের রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে শোয়, মনে যতোই দুঃখ থাকুক, কোনো এক মুহূর্তে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি মেলে হাজারো সাংসারিক চিন্তার থেকে। কনা আপ্রাণ চায় শুয়ে পড়ামাত্রই তার দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসুক। মুক্তি মিলুক কুরে কুরে খাওয়া এই ভাবনার বেড়াজাল থেকে। কিন্তু চাইলেই কি ভাবনা থেকে মানুষের মুক্তি মেলে? যে কথা কাউকে বলা যায় না, সে কথার তো মনই আধার। ঘুরে ফিরে সে ভাবনা নিজেকেই কুরে কুরে খায়।

যা বেশির ভাগ মেয়ের কিংবা মানুষের জীবনে স্বাভাবিক, তা তার কাছে কেন অস্বাভাবিক হয়ে ধরা দেয়? অমি প্রায়ই তাকে বলে, তার এ জিনিসটা স্বাভাবিক নয়। অমির কথা শুনতে শুনতে সে প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিল, হয়তো এ ব্যাপারটায় সে কিছুটা অস্বাভাবিক। অমিকে না-জানিয়ে সে একজন ডাক্তারের কাছে কয়েকটা সিটিংও দিয়ে ফেললো। ডাক্তার অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাননি তার মধ্যে। তবে খোলামেলা কিছু উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, ছেলে আর মেয়েদের মানসিক গঠনপ্রণালী একেবারেই ভিন্ন। শারীরিক সম্পর্ক হলো ছেলেদের নিজেদের রিলাক্স করার প্রধান উপায়। আর মেয়েরা চায় ভালোবাসা, আদর। তারা সেটা পেয়ে রিলাক্সড হওয়ার পরই শারীরিক সম্পর্কে যেতে চায়, তার আগে না। কিন্তু কনার বেলায় সেটা কিভাবে সম্ভব? অমির বিয়ে করা স্ত্রী কনা, তার সন্তানের মা। বিশ্বাস, ভালোবাসা সবই এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত। হ্যাঁ, ছোট-খাট মতান্তর ঝগড়া হয়েই থাকে আর সব সাধারণ সংসারের মতো তার সংসারেও, তার বেশি কিছু নয়। তখন ডাক্তার আরো খুঁটিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের খসড়া নিলেন। কনা ব্যস্ত তার অফিস, সংসার, ছেলে নিয়ে। অমি ব্যস্ত তার ব্যবসা নিয়ে। সকাল সকাল বেরিয়ে যায়, ফেরে প্রায় রাত নটা, দশটা। মাঝে মাঝেই তাকে ট্যুরেও বেরোতে হয়। কনা আর ছেলের সাথে দেখা হয়না বললেই চলে। শুধু রাতটুকু অমি বাড়িতে থাকে।

ডাক্তার বেশ আন্তরিকভাবেই ছোট ছোট অনেক বিষয় নিয়ে কনার সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ করলেন। একবার জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, কনার আসলে বাঁধে কোথায়? কেনো সে স্বতঃস্ফূর্ত নয়? অনেকক্ষণ আলাপে কনা তখন ডাক্তারের সাথে অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে। মনের কথা তার বুক পেরিয়ে গলা দিয়ে বেরিয়েই এলো। এই প্রেমহীন দেহের খেলা নিদারুণ ক্লান্তিকর। সে ভালোবাসা চায়, নিজে ভালোবাসতে এবং ভালোবাসা পেতে চায়। সি ওয়ান্টস টু বি লাভড এন্ড নট ওয়ান্ট টু হ্যাভ সেক্স অলওয়েজ। সেটা খুব রুড লাগে তার। স্বামীর যৌনদাসীর অনুভূতি তাকে আজকাল ক্লান্ত করে। মনে হয়, শুধু প্রয়োজনে তাকে কাছে টানা। কনা চায় কেউ তাকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরুক, রাতভর আদর করুক, তার ঘাড়ে নাক ঘষুক; ফিসফিস গল্প করবে তারা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে, অর্থহীন কথায় ভেসে যাবে তাদের সময়। সাথে আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাবে শরীর। দিনভর খিটিমিটি করে রাতে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার রুটিন নিতে নিতে সে পর্যুদস্ত। যেই শারীরিক সম্পর্কে মনের কোনো ছোঁয়া নেই–শুধু দেহ, তাতে কি করে কেউ আনন্দ পেতে পারে? প্রথমে মন মনকে ছুঁবে, তারপরে তো শরীর। স্বামীর সাথে মন দেয়া-নেয়া কোথায় আজ তার? কনার মন কি চায় অমি তা জানেই না, আর অমির চাই কনার কাছে মজাদার রান্না, ইস্ত্রি করা শার্ট, ঝকঝকে তকতকে বিছানা বালিশ গৃহস্থালী।

ডাক্তার হয়তো বুঝতে পারলেন সমস্যা কোথায়। তিনি বললেন, আসলে সারা সপ্তাহ তাদের মধ্যে দেখা না-হতে হতে, স্পর্শবিহীন তাদের শরীরটাও অচেনা হয়ে গেছে দুজনের কাছে। তাই রাতে কনা ছেলেকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লে মাঝে মাঝেই যখন অমি এসে নিজের প্রয়োজনে কনার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে কনার গায়ে হাত রাখে, কনার শরীর নিজের অজান্তেই কুঁকড়ে যায়। তারপর কনা আর ভালোবাসার খেলার সারাটা সময় সহজ হতে পারে না, আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কখন অমি ছাড়বে, সে নিস্তার পাবে। ছেলের কাছে যাবে। এতে অমি ভীষণ রেগে যায়, অপমানিতবোধ করে। বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে ন্যায্য দাবির উপেক্ষা আর অবহেলা তাকে হিংস্র করে। কিন্তু কনার এটা কিছুতেই ইচ্ছে করে না। সে সহজ হতে পারে না তো কি করবে? ডাক্তার কনাকে উপদেশ দিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমি বাড়ি ফিরলে কনা যেনো কিছুটা সময় অমির সাথে কাটায়। দুজনে একসাথে বারান্দায় বসে চা খেতে পারে, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে টিভি দেখতে পারে, কিংবা বিছানায় শুয়ে প্রথমে কিছু নিয়ে গল্প করতে পারে। হয়তো দুজন দুজনকে মেসেজ দিতে পারে। এতে হঠাৎ ছোঁয়ার আড়ষ্টতা কেটে শরীরটা সহজ হয়ে যাবে। দিনের পর দিন স্পর্শ না-পাওয়ায় শরীর যতোটুকু অচেনা হয়ে গেছে, তা কেটে যাবে।

কনা ডাক্তারের উপদেশ শুনে খুব খুশি হয়েছিল, সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছে ভেবে। ভাবল এই বুঝি শান্তি ফিরে এলো সংসারে। প্রথম দিকে সে সেই চেষ্টাও করে দেখলো। কিন্তু অমির সেসব দিকে কোনো মন নেই। সে ক্লান্ত হয়ে ফেরে, খেয়ে-দেয়েই তার নিজের কাজ নিয়ে বসে। বারান্দায় বসে চা খাওয়ার চাইতে, টেবিলে বসে বসে ভাত খাওয়ার সময় সাংসারিক আলাপ সেরে নিতে চায় সে। তারপর সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার ব্যবসায়ের ফোন নিয়ে। বিছানায় শুয়ে গল্প করার চাইতে সে সরাসরি বউয়ের বুকে হাত দিতে অভ্যস্ত। তাই কনার ডাক্তারী পরামর্শ শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসলো না। কনা মিনমিন সুরে একদিন অমিকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে তিক্ত গলায় ধমক দিয়ে অমি ওকে থামিয়ে দিল। এমনিতেই সব ব্যাপারে কনা বইয়ের রেফারেন্স নিয়ে আসে বলে অমি কনার ওপরে যথেষ্ট বিরক্ত থাকে। বেশি বেশি বই পড়ে যে কনার মাথাটা গেছে, সেটা বলতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। আবার বলল, একদিন সময় করে সে কনাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে। কনার নিশ্চয় কোনো শারীরিক সমস্যা আছে। নইলে একটি যুবতী মেয়ে স্বামী-সঙ্গের সময় এতো ঠাণ্ডা আচরণ করতেই পারে না। অমি পঁচিশ বছরের যুবক না, আর কনাও ষোলো বছরের খুকি নয়। এতো ছেঁদো রোমান্টিকতা নিয়ে, বউয়ের সাথে ন্যাকা ন্যাকা প্রেম খেলার সময় নেই তার এখন। ভয়, দ্বিধা কিংবা লজ্জায় কনা আর কিছু বলে উঠতে পারলো না।

অথচ কনাও এতো শান্ত ছিল না সবসময়। ঘুরেফিরে তারও মনে আসে পুরনো সেসব দিনের কথা। অমি যখন পাগলের মতো কাছে চাইতো তাকে। কবে জ্যোৎস্না হবে পত্রিকায় তারিখ দেখে রাখতো। হাত ধরে দুজনে আকাশ দেখতো, জ্যোৎস্না দেখতো। চাঁদের বুকে মাঝে মাঝে অমি কনার আদল খুঁজে পেতো। কনার কোনো সুগন্ধি পাউডার কিংবা পারফিউম মাখা নিষেধ ছিল। অমি বলতো কনার গায়ের গন্ধে নেশা আছে। তাকে চুম্বকের মতো টেনে তা নিয়ে আসে বউয়ের কাছে। অমি শুধু সে গন্ধে মাতাল হতে চায়। সারাদিনের কাজের ফাঁকে সন্ধ্যের প্রতীক্ষা থাকতো। কখন দুজন দুজনকে একান্তে পাবে, নিজের করে। পাছে অন্য কেউ শুনে ফেলে, কিংবা টের পায়, মাঝ রাতে এরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজন বসতো ছাদে। তাই মাঝে মাঝেই কনাকে গলার স্বর নিচু করে গাইতে হতো 'তুমি সন্ধ্যারও মেঘমালা, তুমি আমারও সাধেরও সাধনা'। আবেশে কনার গলায় ঠোঁট ঘষতো অমি, আর সে স্পর্শের কামনার আগুনে কনাও গলে গলে পড়তো। উন্মত্তা হরিণী হয়ে সে-ও অমির সারা শরীরকে প্রতিদিন নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় থাকতো। কতো ছোট ছোট জিনিসে সুখী হতো তারা তখন! একগোছা রজনীগন্ধা, কিংবা একডজন রেশমি চুড়ি। বালিশে ঘুমায়নি বিয়ের পর অনেক দিন কনা। অমির হাত কিংবা বুকই ছিল তার বালিশ। কতো স্বপ্ন ছিল! যতো যাই ঘটুক দুজনের ভালোবাসার মধ্যে কোনো দূরত্ব আসতে দেবে না। কিন্তু কনার অজান্তেই সেই স্পর্শ, সেই কামনা ভরা চোখের দৃষ্টি, সেই ভালোবাসার স্পর্শ হারিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ছেলে ও মেয়েটির কথা

সকালে অফিস আওয়ারে রাস্তায় খুব রাশ থাকে; তাই মেয়েটির ড্রাইভ করতে ইচ্ছে করে না। প্রায়ই পথে কিছু-না-কিছু হয়, অনেকেই সকালের স্ট্রেস নিতে পারেন না, অঘটন ঘটিয়ে ফেলেন, আর ফলাফলে রাস্তা বন্ধ। দেখা যায় মেয়েটি অফিসে অনেক সময় এই কারণে দেরিতে পৌঁছায়। দেরিতে পৌঁছানো মানেই দেরিতে বের হওয়া আর সারাদিনের সবকিছুতে দেরি মানেই মেজাজ খিঁচড়ে দিনভর নিজেকে স্ট্রেস দেয়া। তাই আজকাল সে বাসেই অফিসে যাওয়াটাকে শ্রেয় ভাবে। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আরামে বাসে করে অফিসে যাওয়া। সকালটা শুরু হয় একটু ঢিলেঢালা ভাবে। আরামে মেয়েকে নিয়ে ঘুম থেকে উঠে, বিছানা গুছিয়ে, বাসি কাজ শেষ করে, নাস্তা সেরে রেডি হয়ে মা-মেয়ে একসাথে বের হয় বাড়ি থেকে। আবার ফেরার পথের ড্রাইভিং স্ট্রেস থেকেও বেঁচে যায়। অনেক সময় স্বামী বাড়ি ফেরার পথে মাকে অফিস থেকে আর মেয়েকে ডে-কেয়ার থেকে তুলে বাড়ি ফেরেন, নইলে মেয়েটি বাসে ডে-কেয়ারে পৌঁছে মেয়েকে নিয়ে বেশ গল্প করতে করতে হেঁটে বাড়ি ফেরে।

মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাসে উঠে শুরু হয় মোবাইলে ফেসবুকিং। তাতে বাসযাত্রার বিরক্তিও কাটে আর সারারাতে পৃথিবীর কোথায় কি ঘটলো তার আপডেটও পাওয়া যায়। একই রুটে একই সময় একই বাসে যাতায়াত করলে অনেক সময় এক আধটা মুখ পরিচিত হয়ে যায়। মেয়েটির বেলায় এটা একটু টাফ কারণ বাসে সে সহযাত্রীদের মুখ দেখে না বললেই চলে, সে দেখে ফেসবুক। এরকম এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে বাস থেকে নেমে মেয়েটি নিজের মনে অফিসপানে হাঁটছিল। সহযাত্রী এক কালো যুবক যে কিছুদিন যাবত তার সাথে স্টেশন থেকে অফিস পর্যন্ত যায়। যুবকটি তাকে বললো, নাইস ওয়েদার, হ্যাঁ? আগে হলে ঠিক এমন অপরিচিত সম্ভাষণে মেয়েটির কি প্রতিক্রিয়া হতো, বলা যায় না। কিন্তু আজকাল সব অচেনা লোকের মাঝে বসবাস করতে করতে কিছুই আর গায়ে মাখে না। মেয়েটিও মাথা নেড়ে হেসে তাতে সায় দিল। এরপর প্রায় প্রতিদিনই ছেলেটি টুকটাক কিছু কথা বলার চেষ্টা করতো হাঁটা পথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটিও হ্যাঁ, না টুকটাক জবাব দিত। মায়া লাগতো আহারে, কাছে কেউ নেই, কথা বলতে হয়তো পারে না। এবার জিজ্ঞেস করলো ছেলেটি, কখনো আফ্রিকা গিয়েছো। মেয়েটি মনে মনে ভাবলো আফ্রিকা যে কেউ সাধ করে বেড়াতে যায় সেটাতো জানতাম না এখানে না এলে। তাও ভাগ্যিস আফ্রিকা বলেছে, নিজের নেটিভ কান্ট্রি ইথিওপিয়া বলেনি ছেলেটি। ইথিওপিয়া শুনলেই টিভিতে দেখা ভুখা নাঙা চেহারা চোখে ভেসে ওঠে। নিজে যে বাংলাদেশ থেকে এসেছে, আর এক ভুখা নাঙা দেশের প্রতিনিধি, সে কথা তো আর মনে থাকে না। মুখে একটা সুশীল হাসি ফুটিয়ে বললো, নট ইয়েট, মে বি সাম ডে, হ্যাভ সীন পিকচারস, ভেরি বিউটিফুল ইনডিড। দু-তিন সপ্তাহ, গোনা নেই, এভাবে ওয়েদার আর এশিয়া আফ্রিকা আলোচনার পর একদিন ছেলেটি মেয়েটিকে চট করে জিজ্ঞেস করে বসলো, ডু ইউ মাইন্ড টু হ্যাভ সাম কফি উইথ মি আফটার অফিস? এধরনের একটা প্রস্তাবের কোনো সম্ভাবনা যে থাকতে পারে অপর পক্ষ থেকে, তাই মেয়েটির মাথায় কোনোদিন উঁকি দেয়নি। প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও, মেয়েটি মনে মনে হেসে ফেললো। স্বভাবরসিক মেয়েটি, চট করে ছেলেটিকে একটু নাড়িয়ে দেয়ার লোভ সামলাতে পারলো না। যতোদূর সম্ভব একটি নিষ্পাপ মুখ করে বললো, হোয়াই? উই ক্যান ড্রিঙ্ক কফি এ্যাট অফিস, ফ্রী অভ কস্ট, এজ মাচ এজ উই ওয়ান্ট। ছেলেটি এবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলো মনে হয়। প্রায় অপরিচিত একটা মেয়েকে ডিনারে ডাকা কি ঠিক হবে? তাও ডিনার মানেই টাকা পয়সার ব্যাপার। ছেলেটি চুপ করে রইলো।

ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে স্বভাবের মেয়েটি মনের সুখে একটু হেসে নিল। ডানপিটে স্বভাবের কারণে প্রায় কোনো ছেলেবন্ধুই তাকে ঠিক ভরসা করে উঠতে পারতো না বলে, কখনো একান্ত আমন্ত্রণের ডাক সে পায়নি। যদিও-বা কেউ তাকে কখনো কিছু ইশারা ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে, মেয়েটি তাকে নিয়েই উলটো এমন মজা করেছে যে, সেই ছেলেবন্ধু প্রায় পালিয়ে মান রক্ষা করেছে। তা নিয়ে পরিণত বয়সে তার অবশ্য একটু দুঃখবোধ ছিল। কিন্তু আজ প্রায় চল্লিশের দিকে ধাবিত হওয়া বয়সে তাকে কেউ কফি খেতে বলাতে সে অসাধারণ কৌতুক অনুভব করলো। বাদামি রঙের মানুষের বয়স আন্দাজ করা বেশ কঠিন। মেয়েটিকে এখনো হয়তো কিছুটা বয়স আন্দাজে ছোট দেখায় কিন্তু এই ছেলে যে ত্রিশ পার করেনি তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। কালো তা সেই যতোই কালো হোক, ত্রিশ আর চল্লিশের রয়েছে আলাদা চোখ। মেয়েটির হঠাৎ মনে হলো, ছেলেটি তাকেই কেনো এ প্রস্তাব দিলো? কালো বলে বাদামি চামড়ার প্রতি আকৃষ্টতার কারণে? নাকি বাদামি আর কালো চামড়ার দেশে একা একটি মেয়েকে দেখলে এ ধরনের অভব্য প্রস্তাব দেয়ার রীতি আছে বলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার ইচ্ছে হলো বলে, আমার প্রায় তোমার অর্ধেক বয়সী একটি মেয়ে আছে জানো? পরের মুহূর্তেই আবার ক্ষমা করে দিলো, এতোটা কঠিন হতে ইচ্ছে করলো না, নাম না-জানা সেই কালো যুবকের প্রতি।

আপাততঃ ছেলেটি আর মেয়েটির গল্প এখানেই অসমাপ্ত আছে।

০৯.১০.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিম কাহিনী

এতো যত্ন করে পদ্মিনী মেয়েটাকে, তবুও মেয়েটা দুদিন পর পরই অসুখে ভোগে। কি করে যে ভাল করবে মেয়েটা, ভেবেই পায় না সে। এই ফিরিঙ্গী দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় আজকাল আর সে খুব একটা ভরসাও পায় না। তাই দেশ থেকে কুরিয়ারে ওষুধপত্র আনাচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফি সপ্তায় জ্বর আসছে। স্কুল কামাই হচ্ছে, পড়াশোনার বিরাট ক্ষতি। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত পদ্মিনী। ডাক্তার আজকাল আবার ওষুধের সাথে তাদের প্রাত্যহিক খাবার দাবারে পরিবর্তন আনার উপদেশও দিচ্ছেন। নিরুপায় পদ্মিনী ভাবছে 'ডিম' খাওয়াবে কি না শেষ পর্যন্ত। এমনিতে জয়িতা বেশ সুস্বাস্থ্যের হলেও বারবার জ্বরে পড়ে চোখমুখ বসে গেছে। খুব কাহিলও দেখায় তাকে। সামান্য খেলাধুলাতেই সে হাঁপিয়ে পড়ে, স্কুলের অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে আজকাল আর তাল মেলাতে পারে না।

পরীক্ষার ঠিক মুখে জয়িতা যখন আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল, পদ্মিনী আর সহ্য করতে পারল না। শুদ্ধ নিরামিষী জীবনের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু ঘরে ঠাকুর আছেন, সিদ্ধান্ত নিলেই তো আর সেটার বাস্তবায়ন এতো সোজা না। ঠাকুরকে কি জবাব দিবে? তাই বাজার থেকে ডিম নিয়ে এলেও সেটা বাড়িতে ঢোকালো না। ডিম বাইরে গ্যারেজেই থাকল। অনেক ভেবে ঠিক করলো, গ্যারেজেই একটা ওয়াটার কুকার রেখে দিবে সে। সেখানে ডিম সিদ্ধ করে জয়িতাকে খাইয়ে, বাগানের গাছে পানি দেয়ার কলতলায় মেয়ের গা মুছিয়ে, জামা কাপড় ছাড়িয়ে, নিজেও পবিত্র হয়ে বাড়িতে ঢুকবে। বাড়ি ঢুকে সোজা দোতলায় স্নানের ঘরে চলে যাবে। তাতে অন্তত কিছুটা শুদ্ধতা থাকবে বাড়িতে। বাকিটা ঠাকুর বুঝে নিবেন, তিনি অন্তর্যামী! কি জ্বালায় সে পদ্মিনীকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হলো!

এতো ভেবে এই ফুলপ্রুফ পরিকল্পনা করা হলেও বাধা পড়লো অন্য জায়গা। ডিম সিদ্ধ করে, খোসা ছাড়াতে গিয়ে গা গুলিয়ে বমি লাগতে লাগলো পদ্মিনীর ডিমের গন্ধে। কি করে এখন? নিজের নাকে রুমাল বেঁধে জয়িতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

নিয়ে বসল গ্যারেজে 'ডিম' খাওয়াতে। মায়ের এই নাকে রুমাল বাঁধা চেহারা আর চোখে ডিমের প্রতি এতো ঘৃণার ভাব দেখে জয়িতাও পারছে না ডিম খেতে। তার কেমন যেনো লাগতে লাগলো। মুখে অরুচি নিয়ে দু'কামড় দিয়ে, ওষুধ খাওয়ার মতো এই অপবিত্র জিনিস গিলতে গিয়ে জয়িতা বমি করে দিলো। কি করে পদ্মিনী এখন? ওয়াটার কুকারে আবার পানি গরম করে তার সাথে বাগানের কল থেকে ঠাণ্ডা পানি এনে মিশিয়ে মেয়ের গা গ্যারেজেই স্পঞ্জ করে দিলো। এই ঠাণ্ডা গ্যারেজের মধ্যে গা স্পঞ্জ সাথে সাথে জয়িতার আবার কেঁপে জ্বর এলো। রাতে জ্বর এতোটাই বাড়লো যে জয়িতাকে হাসপাতালে নিতে হলো।

ঠাকুরের আসনে টাকা মানত করে রেখে পদ্মিনী হাসপাতালে ছোটাছুটি করল মেয়ের জন্য। মানতের টাকায় ভগবান নিশ্চয়ই ভুলবেন সেই আশা বুকে রেখে। কদিন পরে জয়িতাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল পদ্মিনী। এখন জয়িতা কিছুটা সুস্থ। বাড়িতেই আছে সে, বিশ্রামে। একা বিছানায় শুয়ে থেকে সে প্রায়ই ভাবে ডিমের মতো একটা অপবিত্র খাবারে ভগবান কেনো এতো ভিটামিন দিয়ে রাখলেন? স্কুলেও কি এই নিয়ে তাকে কম যন্ত্রণায় পড়তে হয়? যখনই স্কুলে ইস্টার লাঞ্চ, কার্নিভ্যাল লাঞ্চ কিংবা এরকমের কিছু থাকে, সে বন্ধুদের টেবলে বসতে পারে না। ক্লাশে টেবিল সাজানো হয় তিনটা। একটা বড় যেটাতে সবাই বসে হৈ-হুল্লোড় করে খায়। আর ছোট ছোট দুটো। একটাতে হালাল খাবার থাকে সেখানে মোহাম্মাদ আর আমিন একা একা বসে খায়। আর একটায় সে একলা খায় স্কুলে মায়ের খুব কড়া নির্দেশ দেয়া আছে, জয়িতারা নির্ভেজাল নিরামিষী। তার খাবারের প্রতি যেনো খেয়াল রাখা হয়। যদিও জয়ির খুবই ইচ্ছে করে বন্ধুদের পাশে বসে হৈ চৈ করে খেতে। কিন্তু সেটা সম্ভব না, ছোঁয়া লেগে যাবে। এসব খাবারও খারাপ, তাদের ছোঁয়াও খারাপ।

এইযে রীতিকা তাদের বাড়িতে আসে। এতো ভালো বন্ধু জয়িতার কিন্তু তারপরও কি তাকে নিয়ে তার কম টেনশান? রীতিকার মা আর জয়িতার মা নিচে বসে গল্প করেন। তাদের মায়েরাও দুজন খুব ভালো বন্ধু। কিন্তু জয়িতাকে তার মায়ের কড়া নির্দেশ দেয়া আছে, ওপরে খেলার সময় রীতিকা যেনো কিছুতেই পূজার ঘরে না যেতে পারে। রীতিকারা কালীমা'র পূজা করে। মাছ খায়, মাংস খায়। মাগো-ভাবলেই জয়ি'র গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু রীতিকাটা অনেক দুষ্টু, ফাঁক পেলেই দৌড় দিয়ে পূজার ঘরে ঢুকে যাবে, যদিও ঠাকুরের আসন ছোঁয় না কিন্তু তাতে কি? ঐ সকড়ি খাওয়া শরীর নিয়ে ঘরে ঢুকলেই তো জয়ি'র মাকে আবার সব শুদ্ধ করতে হয় গঙ্গাজলে। গঙ্গাজল কি আর এখানে পাওয়া যায়? প্রতিবার গরমের ছুটিতে ইন্ডিয়া বেড়াতে গেলে, মা নিয়ে আসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লাস্টিকের বোতলে করে। কতো হ্যাঁপা! এই যে রীতিকার মা আসেন বাড়িতে, চা খান, সেই চায়ের কাপও তো মা সরাসরি রান্নাঘরে নিতে পারেন না। রান্নাঘরে ঠাকুরের ভোগের বাসন ধোয়া হয়, সেখানে কি সকড়ি লোকের ছুঁইয়ে দেয়া কাপ না ধুয়ে নেয়া যায়? মা প্রথমে সেটা টয়লেটে ধুয়ে সাফ করেন একদফা তারপর রান্নাঘরে নিয়ে ডিশওয়াশারে দেন। মাকে কতো বাড়তি খাটতে হয় এদের জন্য। কিন্তু রীতিকা ওর এতো ভালো বন্ধু যে, ও আসলেই জয়িতার মনটা ভালো হয়ে যায়। কেনো সকড়ি খাওয়া কোনো মেয়েকেই ভগবান ওর প্রিয় বন্ধু করলেন সেটাও বুঝে পায় না জয়িতা।

সকড়ি খাওয়া পাপ কিন্তু রীতিকা কি সুস্থ শরীরে স্কুলে যাচ্ছে, বন্ধুদের সাথে মজা করছে। কি করে সম্ভব? স্কুলের বেশির ভাগ বাচ্চাই মাছ-মাংস খায় অথচ তারা সুস্থ থাকে। কিন্তু অসুখ তো আসে পাপ থেকে, তাই না? মা'তো তাই বলেন, 'ভগবানের শাস্তি'। ছোট মনে প্রশ্নগুলো ঘুরতেই থাকে কিন্তু তার জবাব পায় না সে। জবাব খুঁজতে খুঁজতেই মায়ের কথাগুলো বারবার কানে বাজে, 'মাছ-মাংস ছোঁয়াও পাপ, খবরদার ওসবের পাশ দিয়েও হাঁটবে না।' জয়িতা কি সেটা জানে না? ঠিক জানে। তাই তো সেদিকে ফিরেও দেখে না কিন্তু ছোট জয়িতার মনে তবুও অনেক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে না-পারা গল্পখানি

হঠাৎ করে ভীষণ কাছে কোথাও বাংলায় কথা শুনে নিশি আর অয়ন দুজনেই চমকে উঠল, এতো দূরের এই দেশে এতো কাছে প্রিয় বাংলায় কথা। ওরা দুজনেই একসাথে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ওদের খুব কাছেই প্রিন্টেড জর্জেট শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলা আর সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা এক ভদ্রলোক। বাংলায় গল্প করতে করতে তারা হাঁটছেন। যে মুহূর্তে তারা নিশিদের ক্রস করছিলেন, তখনই ওরা তাদের কথা শুনতে পেলো। নিশিদের পেছন থাকায় তারা ঠিকভাবে তাদেরকে দেখতে পায়নি অথবা হয়তো দেখতে পেলেও গা করেনি। আপাতদৃষ্টিতে যুগলটাকে দেখে বেশ প্রীতই হলো অয়নরা। একেবারেই কথা বলা যায় না এমন ক্ষ্যাত টাইপ বাঙালদেশীদের মতো নয়। ভদ্রমহিলার শ্যামলা গায়ের রঙের উপর মোটামুটি গোলগাল মিষ্টি মুখ। একটু মুটিয়ে গেলেও মন্দ নয় দেখতে। ভদ্রলোক কালো গায়ের রঙে, একটু ভুঁড়ি বের করা সুখী সুখী চেহারা। দেশের খোলা প্রান্তর থেকে বিদেশের খাঁচায় এসে আটকে পড়া নিশি বাংলায় কথা শুনে, এবং নিশির কারণে অয়নও আগ্রহী হয়ে ছুটে গেলো আলাপ করতে তাদের সাথে। যেয়ে দেখল ওরাও স্বামী-স্ত্রী দুজন অয়নদেরই মতো ওস্টএন্ডের সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে এসেছে। তবে অয়নরা এসেছে বেশ কিছুটা দূর থেকে আর তারা এই ওস্টএন্ডের কাছেই নামুর শহরে থাকে। ইউরোপের এই পাশটাতে বাঙালি কিংবা বাংলাদেশী এতো কম যে, সমমনা লোক পেয়ে আলাপ জমে উঠতে সময় খুব বেশি লাগলো না। আর এ তো বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকত নয়; এখানে ঝিনুকের মালা কেনা নিয়ে পীড়াপীড়ি করার জন্য নেই কোন সদ্যফোটা কিশোর-মলিন মুখ, নেই ঝালমুড়ি কিংবা বুট-বাদামওয়ালাদের উৎপাত। অখণ্ড অবসরে বিনা বাধায় গল্প চালিয়ে যাও তীর বেগে, কে বাধ সাধছে! গল্পে গল্পে জানা গেলো তারা বেশ কিছুদিন আছেন এখানে, নিশি অয়নদের মতো সদ্য বিবাহিত কিংবা সদ্য বাংলাদেশ থেকে আগত দম্পত্তি নন, বয়সেও তারা বেশ কিছুটা বড়ই ওদের থেকে। সমুদ্রতীর থেকে একটু দূরে ক্যাফে রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে সমুদ্রের তাজা মাছ ভাজা, ফিশ এন্ড চিপস, চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কফি যার যা ইচ্ছে খেতে পারে। ক্যাফেতে বসে কফি খেতে খেতে গল্প হতে লাগল, কথার জোয়ারে দু-পক্ষই ভেসে যেতে লাগল। নিশি আর অয়নের সেদিন ওস্টএন্ডর সমুদ্র দেখা শেষ করে লেক আর ব্রিজের জন্য বিখ্যাত শহর ব্রিজ দেখতে যাওয়ার কথা কিন্তু এখানে বসে গল্প আর আলাপে সে পরিকল্পনা প্রায় ভেস্তে যাওয়ার জোগাড়। নিশি অয়নকে গোপনে চিমটি কেটে একটু তাড়া দিলো, ওদের যাবার কথা শুনেই ফারুক ভাই আর কলি ভাবী ভীষণ চেপে ধরলেন ওদেরকে তাদের বাসায় যেতে। কিন্তু নিশি এতোদিন বিদেশে এসেছে, সেভাবে কোথাও অয়নের সাথে বেড়াতে যেতে পারেনি, অনেক পরিকল্পনা নিয়ে বেরিয়েছে সেদিন। ও অয়নের সাথেই একা ঘুরতে চাইছিলো, যদিও আড্ডা সেও খুব উপভোগ করছিল। নিশির মনের ভাব বুঝতে পেরে অয়ন ওদের বাড়ি যাওয়ার কথা কাটিয়ে দিয়ে ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার আদান-প্রদান করে উঠে পড়ার যোগাড় করলো। সদ্য ছয় মাসের বিয়ে করা তাজা বউয়ের মনের বিপক্ষে যায় এমন সাধ্য খুব কম যুবকেরই আছে। তার উপর বউয়ের অনেক পীড়াপীড়িতে, অয়ন অনেক ডেট ঘুরিয়ে তারপর নিশিকে নিয়ে আজ বাইরে বেরিয়েছে। নিশির প্ল্যানের মতো ঘোরা না-হলে বউ যে আর বাড়ি নিয়ে অয়নকে আস্ত রাখবে না, সে কথা অয়ন ভালোভাবেই জানে। আর কিছু না পারুক কেঁদে কেটে না খেয়ে থাকতে তো পারবে বউ।

সেদিন কলি ভাবী আর ফারুক ভাইদের বাসায় বেড়াতে না গেলেও তারপরে ফোনে আলাপ জমে উঠতে সময় লাগল না। আলাপে ছেলেদের ভূমিকা খুব কমই ছিল। আলাপ চলছিল সপ্তাহে দু/তিন বার করে সাউথ নেদারল্যান্ডস আর প্রায় সাউথ বেলজিয়ামের দুই শহরের-দুই প্রান্তের, দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে। সদ্য দেশ থেকে আসা আনাড়ি নিশি-রান্না-বান্না, কি ঘর-কন্নার কোনো অভিজ্ঞতাই যার নেই, সে তার চেয়ে অভিজ্ঞ এবং মোটামুটি পারদর্শী কারো সাহচর্য পেয়ে একেবারে বর্তে গেলো। তখন কার্ডফোনের এতো রমরমা ব্যবসা ছিল না, ডাইরেক্ট লাইনে লং ডিসটেনস কল নিশিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার হুঁশ হলো মাস শেষে টেলিফোন বিল পেয়ে অয়ন আর্তচিৎকার দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার পর। তবুও নিশির মন পাখি হয়ে রইলো এই আনন্দে যে সুপার মার্কেটে, ডাচ ভাষায় বানান করে সে সুজি কিনে আনতে পেরেছে এবং সূরা-কালাম, আয়াতুল কুরসি পড়ার কষ্ট এবং টেনশান ছাড়াই সহজে ফোন কানে নিয়ে তা দিয়ে হালুয়া বানিয়ে ফেলছে কিংবা বেগুন পুড়িয়ে ভর্তা করে ফেলছে। আগের মতো টেনশান নিয়ে রেঁধে অয়ন আসার আগে আগেই লুকিয়ে সেই কুখাদ্য রান্না আর গারবেজে ফেলে দিতে হচ্ছে না। এ গর্ব কি কম? অয়নের নাক ব্যাকা আর দেখতে হচ্ছে না। যা হোক নিশির ভীষণ আগ্রহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়নরা এবার প্রথম পরিচয়ের প্রায় এক দেড়মাস পরে কলি ভাবিদের বাসায় নামুর বেড়াতে যাচ্ছে। অবশেষে মনের মতো কাউকে বন্ধু পাওয়া গেলো, হোক না বয়সে বড় কিংবা একটু বেশি মেয়েলীপনায় ভর্তি, তাতে কি, একটু ভালো করে গল্প তো করা যায়, আশেপাশের বাঙালি মহিলাগুলোর সাথে তো শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার সুখটাই নেই। যাই হোক, এটা সেটা সব ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে, ঠিকানানুযায়ী ম্যাপ প্রিন্ট করে নিয়ে পুরো উইকএন্ড কাটানোর আনন্দময় পরিকল্পনায় বিভোর নিশি, আর তার পাশে অয়ন চলল শুক্রবার রাতে নামুরের পথে। গাড়িতে জোরে বেজে চলছে অয়নের পছন্দের নজরুল গীতি, আলগা করোগো খোঁপার বাঁধন...। ডিসেম্বরের অন্ধকার শীতে নেদারল্যান্ডসের ফ্ল্যাটে এসে বন্দী হওয়া নিশি এই মধ্য এপ্রিলের সূর্য ওঠা আকাশ আর ভোরের ধান ক্ষেতে লেগে থাকার মতো মিষ্টি রোদ পেয়ে যেন ডানায় ভর করে উড়ছিলো। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ড্রাইভ আর সামান্য খোঁজাখুঁজি করে রাত প্রায় সাড়ে নটার দিকে নামুরে কলি ভাবীদের ফ্ল্যাটের বেল টিপল অয়ন আর নিশি। ওদের দেখে হৈ হৈ করে উঠল কলি ভাবী আর ফারুক ভাই। লম্বা ড্রাইভ আর সারাদিনের কাজের ক্লান্তি ভুলে চলল বেদম আড্ডা আর খাওয়া দাওয়া, রাত প্রায় দুটো-তিনটের দিকে ঘুমাতে গেলো ওরা। পরদিন সকালে বেশ দেরি করেই ঘুম থেকে উঠল সবাই, এরপর নাস্তা খেয়ে সবাই একসাথে 'নামুর' শহরটা ঘুরতে বেরোল। 'নামুর' বেশ সুন্দর পাহাড়ি শহর। সুন্দর সিটি সেন্টার, লেক, ক্যাথিড্র্যাল আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অতুলনীয়। ইউরোপের মোটামুটি সব জায়গাই শীতের তাণ্ডব শেষ হওয়ার পর গাঢ় সবুজের চাদর গায়ে পরে নেয়, সে সবুজ চাদরের গা জুড়ে আছে নানা রঙের ছোট ছোট বুটি তোলা ফুল। যতদূরে চোখ যায়, জুড়িয়ে যায়। পাহাড়ের উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ, আকাশে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া শাদা মেঘের ভেলা, চারপাশে নানা রঙের ফুলের বাহারি পসরা। এখানে সেখানে পাহাড়ের গা থেকে ঝরে পড়ছে ঠাণ্ডা পাহাড়ি ঝরনা। চারধার নিস্তব্ধ, ঝরনার ঝিরঝির শব্দ আর দু-চারটা পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই কোথাও। মনকে ভরিয়ে রাখতে এই ধরনের কোনো পরিবেশের বিকল্প মেলা ভার। সব ক্লান্তি উড়ে তাজা লাগতে থাকে সে সময়টা। নাম না জানা ভালো লাগায় বুঁদ হয়ে থাকে মন। সারাদিন শহরে ঘুরে প্রাণভরে সে সৌন্দর্য চোখে, বুকে নিয়ে অয়নরা বাড়ি ফিরল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে কি করা যায়, সে আলোচনা করছিল। হঠাৎ ঠিক হলো চারজনে মিলে তাস খেলা হোক।

সাথে সাথে সবাই হৈ হৈ করে বসে পড়ল তাস নিয়ে। ছোট গোল ডাইনিং টেবিল ঘিরে বসে পড়ল চারজনে নিজেরাও গোল হয়ে। নিশির একপাশে অয়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একপাশে কলি ভাবী, উলটো পাশে ফারুক ভাই। খেলা চলছে খুব দ্রুত গতিতে, কল ব্রিজ। চার/পাঁচ মাস আগে বাংলাদেশ থেকে আসা নিশির কাছে এই সপ্তাহান্তটাকে স্বপ্নের মতো লাগছে। যৌথ পরিবারে অনেক দিন থাকা নিশি নেদারল্যান্ডসের একা সংসারের ফ্ল্যাটে বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছিল। মনের আনন্দে বাকবাকুম নিশি কলব্রিজে সমস্ত মনোযোগ ঢুকিয়ে খেলছিল। হঠাৎ ফারুক ভাইয়ের পায়ে নিশির পা লেগে গেলো। নিশি কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি তার পা সরিয়ে নিল, হন্তদন্ত হয়ে, 'সরি' বলল। নিশি এটাকে নেহাত দুর্ঘটনা ভেবে আবার খেলছিল। ভাবল ছোট টেবিল সবাই এতো কাছে কাছে বসা তাই হয়তো পায়ে পা লেগে গেছে। কিন্তু একটু পর আবার ফারুক ভাইয়ের পায়ের সাথে নিশির পা লেগে গেলো। এবারও নিশি লজ্জিত হয়ে 'সরি' বলল আর পা অনেক দূর সরিয়ে নিয়ে বেশ সাবধান হয়ে বসল। খেলা, গল্প, আড্ডা, হাসি, চা-কফি চলছিল ধুমসে। প্রায় পনেরো মিনিট পর আবার ফারুক ভাইয়ের পা, আস্তে আস্তে এসে নিশির পা'কে ছুঁলো বেশ সন্তর্পণে। নিশির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হঠাৎ তারস্বরে বেজে উঠল। মনে হলো এ শুধু নিছক দুর্ঘটনা নয়। নিশি পা এমনভাবে সরিয়ে রেখে সজাগ হয়ে বসেছিল যে হঠাৎ পায়ে পা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা এবার খুবই ক্ষীণ ছিল। আকস্মিকতায় স্তব্ধ নিশি আর এতো দ্রুত পা সরিয়ে নিল না। তাসের দিকে চোখ রেখেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েদের যে ঘাড়ে দুটো চোখ থাকে সেই চোখ দিয়ে ফারুক ভাইকে ভিতরে বাইরে ফালা ফালা করে দেখার বোঝার চেষ্টা করছিল নিশি। কিন্তু একি দেখছে নিশি! উনি চূড়ান্ত স্বাভাবিকভাবে অয়নের সাথে খোশ গল্প করছেন, মাঝে মাঝে তার বউয়ের সাথে খুনসুটি করছেন। কোনো বিকার নেই তার, সব যেনো অতি স্বাভাবিক। নিশি এবার আর পা সরিয়ে না নেয়াতে, ফারুক ভাই কি বুঝলেন বোঝা গেলো না, কিন্তু নিশির মনে হলো তার আকর্ণ বিস্তৃত ভালোমানুষীর হাসি যেনো আরো দিগন্ত বিস্তৃত হলো। তার পা নিশির পায়ের পাতা ছাড়িয়ে এখন পায়ের আঙুলে এসে পৌঁছে নানারকম ঢঙের জলতরঙ্গ খেলা শুরু করেছে। নিশি হঠাৎ বোবা হয়ে গেলো, কয়েক মুহূর্তের জন্য। কি করবে ভেবে পেলো না। এখানেও এই!!! এই যে কলি ভাবী আর ফারুক ভাইয়ের সুখী সংসারের ছবি নিশি এতোক্ষণ দেখছিলো তা হঠাৎ ফাঁকা আর অসার লাগলো ওর চোখে। মনে হলো এর সবই মেকী; ঘর সাজানো আর সংসার সাজানো আসলে হয়তো এক কথা নয়। রাগে অপমানে হঠাৎ নিশির মাথাটা ঝা ঝা করতে লাগল। আজীবন ঝট করে রেগে যেয়ে কড়া কিছু বলে ফেলা স্বভাবের নিশি তারপরও অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনি আপনার পা বারবার আমার পায়ে ধাক্কা দিচ্ছেন কেনো'? ফারুক ভাই আর যাই আশা করে থাকুন সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে এই ধাক্কা তিনি নিশির কাছ থেকে আশা করেননি। একটু ধরা পড়া অস্বস্তির গলায় 'সরি' 'সরি' বলে তিনি আপাতত উনার পা সরিয়ে নিলেন। নিশি অগ্নিদৃষ্টিতে অয়নের দিকে তাকালো, দুঃখে-কষ্টে ওর চোখে পানি এসে গেলো, রাগে অপমানে পাগল পাগল লাগছে তখন। সব রাগ যেয়ে সে সময়টা অয়নের উপরই পড়ল। অয়ন তখন একমনে তাস শাফল করে যাচ্ছে, কারো দিকেই তাকাচ্ছে না, এমন ভাব তার, এ পৃথিবীতে কি হচ্ছে তাতে অয়নের অন্তত সে মুহূর্তে কিছু যায় আসে না। নিশি তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হলো কলি ভাবীর প্রতিক্রিয়া দেখে। ভাবীর মুখে একটি রেখাও পড়ল না, হাসিটার রংও একটু বদলালো না। এটা যেনো খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তিনি আগের মতোই গল্প, হাসি চালিয়ে যাচ্ছেন। নিশি আর এই মেকী সব ভদ্রতা নিতে পারল না। হঠাৎ সব ভদ্রতা ত্যাগ করে তাসের টেবিল থেকে উঠে পড়ল, সারাদিনের ক্লান্তি আর মাথা ব্যথার অজুহাত দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো।

এই বেড়ানো হাসি গল্প তখন সব অসহ্য লাগতে শুরু করল। বাড়ি ফেরার জন্য, একটি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল সে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে অয়নের অপেক্ষা করতে লাগল, কখন অয়ন আসবে ঘরে আর ওরা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিবে। আর এক মুহূর্ত এই নোংরা লোকের বাড়িতে নয়। গায়ে এক ধরনের ঘিনঘিন ভাব লাগতে লাগল। এ ঘর থেকে ওঘরের টুকটাক কথা এবং হাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো। অয়ন আসছে না রেগে যাচ্ছিলো নিশি। খোলা জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু এই নিঝুম রাতে আকাশটাকে কালোই বেশি লাগছিলো। কালো আকাশের ক্যানভাসে জ্বলে থাকা তারাগুলোকে হাজার বুটি শাড়ির বুটির মতো মনে হচ্ছিলো। শুয়ে শুয়ে নিশি এলোমেলো অনেক কথা ভেবে যাচ্ছিলো। দেশ থেকে এতো দূরে এতো সুন্দর পরিবেশে থেকেও কেনো মানুষগুলো পরিবর্তন হয় না? কি হলে তাহলে লোকে বদলাবে? হঠাৎ নিজের অজান্তেই অতীতের সেই ক্লাশ নাইনের ক্লাশ রুমে হারিয়ে গেলো সে। প্রায় পঞ্চাশের মতো ছাত্রী ছিলো তারা, তৃতীয় পিরিয়ডে ইংরেজি ক্লাশ নিতে আসতেন বকশী বাবু স্যার। দ্বিতীয় পিরিয়ড শেষ হওয়া মাত্র সব বান্ধবীর মধ্যে একটা ধাক্কাধাক্কি পড়ে যেতো কে দেয়ালের পাশে যেয়ে বসবে, স্যারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এতো গরম ঢাকাতে; পঞ্চাশটা মেয়ের জন্য মাত্র তিনটে ফ্যান ঘুরছে টিম টিম গতিতে, বেশির ভাগ সময় হয়তো লোডশেডিং কিন্তু তাতেও কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই সে সময়ে। গরমে মরে যাই যাই কিন্তু শরীরে কারো কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ চাই না। স্যার ক্লাশে ঘুরে ঘুরে পড়াতেন। ভাবটা এমন যেনো সব্বাইকে সমান এ্যাটেনশন দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তা দিচ্ছেন বটে, তবে এই আন্তরিক এ্যাটেনশনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে সব মেয়ে অস্থির হয়ে থাকতো। কোনোদিন স্যারের সুনজরে অর্থ্যাৎ কুনজরে কে পড়ে যায়। পড়াতে পড়াতে ঘুরতে ঘুরতে যেকোনো একটা টেবিল স্যার পছন্দ করে ফেলবেন। এক এক দিন এক একটা, মেয়েদের বসার যে বেঞ্চি তাতে, মেয়েদের গায়ের বিশেষ অংশের সাথে লাগিয়ে পা তুলে রাখবেন সারাক্ষণ আর পড়াতে পড়াতে মেয়েদের খাতা চেক করার অজুহাতে, মেয়েদের পিঠে হাত দিবেন। কতো আন্তরিক তার ভঙ্গি, কিরে এটা কি লিখেছিস, এটা তো এটা হবে না, সবই বলছেন বটে তবে পিঠের বিশেষ জায়গায় হাত রেখে আর এতো ভুলো মন যেনো স্যারের পিঠ থেকে হাত তো নামাতে ভুলে যেতেনই, বরং হাত পিঠে স্যারের অজান্তেই যেনো নানা ভাবে এ্যাকটিভ হতো। মেয়েদের অনেকেই রাগে ফুঁসতো, গা ঝাড়া দিয়ে কিংবা অন্যভাবে স্যারকে অসন্তোষ জানানোর চেষ্টা করতো। স্যার মেয়েদের অসন্তোষ টের পেয়ে কেমন যেনো মজা পেয়ে অম্লান বদনে ফিক ফিক করে হাসতেন। তাই সব বান্ধবীর মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকতো কে কতো দেয়ালের পাশে সরে বসতে পারে, স্যারের নাগালের থেকে দূরে আরো দূরে। চতুর্থ পিরিয়ডের পর টিফিনের ব্রেক, তখন ক্লাশের মোটামুটি পঞ্চাশখানা মেয়েই একযোগ হয়ে কখনো স্যারের বউয়ের কাছে কিংবা হেড মিসট্রেসের কাছে স্যারের কুকীর্তির বিরবণ দিয়ে চিঠি লিখতো। স্যারের ইমমোরালিটি ও পানিশমেন্টের বিস্তারিত ব্যাখা থাকতো ক্লাশের মেয়েদের তরফ থেকে, রেজেশানসহ। কিন্তু কোনো অজানা কারণে সে চিঠিগুলো কোনোদিনও পোস্ট করা হয়নি। অজানা লজ্জা, ভীরুতা সে বয়সটাকে কাবু করে রাখে মেয়েদের। হয়তো সদ্য কিশোরী বয়সের শারীরিক পরিবর্তনগুলোও এর একটা বড় কারণ। একে তো বিরাট পরিবর্তন নিজের ভিতরেই ঘটে, সাথে পর্দাপ্রথার কারণে 'ঢাকো, ঢাকো, লজ্জা, লজ্জা' জিনিসটা সে বয়সে এতো শুনতে হয় মেয়েদের, দ্বিধায় পড়ে যায় মেয়েরা কি করা আর কি বলা উচিত আর উচিত না সেটা নিয়ে। প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্ত ঘরেই মেয়েদের সব সহ্য করে, মুখ এঁটে, মাটির দিকে তাকিয়ে চলা শেখানো হয়। নিশি ভাবছিলো সেই নিশি মাত্র পাঁচ/ছয় বছরের পার্থক্যে এতো শক্তি কোথা থেকে অর্জন করলো যে মুখের উপর ফারুক ভাইকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারলো? এ ধরনের ঘটনা তো জীবনে প্রথম ঘটল তা তো না। অসংখ্যবার এই অনাকাঙ্ক্ষিত ছোঁয়ার সাক্ষী আছে বাথরুমের আয়নাটা, যেটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশি কেঁদেছে অসংখ্যবার, ব্যর্থ রাগে কষ্টে। যেকোন দুঃখেই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে, জোরে সব কল ছেড়ে দিয়ে তোয়ালেতে মুখ ঢুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা নিশির চিরন্তন অভ্যাস, যাতে অন্য কেউ শব্দ শুনতে না পায়। কান্নার এই মুহূর্তটাকে বড় নিজের করে নিতে চায় সে। কারো উপস্থিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই না তখন, আপন মনে ভিতরের সব ক্লেদাক্তনুভুতিগুলো বের করতে চাই যখন, কাউকে সাক্ষী চাই না সেই গোপন মুহূর্তের। আনন্দের ভাগ সবাই পাবে কিন্তু দুঃখ তার একান্ত একার। অসংখ্যবার গরমের অজুহাতে গোসল করে করে অনাকাঙ্ক্ষিত সব স্পর্শ জলধারা দিয়ে মিটিয়ে দিতে চেয়েছে। যে মা এতো বন্ধু, তাকে না বলে এমন কোনো গোপন কথা নেই, সে মাকেও চেষ্টা করে অনেক সময় অনেক কিছু বলতে পারেনি।

শুয়ে শুয়ে এমনি আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যেনো একটু তন্দ্রামতো এসে গেলো। হঠাৎ একটা শব্দে চোখ মেলে নিশি দেখল অয়ন বিছানায় এসে বসেছে ওর কাছে। নিশি সমস্ত ঘটনা ওকে বলল। যদিও ও নিজেই আন্দাজ করতে পেরেছিলো, কিন্তু অয়ন কিছুতেই এ ব্যাপারটা সামনে আনতে চাচ্ছিলো না। অয়নের কথা যা হবার হয়ে গেছে, কালকের দিনটাই তো কোনো রকমে পার করে দিয়ে হাসি-খুশি ভদ্রতা বজিয়ে রেখে আমরা চলে যাবো। এক্ষুনি চলে যাওয়া ভালো দেখায় না, এটা সামাজিক ভদ্রতাতে পড়ে না। তারচেয়েও বড় কথা ওরা এখানে অনেকদিন আছেন, আমরা মাত্র এসেছি, এ ধরনের কোনো কিছু কেউ জানলে অকারণে নিশিরই বদনাম হবে। কেউ তো আর নিশিকে চেনে না। কি দরকার অহেতুক ঝামেলা বাড়িয়ে। কিন্তু অবুঝ নিশির একই গো চলো এক্ষুনি চলো, এখানে আর এক মুহূর্ত না। অয়নের বোঝানোকে নিশি আরোই উল্টো করে দেখতে লাগল। কেনো ও ওই বদমাশটার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে, কেনো অয়ন যেয়ে ফারুক ভাইকে ডেকে তার এই নোংরা আচরণের কথা জিজ্ঞেস করছে না, কিছু বলছে না। এ সমস্ত তর্ক-বিতর্কে অনেক সময় চলে গেলো। যে রাত অনেক আদর, সোহাগ, আর প্রেমে কাটার কথা ছিল সে রাত কাটল কান্নায়, অভিমানে, ঝগড়ায়। অয়ন কিছুতেই এটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলো না আর নিশি অবুঝের মতো তা নিয়ে ওর সাথে যুঝেই যাচ্ছিলো। অয়ন বারবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যা বলার তুমি তো বলেছ এবং যথেষ্ট ভালোই বলেছো, এর চেয়ে বেশি কিছু আর বলার দরকার নেই, আর অয়নের এতে জড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, নিশি তো একা হ্যান্ডেল করেছেই ব্যাপারটা। আর নিশির কথা হলো তুমি আমার স্বামী, আমার দায়িত্ব তোমারও, তুমি কি করে এমন একটা বড় ব্যাপার এড়িয়ে যেতে পারো? তোমার সামনেই তোমার বউকে এতো বড়ো অপমান আর তুমি বলছো তোমার জড়ানো উচিত নয়? অয়ন কিছুটা নিশিকে বুঝতে পারলেও নিশি পুরোপুরিই অয়নের ভিউ বুঝতে অপারগ সে সময়ে। সদ্য একুশে পা দেয়া নিশির মনে তখনও ইউনিভার্সিটির রেশ পুরোদমে। বন্ধুদের সাথে ভার্সিটির মাঠে বসে, টিএসসিতে বসে পৃথিবীকে বদলে দেয়ার, হেন করেঙ্গা, তেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেঙ্গার ঝাঁঝ তখনও ওর সারা চোখ জুড়ে। কিন্তু নিশির কান্নাকাটি আর অবুঝপনায় না পেরে অয়ন শেষ পর্যন্ত বলল ঠিক আছে, অফিসের কাজ আছে বলে কাল ব্রেকফাস্ট করেই আমরা রওয়ানা দিয়ে দিব, সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকার পরিকল্পনা বাদ। তুমি আমি দুজনেই সাবধানে থাকবো, আর যেনো এধরনের কিছু না ঘটে। এতে নিশি আপাতত একটু ঠাণ্ডা হলো। এর মধ্যে একটু বউকে খোঁচা দিতেও ভুলল না অয়ন, এখানে আসার জন্য তো ব্যস্ত ছিলে তুমিই, আমি তো আসতে বলিনি। আসতেও দেরি নেই আবার চলে যাওয়ার জন্য অস্থির হতেও দেরি নেই। আরো নানা রকমের মিষ্টি ভালো কথা বলে সাত/আট মাসের নব পরিণীতা স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করল অয়ন।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই রওয়ানা দেবে ভেবে রাখলেও দেখা গেলো অনেক রাতে শুয়েছে বলে সকালে ঘুম থেকে উঠতে উঠতেই বেলা বারোটায় গড়িয়ে গেলো। তারপর নাস্তা সেরে ওরা রওয়ানা দেবার তোড়জোড় করতেই কলি ভাবী একদম তেড়ে মেড়ে আসলেন। উনি আজকে ওদের জন্য মাছ রাঁধবেন, সব রেডী, না খেয়ে ওরা কিছুতেই আসতে পারবে না। থাক অফিসের কাজ, রাতে যেয়ে করলেই হবে ইত্যাদি। এর মধ্যেই অয়ন কাউকে ফোন করেছিলো, অয়নের কথা শেষ হওয়ার পর তারা নিশিকে চাইলো। নিশি গেলো করিডোরে ফোন ধরতে। হয়তো খুব জোর কথা বললে ফোনে আট থেকে দশ মিনিট কথা বলেছে, সেই আট-দশ মিনিটে দেখা গেলো ফারুক ভাইয়ের রান্নাঘরে ভীষণ কাজ পড়ে গেছে। তিনি সেই অপ্রশস্ত করিডোর দিয়ে নিশির গায়ের সাথে গা ঘেঁষিয়ে ঘেঁষিয়ে বার বার রান্নাঘর আর তার বেডরুম করে যাচ্ছেন। সমস্ত বাড়িতে আর কোনো কাজ নেই, সে সময় সব কাজ সেই আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোরে। নিশির মনে সে সময় আরো ক্রুর প্রতিক্রিয়া হলো। ভাবলো এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না, কিছু একটা সাজা তাকে পেতেই হবে। যে ভাবা সে কাজ। মনে মনে পরিকল্পনা এঁটে নিশি ফোন ছেড়ে রান্নায় সাহায্য করার উছিলায় রান্নাঘরে যেয়ে দরজা ভিজিয়ে দিয়ে কলি ভাবীর সাথে গল্প আরম্ভ করে দিলো। এ কথা সে কথা, এ গল্প সে গল্পের বাহানা করে নিশি বারেই বারেই ফারুক ভাইয়ের এই ছ্যাচড়া স্বভাবের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিলো কলি ভাবীকে কিন্তু তিনি নির্বিকার। ভাবী কিছুই যেনো গায়ে মাখছেন না, তিনি কিছুই বুঝতে চাইছেন না। তখন নিশির কেনো যেনো মনে হলো ভাবী আসলে তার স্বামীর এ স্বভাবের কথা জানেন। মেয়েরাই সবচেয়ে প্রথম তাদের স্বামীর দুর্বলতা টের পায়। বোকা নিশির কাছে কেমন যেনো এ অঙ্কটা গোলমেলে ঠেকলো তখন। বাস্তব বুদ্ধি ছাড়া শুধু বই পড়া নিশির জ্ঞানেরও অসাধ্য এরকম কিছু ভাবা। সব জেনে শুনেই ভাবী ফারুক ভাইয়ের সাথে আছেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাতদৃষ্টিতে ধরতে গেলে একপ্রকার সুখেই জীবনযাপন করছেন। মুখ দেখে তো সব সময় মনের কথা টের পাওয়া যায় না। এধরনের মেনে নেয়ার ঘটনা শুধু বাংলাদেশের যেসব মেয়েদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাদের বেলাই চলে বলে ওর ধারণা ছিল। এই প্রথম বিশ্বে যেখানে মেয়েদেরকে রক্ষা করার জন্য অনেক অনেক আইন আছে, টাকা-পয়সা দেয়ার জন্য সরকার আছেন, না, সমস্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন, চাকুরি খুঁজে দেয়া, দরকার হলে চাকুরির জন্য বিনা পয়সায় স্কুলিং দেয়া থেকে শুরু করে অসুখ বিসুখ, সব সরকার দেখবে তাহলে কেনো একটা সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে একটা দুশ্চরিত্রের সাথে পড়ে থাকবে তা ওর বোধগম্য হলো না। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সর্বোপরি বিশ্বাসই যে সম্পর্কের ভিত্তি, সেটাই যদি না থাকলো তাহলে এই ইমারত দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপরে? অনেক অবাক বিস্ময় আর প্রশ্নভর্তি মন নিয়ে সদা উচ্ছল নিশি খুব চুপচাপ বাড়ি ফিরে এলো। সে বয়সে জীবনের অনেক জটিলতাই ছিল তার অজানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কইতে নারি সই

ঘুমের মধ্যে বার বার মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে বালিশে, একটা কিসের যেনো ছটফটানি, ঘেমে যাচ্ছে সুমনা। তৃষ্ণায় বুকটা শুকিয়ে জিহ্বা পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে আছে। কি যেনো একটা স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে যা নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না কিন্তু ঘুমের মধ্যেই মনে মনে ওর একটা অনুভূতি হচ্ছে যে সুখকর কোনো স্বপ্ন এটা নয়। সারা শরীর শক্ত হয়ে আছে, নড়তে চড়তে পারছে না। অস্বস্তিতে ধড়ফড় করতে করতে ঘুম ভেঙে গেলো সুমনার। মুখের মধ্যে একটা ভীষণ তেতো স্বাদ, গা টা গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছে। এমনিতেই যখন ওর পীযুষের সাথে দেখা করার কথা থাকে টেনশনে কদিন আগে থেকেই ও ঘুমাতে পারে না, খেতে পারে না। অতিরিক্ত আনন্দ থেকে কেমন যেনো ঘোরের মধ্যে চলে যায়, অচেনা একটা ভয় লাগতে থাকে। সারাক্ষণ মনে হয় এই বুঝি সবার কাছে ধরা পড়ে গেলো, সবাই যেনো ওকে সন্দেহের চোখে দেখছে। বুঝে ফেলছে কেনো সুমনা এতো চঞ্চল, গোপন খুশিটি এবার ধরা পড়ে যাবে। যদিও সুমনা আনন্দ লুকিয়ে সবার সাথে প্রচণ্ড স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে, যেমন রোজ কলেজে যায় তেমন কলেজেই যাচ্ছে আজ ভাবটা ধরে রাখে, আজ কোনো বিশেষ দিন নয়, বিশেষ কেউ আসার কথা নয় তার কাছে সেই মুখোভাবটা প্রচণ্ড ভাবেই ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আজকের অনুভূতিটা সেরকম সুখ মাখানো কষ্টানুভূতি নয়। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, যেনো মাথার শিরা সব এখুনি ফেটে রক্ত পড়বে। মাথা তুলে বসতে পারছে না এতো ভার লাগছে উপরের অংশটাকে। কাতর গলায় আর না পেরে মাকে ডাকল, মা ও মা, শুনে যাও, শুনছো?

মা তখন সবে ঘুম থেকে উঠে স্নিগ্ধ ভোরের আমেজ গায়ে মেখে রোজকার সকালের প্রাত্যহিক কাজের তদারকি করছেন। কারো ঘুমের যাতে অসুবিধে না হয় সেজন্য মা প্রায় নিঃশব্দ পায়ে চলাফেলা করলেও তার চলাফেরার একটা মৃদু মিষ্টি আওয়াজ সুমনা ঘুম থেকে রোজই টের পায়। ভোরের দিকে ঘুমটা হালকা হয়ে আসে, সামান্য, সে যতো সামান্যই হোক, নড়াচড়া অনুভব করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। কিন্তু ভোরের আলসেমী গায়ে মেখে সুমনা বেশির ভাগ সময়ই শুয়ে থাকে, ওঠে না বেলা না-চড়লে। এতো ভোরে সুমনার গলা পেয়ে অবাক হয়ে মা সুমনার কাছে এলেন। এসেই আঁতকে উঠে বললেন, কি হয়েছেরে তোর? চোখ-মুখ এমন লাল কেনো? সুমনা বলল, বুঝতে পারছি না তো মা। মা এসে কপালে হাত রাখলেন। প্রায় অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, একি, গা তো দেখি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কি করে হলো? ক্লান্ত গলায় সুমনা বলল, জানি না। একগ্লাস পানি দাও না, মা বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। মা পানি এনে সুমনাকে খাইয়ে আদর করে কপালে হাত বুলিয়ে শুইয়ে দিতে যেয়ে আবার চিৎকার করলেন একি রে, কপালে এটা কি? সুমনারও কি রকম একটা অস্বস্তি মতো লাগছিল ব্যথা ব্যথা কপালে, কিন্তু এতো আলসেমী লাগছিল যে হাত দিয়ে সেটা ধরে দেখার ইচ্ছেও করছিল না। মা বুঝে গেলেন সুমনার পক্স হয়েছে। বললেন, নাস্তা বানিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে থাকো, কোথাও যেতে হবে না কদিন। পড়া, কোচিং সব বন্ধ। বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ শোনা মাত্র সুমনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। আজ তাকে যে-কোরেই হোক বেরোতেই হবে, তারপর তিন মাস না-বেরোলেও চলবে। কিন্তু সে কথা তো আর মাকে বলা যায় না। তাই সে সমানে মাকে বলে যাচ্ছে, এমনিতেই একটু গা টা গরম হয়েছে, জ্বর টর কিছু নয় তো। সে দিব্যি ভালো আছে। মা বেশি ভাবছে ওকে নিয়ে, আজ কোচিংএ স্যার জরুরি কিছু পড়াবেন, কিছুতেই তা মিস করা যাবে না। কিন্তু মা অভিজ্ঞ চোখে দেখে বললেন, তোর জামাটা ওপরে তোল তো দেখি পেটটা একটু। জামা উপরে তুলতেই দেখা গেলো পেটের মধ্যে তিনটে, চারটে পানিওয়ালা বড় বল হাসি মুখে সুমনার দিকে তাকিয়ে আছে। মা নিশ্চিত করে দিয়ে গেলেন যে পক্সই হয়েছে, নট নড়ন-চড়ন, এই অবস্থায়।

পাড়ার কোচিংএ পড়তে যেয়ে পীযুষের সাথে আলাপ সুমনার। যদিও কথা বলতে তেমন কিছুই হয়নি কখনও তার সাথে, শুধু দূরে থেকেই দুজন দুজনকে দেখেছে। চোখে চোখ রাখার বাইরে আলাপ বেশি দূর এগোয়নি তখনও। কিন্তু একদিন সুমনা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল পীযুষ না আসলে পড়ায় মন বসছে না সুমনার। বার বার দরজার দিকে চোখ চলে যায় এই বুঝি এলো, এই বুঝি এলো। পরে আর থাকতে না পেরে বন্ধুদের জিজ্ঞেসই করে ফেলতো পীযুষ এলো না আজ? পীযুষেরও প্রায় সেরকমই অবস্থা। দুপক্ষের ইচ্ছায় মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেলো অতি দ্রুত। আস্তে আস্তে পড়া শেষ করে খুব ভালো রেজাল্ট করে পীযুষ বড় শহরে পড়তে চলে গেলো। আর রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হওয়ায় ভালো রেজাল্ট করা সত্ত্বেও সুমনার বাইরে যাওয়া হয়নি পড়তে। এখানেই নিজের শহরে সুমনা রয়ে গেলো। যোগাযোগ বলতে চিঠি আর মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে লুকিয়ে ফোন। আগে যেখানে রোজ দেখা হতো সেটা এখন কখনো সখনোতে পৌঁছে গেছে। অথচ সারাদিন সুমনা তার ভাবনাতেই ব্যাকুল থাকে। তার দিন যায় রাত যায় পীযুষের কথা ভেবে ভেবেই। এমনিতে সময়গুলোকে কি অসহ্য লম্বা লাগতে থাকে সারাবেলা সারাক্ষণ, কিন্তু যে একবেলা পীযুষের সাথে সুমনার দেখা হয় সেই সময়টা যেনো হাওয়ায় ভর দিয়ে পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে থাকে। চোখের পলক ফেলার আগে, পীযুষের বুকে মাথা গুঁজে দুদণ্ড নিশ্বাস নেয়ার আগেই শেষ ঘন্টি বেজে ওঠে। সুমনা কতো কি ভেবে রাখে পীযুষ এলে কি বলবে, কোন গল্পটা এখনও ওকে করা হয়নি কিন্তু পীযুষ সামনে এলে ও সব ভুলে যায়। আনন্দে সুমনার মাথাটাই এলোমেলো হয়ে যায়, স্বাভাবিক বুদ্ধিটাও কাজ করে না তখন যেনো।

সেই ভীষণ প্রতীক্ষিত সময়ে পক্সের কথা শুনে সুমনা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। সুমনার কান্না দেখে বাড়ির সবাই অবাক। সবাই ভাবছে সুমনা বুঝি পক্সের জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছে। সুমনা গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের তুলনায় বেশ সুন্দরী। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের থেকে বেশ লম্বা, ছিপছিপে একহারা গড়নের, গোলগাল মিষ্টি পান পাতা মুখের ফর্সা সুমনার সুন্দরী হিসেবে পাড়াময় খ্যাতি আছে। বাড়ির লোকেরা ভাবছে, পক্স হয়েছে, মুখে দাগ পড়বে, সৌন্দর্য নষ্ট হবে সেই দুঃখে বুঝি সুমনা কেঁদে যাচ্ছে, কিন্তু সুমনা কাউকে কি করে বলে আজ পাক্কা তিনটি মাস পর পীযুষ বাড়ি আসছে, সুমনার সাথে দেখা করতে। সবাই জানে পীযুষ ওর বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে বাড়ি আসছে কিন্তু সুমনা তো জানে কার জন্য পীযুষ এতো ঝক্কি নিয়ে বাড়ি আসছে, তিন তিনটি মাস দেখা হয়নি দুজনার। আবার চলে যেতে হবে তাকে আজ রাতের ট্রেনেই। আজ চলে গেলে আবার কতোদিন দেখা হবে না দুজনার। সবাই সান্ত্বনা দিচ্ছে, কাঁদিস না, পক্সের দাগ থাকে না, নখ দিয়ে না খুঁটলেই চলে যাবে দেখিস কদিনের মধ্যেই। আবার ওকে নিশ্চিত করার জন্য অব্যর্থ উপকারী সব ওষুধের নাম করছে, ডাবের পানি দিয়ে মুখ ধুলেই পক্সের দাগ থাকে না কিংবা বেসন এর উপকারিতা অনেক ইত্যাদি ইত্যাদি। সুমনা না পারছে কইতে, না পারছে সইতে। কাউকে বলতে না পেরে আরো জোরে জোরে কাঁদতে লাগল, ওদিকে পীযুষ যে তার অপেক্ষায় তাদের সেই প্রিয় বড় বড় জারুল গাছের ছায়া দিয়ে ঢাকা জায়গাটাতে, নদীর পাশটাতে উচাটন মন নিয়ে বসে আছে গো...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন সগীরউদ্দিনের দিনকাল

চারপাশ নিঃশব্দ, সন্ধ্যে না-হতেই ঝুপ করে কেমন যেনো রাত নেমে গেলো। রাত মাত্র নটা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেনো কতো গভীর। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আজকাল আর আশেপাশে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। ভয়ে জোনাকিগুলোও আলো জ্বালে না। মনে হলো কাছেই কোথাও ফুটল কিছু ঠুস ঠুস শব্দে। সামান্য শব্দেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সারাদিন একরকম যায় বটে কিন্তু সন্ধ্যে হলেই কেমন যেনো এক নাম না জানা মৃত্যুর আতঙ্ক ঘিরে থাকে সবাইকে। মুখে কেউ প্রকাশ করে না বটে কিন্তু সবার মনেই একই ভাবনা থাকে আজকের রাত ভোর হয়ে আগামী দিনের সূর্য দেখতে পাবো তো? সগীরউদ্দিন ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন আজকাল সারাবেলা। রাত গভীর হলে খুব কম আওয়াজ দিয়ে রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সর্বশেষ খবরটা জানার চেষ্টা করেন কি হচ্ছে বাংলাদেশ, থুক্কু পূর্ব পাকিস্তানে? এসব বিচ্ছু পোলাপানগুলা যা শুরু করেছে না। তিনি নির্বিরোধী সাধারণ মানুষ। কারো সাতে পাঁচে থাকেন না, অকারণ ঝামেলা তার সহ্য হয় না। কতোগুলা পোলাপান শেখের সাথে জিকির তুলছে স্বাধীনতা চাই স্বাধীনতা, আরে চাইলেই হলো? এটা কি মুখের কথা? এখন বুঝ ঠ্যালা। পাকিস্তানি আর্মি হলো ট্রেনিং প্রাপ্ত বিশ্বের সেরা দু-একটা আর্মির মধ্যে একটা, আরে শালার হিন্দু মালাউন ইন্ডিয়ারে ঘোল খাওয়াইয়া ছেড়ে দেয়, আর এরা তো অসংগঠিত, ট্রেনিং ছাড়া, কিছু আবেগী হুজুগে পোলাপান। পাকিস্তানের সাথে এখন আবার জড়িত হচ্ছে মার্কিন মুল্লুকের সপ্তবহর, সোজা কথা তো না। বাঘের লেজ দিয়ে কান চুলকানোর মজা টের পাবে, তবে তারা ছাড়বে, হু বাবা।

তবে তার মনে যাই থাকুক তিনি মুখে তা কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তিনি সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা, নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। অফিসে অবশ্য কিছু স্বাধীন বাংলার লোকজন আছে, ফিসফাসে বাংলাদেশ-বাংলাদেশ, শেখ মুজিব শেখ মুজিব করে কিন্তু তিনি তাদের সযতনে এড়িয়ে চলেন। নিয়ম করে অফিস যান, কাজ করেন, মাসের শেষে বেতন নেন। এই তার দেশের প্রতি সেবা বলে তিনি জানেন ও মানেন। তার তো এসব ঝামেলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়ালে চলবে না। বাপজান তাকে কতো কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তিনি সংসারে সকলের বড়। তার নিচে আরো ছয় ভাইবোন আছে। এতোদিনে মাত্র এক বোনের বিয়ে দিলেন তিনি। বর্ষা-গরম, জল-কাদা ভেঙে তিন মাইল রাস্তা রোজ হেঁটে পাশের গ্রামের স্কুলে যেয়ে পড়াশোনা করেছেন কি তিনি এই করার জন্য? দশ বিঘা ধানের জমি, আর তারা এতোগুলো লোক! মানি বংশের সম্মান বাঁচিয়ে কতো কষ্টে বাপজান সব ম্যানেজ করেছেন তা তিনি নিজের চোখে কি দেখেননি? বাপজান এখন বৃদ্ধ, তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আর তিনি নিজে ভালো করে পড়াশোনা করেছেন, দশগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করে ভালো ফলাফল করেছেন বলেই-না মীর্জা বাড়ির মতো বাড়িতে বিয়ে করতে পারলেন। সাধারণ কোনো ছেলে কি পারে?

সারা ঢাকা জুড়ে থমথমে ভাব। কখন কি হয় তা কেউ বলতে পারে না। নির্দোষ লোকজনদেরকেও আজকাল আর পাকিস্তানি মিলিটারিরা রেহাই দিচ্ছে না। ঘর থেকে বেরোনোর সময় তিনি নিয়ম করে আয়াতুল কুরসি পড়ে, বুকে ফুঁ দিয়ে পাক সাফ হয়ে বেরোন কিন্তু আজকাল আর আয়াতুল কুরসির উপর ভরসা রাখতে পারছেন না। শহরের যা পরিস্থিতি তাতে অনেকেই তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কোথাও তেমন নিরাপত্তা না-থাকলেও, গ্রামের দিকটা আজকাল অপেক্ষাকৃত শান্ত। তিনিও ভাবছেন তার তিন বছরের পুত্রসন্তানসুদ্ধ স্ত্রীকে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়ার কথা। তার শ্বশুরবাড়িতে সুযোগ-সুবিধা ভালো। মেয়েদের গোসল-বাথরুমের ভালো পর্দা ব্যবস্থা আছে, সেখানে তাদের তেমন কষ্ট হবে না। তিনি একা মানুষ, শহরের বাড়িতে কোনো রকম চালিয়ে নিবেন। গণ্ডগোল থেমে গেলে আবার তাদের নিয়ে আসবেন। শেখ সাহেবের উপড় তিনি চরম বিরক্ত, প্রথমে স্বায়ত্বশাসন চায় আর এখন স্বাধীনতা চায়। আরে বাঙালি কি সেই জাতি? মাথার উপর ডাণ্ডা মারার কেউ না-থাকলে এরা কখনই সিধা থাকে না। সাথে যোগ হয়েছে নেহরুর বেটী ইন্দিরা। সগীরউদ্দিন সব বুঝতে পারেন, হিন্দুদের সব চক্রান্ত। মুসলমানদের উন্নতি ইন্দিরা গান্ধীর সহ্য হবে কেনো? আর স্বাধীন বাংলা বেতার না কি একটা যোগ হয়েছে আজকাল! কোথাকার সব ভুয়া খবর দিয়ে বিচ্ছুগুলোকে আরো উসকায়। পাকিস্তানি আর্মিদের মারবে বাঙালি ছেলে ছোকড়ারা, এও কি সম্ভব? যদি হয় পাঁচ তাকে পঞ্চান্ন বানানো বাঙালি জাতিকে কি তিনি চিনেন না? কিন্তু তিনি সব ঝামেলা নীরবে এড়িয়ে চলেন।

আজ সগীরউদ্দিন সাহেবে বড়ই আনন্দের দিন। নিজের মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবে আজ তিনি অবসর নিচ্ছেন। নাহ, স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে তার মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আর বিশেষ খেদ নেই। স্বাধীন বাংলাদেশ তার নিষ্ঠার মূল্য দিয়েছে। যুদ্ধের সময় তার ঊর্ধ্বর্তন পাক অফিসারের সাথে তার আলাদা খাতির কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি তার অবহেলা উন্নাসিক আচরণের জন্য তাকে কোনো দায়ই মেটাতে হয়নি। কেউ সেগুলো নিয়ে তাকে বিব্রত করেনি। প্রথমে কিছু দিন অবশ্য ভয়ে ভয়ে থাকলেও খুব শীঘ্র সেই ভয় তার কেটে গেছে। শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমাই শুধু ঘোষণা করেননি, তার ঊর্ধ্বর্তন পাক অফিসার চলে যাওয়াতে সেই শূন্য পদে তাকে অগ্রীম প্রমোশোন দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। বাংলাদেশ হওয়াতে তার বরং ভালোই হয়েছে। ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারলেন। পাকিরা থাকলে তো এতো তাড়াতাড়ি অটো প্রমোশোন হতো না। মনে মনে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে থাকতেই পারেন তাতে কি? তিনি তো আর কাউকে খুন করেননি এমনকি কোনো খুন খারাবিতে সাহায্যও করেননি, তাহলে? তিনি এখনও বিশ্বাস করেন মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। ইসলামের জন্মের পর থেকে শয়তান এর পিছে লেগে আছে। যারা মুসলিম উম্মাহ, ব্রাদারহুডের শত্রু, তারা দেশের শত্রু, ইসলামেরও শত্রু। সমস্ত কিছুর বিনিময়ে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে এক থাকতে হবে।

জীবন বা কর্ম নিয়ে তার কোনো খেদ নেই। যথেষ্ট করেছেন তিনি এক জীবনে। বাবা-মায়ের জন্য গ্রামের বাড়িতে একতলা বিল্ডিং করে দিয়েছেন আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে। ইলেকট্রিসিটি, লাইট-ফ্যান কিছুই বাদ রাখেননি। গ্রামের লোক বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যায় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ছেলে বটে সগীরউদ্দিন, কি করেনি বাবা মায়ের জন্য? সুদূর মক্কায় আল্লাহর ঘর পর্যন্ত দেখিয়ে এনেছে বাবা-মাকে। তবে সগীরউদ্দিন আদর্শ লোক, গ্রামের সন্ত ান হয়ে গ্রামের জন্য তিনি কিছু করবেন না, তা কি হয়? স্বয়ং মন্ত্রী সাহেবের সাথে কথা-বার্তা পাকা করে গ্রামে একটি স্কুল করিয়েছেন, গ্রামের রাস্তা পাকা করিয়েছেন বলেই আজকাল গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায় একটানে। গ্রামের ছেলেদের তার মতো তিন মাইল রাস্তা ভেঙে পাশের গ্রামে পড়তে যেতে হয় না। আজকাল গ্রামে শিক্ষিত ছেলের হারও তাই বেশি। সবই তো তার জন্যেই। কিন্তু এগুলো করতে যেয়ে সগীরউদ্দিন নিজের ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার অবহেলা করেননি। ছেলে-মেয়েদের ভালো স্কুলে পড়িয়েছেন তিনি, বাসায় ভালো টিউটর দিয়ে ভালো গাইড করিয়েছেন। সব ছেলেমেয়ে তার এক একটি রত্ন মাশাল্লাহ। বড় ছেলে তারই মতো মেধাবী। বুয়েটের শেষ বর্ষে আছে, তারপরই বাইরে চলে যাবে। স্কলারশিপও ঠিক করাই আছে, এখন এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, তার অন্য কলিগের ছেলের সাথে বিয়ে এক রকম পাকা করাই আছে। পিএইচডি করতে ছেলে বাইরে গেছে, ফিরলেই শুভকাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাধা করে দিবেন। ছোট ছেলে-মেয়ে বাকি দুজনও ভালো ছাত্র-ছাত্রী, তাদের রাস্তাও মোটামুটি তৈরি করাই আছে, সময়ের সাথে সাথে তাদেরও প্রতিষ্ঠা করে দিবেন। চিন্তা নেই, গোছানোই আছে তার সব কিছু। চাকরির সাথে সাথে জীবন গুছিয়ে নিয়েছেন। বড় ছেলে বাইরে যাচ্ছে, তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন দ্বীনের পথে থাকবা, আল্লাহকে স্মরণ রাখবা, তাকে ভুলবা না। তুমি তাকে স্মরণ করলে তিনিও তোমাকে নজরে রাখবেন।

বড় ছেলেও বাবার মতোই আদর্শ ছেলে হয়েছেন। সব সময় সমস্ত ঝুট-ঝামেলা থেকে দূরে দূরে থেকেছেন। তার সাথে পড়া কতো মেধাবী ছেলে কতো রকম ঝামেলায় জড়িয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করল তা কি সে নিজের চোখে দেখেনি? সেসব দেখেই আরো সাবধান হয়েছেন। কিছুতেই কোনো ঝামেলায় জড়াবেন না তিনি। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়েছে, কতো সহপাঠী বন্ধুর লাশ রাস্তায় পড়েছে কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত কোনো মিছিল তো দূরের কথা, কোন মিটিংএ-ও যাননি পড়া নষ্ট করে। কি দরকার বাবা এসবের? দুটো মিছিল করলে আর হরতাল করে কয়টা গাড়ি পোড়ালেই দেশের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তারচেয়ে ভালো করে পড়াশোনা কর, বিদেশে চলে যা, নিজের উন্নতি কর, না তা না আছে শুধু ভেজালের তালে। সাধারণ পোলাপান মরে মরুক, তাতে কি আসে যায়, কিন্তু বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা কেনো এসবে জড়ায় আজও তিনি তা বুঝতে পারেন না। তারা হলেন দেশের সম্পদ, দেশের ভবিষ্যৎ। তদুপরি ছাত্রদের কাজ হলো পড়াশোনা করা, ছাত্রদের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে কে বলেছে? দেশের কি হলো, আরে ব্যাটা তাতে তোদের কি? স্বৈরাচার থাকুক আর আমের আচার থাকুক, আমাদের কি? আমাদের তো খাওয়া পরায় তো কোনো সমস্যা নেই। দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে, যতো সব কথা, কেউ কি দেখেছে নিজের চোখে, আর টাকা থাকলে পাঠাবে না বিদেশে?

এসব কথা বার্তা তার একদম দুচোখের বিষ যাকে বলে।

পিএইচডি করতে বিদেশে আছেন। কিন্তু সব সময় তিনি সতর্ক। তার ডিপার্টমেন্টে কিছু ইন্ডিয়ান ছেলে আছে তার মধ্যে আবার তো দুজন একদম বাঙালি। তাহলেও, খুঁটে খুঁটে ইলিশ মাছ খায়, তাদের সাথে তার বনবে না। সেদিন মাংস কিনতে যেয়ে এক পাকিস্তানি ফ্যামিলির সাথে আলাপ হয়ে তার খুবই ভালো লাগলো। এই নাছাড়ার দেশে এমন ঈমানদার পরিবারের সাথে যোগাযোগ হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সব হালাল খান তারা। যদিও বাত চিত করতে একটু সমস্যা হয় কিন্তু তাতে কি? মদ খাওয়া, শুয়োর খাওয়া হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালিদের থেকে তো ভালো। ঈমান ঠিক থাকবে। তাদের সাথে যেয়ে তিনি মসজিদ চিনে এলেন। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এরকম আল্লাহর ঘর দেখলে মনটা অন্যরকম এক শান্তিতে ভরে যায়। তবে আজকাল বাংলাদেশীদের মধ্যেও সেই ঈমানের জোর দেখা যায় না। এই যে সেদিন এক ছেলের সাথে সিটি সেন্টারে পরিচয় হলো, যাওয়ার সময় বলে 'খোদা হাফেজ', আরে 'খোদা হাফেজ' কি, বল "আল্লাহ হাফেজ"। "খোদা" আর "আল্লাহ" কি এক হলো? দুনিয়াদারী করতে যেয়ে আখিরাতকে ভুলে গেলে চলবে? দেশ থেকে সগীরউদ্দিন ছেলেকে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিটাগাং এর ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরিবারের সুন্দরী, সুশীলা, ধার্মিক পাত্রীর সাথে তার বিয়ে ঠিক করেছেন। ছুটি নিয়ে তাকে দেশে যেতে বলেছেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। ছেলের মামা মানে সগীরউদ্দিনের শালার মাধ্যমে এ বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। মেয়ের বাবা ব্যবসায়ের সূত্রে তার বহুদিনের পরিচিত। মেয়ে পক্ষও এমন উচ্চ শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র পেয়ে যার পর নাই বিগলিত।

বিগলিত হবেনই-না বা কেনো? ছেলে একদম আদর্শ-বিশ্বস্ত। কোনো ঝামেলায় নেই, নিজের কাজ নিয়ে আছেন। তারা খোঁজ নিয়ে জেনেছেন কোনো ধরনের রাজনৈতিক দল তো দূরের কথা, দেশের বন্যা-খরায় কিংবা স্বাধীনতা দিবসের যে প্রসেশন হয় বিদেশে তাতেও ছেলে যায় না। তার গন্তব্যস্থল অফিস আর বাড়ি। তার সময় কোথায় নষ্ট করার? প্রবাসে যেয়ে কতো ছেলে নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হৃদয়ে বাংলাদেশ করতে থাকে, বন্যা-খরা কিংবা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় শো ডাউন করে, চাঁদা তুলে, বিদেশীদের ধরে দেন দরবার করে, কিন্তু এই ছেলে একদম খাঁটি সোনা, এ সমস্ত ফালতু কাজে সে নেই। বাংলাদেশের সংবাদপত্র পড়ার সময়ও তার হয় না, সে সময়টাতে ইউনিভার্সিটির কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখলে ক্যারিয়ারের কাজ দিবে।

আজকাল সগীরউদ্দিন চোখে ভালো দেখতে পান না। বড়োই আফসোস হয় তার। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তার বড় ছেলের বিভিন্ন লেখা ছাপা হয়। এমন সৌভাগ্য কজন পিতার হয়? ছেলে তার মস্ত কৃতী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে দাওয়াত করে নিয়ে যাওয়া হয় দেশ-বিদেশে, তার পেপার শোনার জন্যে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তার ছেলেকে কথা বলতে হয়। বিশ্বের দরবারে ছেলে তার আজ বাংলাদেশকে উপস্থাপন করছে। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা তাদের বাসায় তার ছেলেকে নিয়মিত আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। ছেলে এখন তারই মতো দেশ ও দশের উপকারে লাগছে। চোখে ভালো দেখতে না-পারলেও কানে এখনও ভালো শুনতে পান। বিবিসি কিংবা ভোয়া থেকে মাঝে মধ্যে যখন তার ছেলের কথা শোনেন তার বুকটা জুড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। আর এমনিতে সগীরউদ্দিন সারাদিন ইবাদত বন্দেগীতেই সময় কাটান। দ্বীন ধর্মের বই পড়েন, টিভিতে জাকির নায়েকের বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখেন। কি সাংঘাতিক ঠাসা ঠাসা উত্তর দেন তিনি সব্বাইকে। শুনে তার মতো নিরীহ লোকেরও শরীরের রক্ত চনমন করে ওঠে। দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ওয়াজের কথা তার মনে পড়ে যায়, তার বাপজান শুনতো। এরকম একটা ধার্মিক, নূরানী লোককে নিয়ে যখন কিছু কুফরী লোকজন আলতু ফালতু কথা বলে, মনে হয় তখন তাদের কানের নিচে থাবড়া দিয়ে বয়রা বানিয়ে দেন। আরে এরকম একটা আলেম লোককে নিয়ে যে ফালতু বকিস, নাউজুবিল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ, আখেরাতের ডর নাই তোদের কলিজায়, মরতে হবে না? এরকম একজন আল্লাহ উল্লাহ ব্যাক্তি যখন স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন তখন তো তিনি কিছু বুঝেই করেছিলেন, নাকি না? তারা কি নিজের থেকে কিছু করেন, তারা হলেন আল্লাহর খাস লোক, আল্লাহর ওলি, তারা চলেন তার ইশারায়।

শুধু বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ। আছেটা কি এই দেশে? পুরো তো হিন্দু বানিয়ে ছাড়ছে। হিন্দুদের মতো নাচ-গান, পহেলা বৈশাখ, শহীদ মিনারে ফুল, কবরে ফুল, সব বেদাতী কাণ্ড কারখানা। আজ যদি পাকিস্তানের সাথে থাকতাম পারতো আমাদের উপর বন্যার পানি ছাড়তে? আজকে আমরাও পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা বানানোর গৌরবের অংশীদার হতে পারতাম কিংবা ক্রিকেটের। বাংলাদেশ হয়ে পেলি টা কি? বিএসএফের গুল্লি আর ফারাক্কা বাঁধ। বাঙালির নির্বুদ্ধিতায় যারপর নাই বিরক্ত সগীরউদ্দিন। অলি-আউলাদের নিয়ে সমালোচনা।

যৌবন কালে বাপজানের সাথে তিনিও যেতেন 'তেনার' ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠানে। আহা কি সেই অনুভূতি, তা কি ভোলার? কি সেই নূরানী চেহারা, গাল ভরা দাড়ি। যেনো সাক্ষাৎ রাসুল (সাঃ) এর প্রতিনিধি তিনি। জ্যোতি বের হয় দাড়ি আর চোখ দিয়ে। তার সেই গমগম করে ওঠা ভরাট গলার স্বর। তিনি যখন মিহি সুরে নারীরা যে দুনিয়ার অধঃপতনের কারণ, গন্ধম খাইয়ে সেই প্রথম মানব আদমকে কাত করে শুরু করেছে, আজো তা বিভিন্ন ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে বর্ণনা করতেন, চোখে পানি এসে যেতো। আহা! শয়তান নারী রূপ ধারণ করে মুসল্লী ভাইদের আশে পাশেই সর্বনাশ হয়ে ঘুর ঘুর করছে। বেগানা বেপর্দা নারীদের থেকে সব সময় সাবধান করে দিতেন। বেপর্দা নারীরা নাভীর নীচে শাড়ি পড়ে কিভাবে তাদের সুরত-সারত প্রদর্শন করে সরলমতি পুরুষদেরকে জেনার পথে, দোজখের পথে নিয়ে যায় তার বর্ণনা করতেন নিখুঁতভাবে। এই যে পৃথিবীর সবাই জানে সগীরউদ্দিন এতো নিরীহ, তারও শরীরের রক্ত চনমন করে উঠতো ওয়াজ শুনে। এই ওয়াজ শুনেই না তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন তার স্ত্রীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্দা পুশিদায় থাকতে হবে, বাইরে যাওয়া, বেগানা পুরুষের সাথে মেশা, কাজ করা চলবে না। ছেলের বিয়ের পর ছেলেকেও বলে দিয়েছেন, বাবা, বউকে বউ করে রাখবা, বাইরে বের করবা না। নারী হলো পরিবারের অলঙ্কার। তাকে পরিধান করে, আবার তাকে বাক্সেই রাখবা। হুমম তিনি আজ গর্ব করে বলতে পারেন, সারা জীবন বিদেশ করা ছেলে আর তার বউ তার কথার বাইরে যায়নি। দুজনেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, বউমা মাথায় হিজাব পড়ে, হালাল খাবার খায়। বউমা চাকরি বাকরি করার কথা ভুলেও ভাবেনি। অথচ কতো ভালো রেজাল্ট করা মেয়ে সে। ভাবলেই বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে।

(কিছু সগীরউদ্দিনের গল্প এভাবে শেষ হয় আর কিছু কিছুদের একটু অন্যভাবে)

সগীরউদ্দিন ভাবছেন ছেলে-মেয়েরা কেউ কাছে নেই, সবাই যার যার মতো ব্যস্ত। অবসর জীবনটা বাগানের কুমড়া আর পুঁইশাকের তদারকি করে কতো কাটাবেন। আজকাল তাই সগীরউদ্দিন ঘন ঘন গ্রামে যাচ্ছেন, এলাকার হাওয়া বাতাস বোঝার চেষ্টা করছেন। ইলেকশন আসছে, দু-একটা রাজনৈতিক দলের সাথে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়ে আছে। চূড়ান্ত কথা তিনিই দেননি, যাদের বাজার ভালো, ঠিক সময়ে তাদের দলে টুপ করে ভিড়ে যাবেন। জুম্মাবারে জুম্মাবারে গ্রামের মসজিদে সবার সাথে এক কাতারে নামায আদায় করেন। এলাকাবাসী, গ্রামবাসীর সাথে ইসলামী চাল-চলন, রীতি-নীতি, রাসুল্লুল্লাহর সুন্নত নিয়ে আলোচনা হয়। দেশের কিছু মানুষের বেদাতী কাজ কারবারের কারণে যে দেশের উন্নতি হচ্ছে না, আল্লাহর খাস রহমত আসমান থেকে আসতে গিয়ে মাঝ পথে আটকে যাচ্ছে, গজব এসে পড়ছে সেই আলোচনাও হয়। সহজ সরল গ্রামবাসী তার মুখ থেকে জ্ঞানের বাণী পেয়ে যার পর নাই চরম আনন্দিত। এতোদিন তেমন গ্রামমুখী না-হলেও তাদের খোঁজ খবর সেভাবে না-করলেও এখন ঘরের সওয়াল ঘরে ফিরে আসছে। কিভাবে এলাকার উন্নয়ন করা হবে সবাই মিলে সেই পরিকল্পনাও আঁকা হয়। আসলে আগে কেউ এই গ্রামের লোক সরকারে ছিল না বলে এলাকার দিকে গ্রামের দিকে অন্যরা তাকায় নাই। সবাই নিজ নিজ লোকের দিকেই তাকায়। এলাকার উন্নয়নের জন্য চাই নিজের লোক ঘরের লোক, সেটা তিনি এখন সবাইকে বুঝিয়েছেন। এলাকার বাতাস ভালো, তার নিজস্ব লোকজন তাকে খবর দিয়েছে। সগীরউদ্দিন ভাবছেন এখন কোনো দলের হয়ে খেলবেন।

সগীরউদ্দিনের দিনকাল এখন এরকম সুখেই কাটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম... ঢাকা স্টাইল

কঙ্কাদের বাড়িতে আজ দারুণ হৈচৈ চলছে, 'সীমা' পালিয়েছে। এতোদিন ধরে চোখে চোখে রেখেও কোনো লাভ হলো না কঙ্কার মায়ের। পাখি শেষ পর্যন্ত ফুড়ুৎ করে উড়েই গেলো। এখন কি করে তাই নিয়ে সবাই দিশেহারা। 'সীমা' কঙ্কার মায়ের বাপের বাড়ির দেশ থেকে আনা লোক। সীমার বাবা মা ভাই বোন যাকে বলে সীমাদের পরিবারের সবাই কোনো-না-কোনো ভাবে কঙ্কার মায়ের বাপের বাড়ির কারো-না-কারো কাছে আছে। অনেক দিনের সম্পর্ক তাদের সাথে, তাই ব্যাপারটাকে অবহেলা করার জো-ও নেই কঙ্কাদের পরিবারের। এক গ্রামের লোক, হোক গরীব, কিন্তু এক গ্রামের তো। গ্রামে যদি কথা রটে কঙ্কাদের বাসায় থেকে সীমার সর্বনাশ হয়েছে, তাহলে আর গ্রামে মুখ দেখানো যাবে না, সবাই ছি ছি করবে। গ্রামে তো আর শত্রুর অভাব নেই। তাছাড়া ভবিষ্যতে আবার লোকের দরকার হলে কথাটা বারবার উঠবে। আজকাল গার্মেন্টস আর গ্রামীণ ব্যাংক হয়ে তো পোয়া বারো। হয় বাড়ি বসে বসে হাঁস মুরগী পালবে, নয় ঢাকা এসে চাকুরি করবে কিন্তু ঝিগিরি আজকাল আর কেউ করতে চায় না। বিশ্বস্ত লোক পাওয়া তো আজকাল সোনার হরিণের মতো দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। কঙ্কার মা একবার তার বড় ভাইকে মোবাইলে ফোন দিচ্ছে তো আর একবার মেজ বোনকে। দিশেহারা অবস্থা উনার। বাবা পেপার মুখে নিয়ে ভয়ঙ্কর মেজাজ করে বসে আছেন। নিজেদের এমনিতেই শত ঝামেলা, তারমধ্যে এসব উটকো ঝামেলা কারই-বা পছন্দ হয়। নিজের হাজার কাজ ছেড়ে এখন কঙ্কার বাবাকে উটকো গৃহকর্মীর সমস্যা নিয়ে বাড়ি বসে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। খোলামেলা কিছু আলোচনাও করতে পারছেন না, যা করছেন সব ফিসফিসিয়ে, মান-সম্মানের ব্যাপার, বাড়িতে অন্য লোক আছে, তারা না আবার পাঁচ কান করে ব্যাপারটা। পুলিশে খবর দেয়া উচিত কিনা সেটা নিয়েও ভাবছেন, কথা বলছেন। পুলিশে খবর দিলে একদিকে যেমন বদনামের ভয়, অন্যদিকে আবার খবর না দিলে আর ভয়ঙ্কর কিছু অঘটন ঘটে গেলে পুলিশ তো তাদেরকেই ধরবে। সীমার মা-বাবাকে খবরটা দিবে কিনা সেটা নিয়েও কথা হচ্ছে। খবর পেলেই তারা হয়তো ছুটে এসে কান্নাকাটি করে একটা সীনক্রিয়েট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে, তাদেরকে তো আর বোঝানো যাবে না যে এতে কঙ্কাদের বাড়ির কারো দোষ বা হাত ছিল না, তাদের মেয়েই এজন্য দায়ী। তারা হয়তো তখন বলবেন যেখান থেকে পারো আমাদের মেয়ে এনে দাও। কঙ্কার মাও রাগে সমানে গজগজ করে যাচ্ছেন, প্রেশার হাই হয়ে যাচ্ছে উনার, উফফ সীমাকে পেলে... ফাজিল মেয়ের প্রেম করার সাধ আহ্লাদ একেবারে ঘুচিয়ে দেয়া যেতো।

ইট কাঠ পাথরে ঘেরা কঠিন শহর এই ঢাকা। এখানে কঠিন যান্ত্রিক জীবনের যাঁতাকলে পিষে মানুষের বেঁচে থাকাই দায়। তার মধ্যে আবার প্রেম? সে তো ধরতে গেলে অনেকটাই দূরের ব্যাপার, বড় লোকদের ফ্যাশন যাকে বলা চলে। ভোর সকালে সূর্য মামা উঁকি দেয়ার সন্ধিক্ষণ থেকে জেগে উঠে এই শহর ফেরীওয়ালাদের হাঁক ডাকে আর সেই নিশুতি রাত অব্দি জেগেই থাকে। একেবারে ঘুমায় না কখনই। রাত গভীর হলে হয়ত শহরের কোলাহল কমে কিন্তু দু-একটি নিশিকন্যার আনাগোনা, কোনো কাজে বাইরে আটকে পড়া লোকজনের গাড়ির হর্ন লেগেই থাকে। বড় নিষ্ঠুর শহর এই ঢাকা। এখানে কেউ কারো নয়। ছদ্মবেশী খুনী, প্রতারক আর ভেজালে ভরা। এই শহরে মানুষকে বিশ্বাস করা অনেক কঠিন, মানুষকে ঠকিয়ে খাওয়ার জন্য মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে মুখোশ পরে, নিষ্ঠুরতা আর প্রলোভনের ফাঁদ চতুর্দিকে। যন্ত্রদানব কোনো দিকে না তাকিয়ে যেমন এক নিমেষে একজনকে পিষে ফেলে পেছনে না তাকিয়ে চলে যায় তেমনি মৌ-লোভী নারীদেহ পিয়াসী দানবেরও অভাব নেই এই শহরে। সুযোগ মতো কতো নিষ্পাপ নিরীহ মেয়েকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে, সর্বনাশ করে কেটে পড়ে। তবে এই শহরের লোক সবাই বেশ চালাক, কেউ ঠকতে চায় না, কোনো কিছু কিনতে গেলে প্রথমে সেটা যাচাই করে নেয়, ভেজাল নয়তো আবার! দোকানদাররা আম থেকে শুরু মাছের কানকো-সব রঙ দিয়ে মনোরম করে রাখে যাতে উপরটা পরিপাটি থাকে। নিয়তির পরিহাসে ভেজাল লোকে আসল খোঁজে খাবারের খোঁজে, কাপড়ের খোঁজে, ঔষধের খোঁজে, আসল ভেজাল যে জায়গায় সেখানে তো কেউ হাত দেয় না। ভেজাল তো বাসা বেঁধে আছে মানুষের অন্তরে, অন্যকে ঠকিয়ে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, লক্ষ্যে। এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও কিছু মানুষ তবু প্রেমে পড়ে, কোনো দুর্বল মুহূর্তে কাউকে বিশ্বাস করে ফেলে। কতো অদ্ভুত পরিবেশে একজনের সাথে একজনের দেখা হয়ে যায়, কোন একক্ষণে ভালোও লেগে যায়, মনের লেন-দেন হয়ে যায় হয়তো নিজেরই অজান্তেই। তারপর এক এক জনের তৈরি হয় এক এক কাহিনী। কারোটা সুখের আবার কারোটা কষ্টের। শহরের বাড়িগুলো, রাস্তাগুলো জড়িয়ে আছে এমন অনেক নাম জানা কাহিনীর সাতপাঁকে। কিন্তু মায়াবতী ঢাকার রাস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

া সবার গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে, তাই পথ চলা পথিকেরা কখনই ঘটে যাওয়া সেইসব কাহিনীর খোঁজ পায় না। আর তাছাড়া দ্রুত পায়ে হেঁটে যাওয়া ব্যস্ত পথিকদের অতো সময়ই-বা কোথায় দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে অজানা অচেনা লোকের কাহিনী শোনার?

মধ্যবিত্ত ঢাকার ফ্ল্যাট বাড়িগুলো আজকাল বড্ড একটার উপর একটা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা তো আজকাল রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে যতোটা পারছে পাশের বাড়ির গাঁ ঘেঁষে নিজের বাড়িটি তৈরি করছে। সবুজের ছোঁয়া বলতে গেলে আজকাল শুধু বারান্দার টব আর ছাদের বাগানেই আছে। বাড়ির সামনের একফালি বাগানের স্থান আজ গাড়ির গ্যারেজে কিংবা কনফেকশনারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এক বাড়ির জানালা দিয়ে অন্য বাড়ির শোবার ঘর পর্যন্ত দেখা যায়, প্রাইভেসী ব্যাপারটা মহাদুর্লভ প্রায়। কোন্ বাড়িতে কোন্ বেলা কি রান্না হচ্ছে, কোথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হচ্ছে–পাড়া সুদ্ধ লোক জানতে পারে, নিজস্ব বলে আর কিছু নেই। আলো বাতাস চলাচলের সমস্যা, ছোট বাচ্চারা যারা বেড়ে উঠছে তাদের জন্য এ ধরনের পরিবেশ কতো অস্বাস্থ্যকর, সেই ভাবনা কারো মাথায় খেলে বলে তো মনে হয় না। এসব নিয়ে কঙ্কাদের পাশের বাড়ির সাথে রাগারাগি হয়েছে কঙ্কার বাবা-মায়ের আর ভাইয়ের। কঙ্কাদের বাড়ির একদম ধরতে গেলে গা ঘেঁষেই তারা তাদের বাড়ি তুলছেন যাতে কঙ্কাদের বাড়ির সবার ভীষণ আপত্তি। প্রাইভেসী, আলো বাতাস সব নিয়েই তাদের সাথে কথা হয়েছে, কিন্তু তারা নাচার। কোনো কিছু নিয়ে জোরও করা যায় না, পাড়ার সব মাস্তান বাহিনী তাদের হাতে, আজকাল যারা বাড়ি তৈরি করেন প্রথমেই সেই পাড়ার মাস্তানদের হাত করে নেন। কার মনে কি আছে, কখন কিসের থেকে কি হয়, কে জানে এসব ভেবে আপাতত চুপ কঙ্কার বাবা-মা। ছেলে-মেয়ের জীবন, ভবিষ্যতের থেকে তো বাড়িঘর বড় নয় তাদের কাছে। তাই মুখে কিছু না বললেও পাশের বাড়ির প্রতি কঙ্কাদের এখন নন কোপারেশন মুভমেন্ট চলছে সব ব্যাপারে। এ সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়েই পাশের বাড়ির একতলার ছাদ ঢালাই দেয়া হলো। ছাদে মিস্ত্রিরা আসা-যাওয়া করতে লাগল এবং কঙ্কাদের বাড়ির ভেতর উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো। কাঁহাতক আর এই গরমের মধ্যে প্রাইভেসীর জন্য সারা বাড়ির দরজা জানালা লাগিয়ে বসে থাকা যায়। এরমধ্যে লোডশেডিং তো আছেই। পর্দা টানলেও বাতাসের নড়াচাড়ায় এবং লোকজনের হাঁটাচলায় সবসময় তো এক জায়গায় থাকেও না।

এ সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই কঙ্কাদের বাসায় থাকা কিশোরী মেয়ে 'সীমা' প্রেমে পড়ল পাশের বাসায় কাজ করতে আসা তরুণ এক রাজমিস্ত্রীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমাকে রাখা হয়েছে ঘর-বাড়ি ঝাট-পাট দিয়ে পরিষ্কার রাখা সহ বিভিন্ন ধরনের ফুট ফরমাশ খাটার জন্য। সীমা চৌদ্দ/পনেরো বছরের বেশ বাড়ন্ত গড়নের ছিমছাম দেখতে কিশোরী। গায়ের রং শ্যামলা হলেও মুখটা বেশ মিষ্টি দেখতে। কাজল দেয়া টানা টানা চোখের, বাড়তি মেদহীন ছিপছিপে দেহের, মেঘকেশী সীমাকে দেখলে এক নজরেই অনেকে পছন্দ করে ফেলবেন। তাছাড়া সারাক্ষণ টিভির সিরিয়াল দেখে আর বাড়ির আপাদের দেখে দেখে সাজগোজে বেশ পটুও সে। প্রায়ই এসে আপাদের কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে পুরনো নেলপলিশ, টিপ, লিপস্টিক, ক্লিপ, ব্যান্ড নিয়ে যায় আর সাজেও ঠিক তেমনি করে যেমন করে বাড়ির মেয়েরা সাজে বা টিভিতে দেখে। হঠাৎ কেউ দেখলে গৃহকর্মী বলে চিনবে না, ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাবে। টিপিক্যাল গৃহকর্মীর মতো যেনো না দেখায় সেজন্যও সীমারও চেষ্টার কোনো অন্ত নেই। তবে কঙ্কাদের এসমস্ত দেখার এতো সময় কোথায়? কঙ্কার ভাইয়া ইউনিভার্সিটি নিয়ে ব্যস্ত, বাবা অফিস নিয়ে, মায়ের তো সংসারে ব্যস্ততার সীমা নেই। 'সীমা শত্রু বাড়ির রাজমিস্ত্রীর প্রেমে মজেছে' এই সংবাদটি যথাসময়ে পরিবেশন করল রান্না করার বুয়া, যিনি 'সীমা'র চেয়ে বয়সে বড়, স্বামী পরিত্যক্তা এবং আপাতদৃষ্টিতে 'সীমা'র চেয়ে সুরত এবং ফিটফাটে একটু পিছনেও। আর সংবাদটি কনফার্ম করলেন বাসায় কাপড় কাচতে আসা ছুটা বুয়া যিনি আশেপাশের অনেক বাসায় কাজ করেন বলে পাড়ার সমস্ত খবরে আপডেট থাকেন। তার সাথে কঙ্কাদের দারোয়ানও সেটা রিকনফার্ম করল, সেও নাকি 'সীমা'কে পাশের বাসার রাজমিস্ত্রীর সাথে কথা বলতে দেখেছে। শুরু হলো প্রেমের পথের হাজারো বাধা। শুধু যারা বাধা দেয় তারা জানে না এমনি প্রেম যতো ভ্যাদভ্যাদাই চলুক, বাধা পাওয়া মাত্র তাতে জোয়ার এসে যায়। আমার মনে হয় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রেম মুরুব্বিদের আর সমাজের বাধা না পেলে এমনিতেই ভেঙে যেতো। বাধা দিয়ে তারা তাতে গতির সঞ্চার করেন। শিল্পী সিনেমার কথাই ধরা যাক, উত্তম-সুচিত্রা জানতেনই না যে তারা বড় হয়েছেন, যতোদিন না সুচিত্রার মাতৃদেবী সেটি তাকে মনে করিয়ে দিলেন। মনে করিয়ে দেয়ার ফল হলো এই যে উত্তম-সুচিত্রা লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে দেখা করে প্রেম করলেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন। বাস্তব বাঙালি সমাজেরও এই চিত্র।

কঙ্কাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে লম্বা টানা বারান্দা বাড়ির এ মাথা থেকে ও মাথা। সারা বারান্দায় ফুলের টব দিয়ে সাজানো। কঙ্কা প্রায়ই বারান্দায় হেঁটে হেঁটে পড়া মুখস্থ করে। বারান্দায় ঝোলানো দোলনাতে বসে চা খায়, রকিং চেয়ারে দুলে দুলে গল্পের বই পড়ে। জোছনা রাতে গরমের সময় ঠাণ্ডা মোজাইকের মেঝেতে বসে ভাইবোন সব একসাথে আড্ডা দেয়, আন্তাকসারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলে। লোডশেডিংয়ের রাতে তো এই বারান্দাকেই কঙ্কাদের সব ভাই বোনের আশ্রয়স্থল বলা চলে। কঙ্কার ছোট বোনেরা মোজাইকের ঘরে পা ফেলে ফেলে এক্কাদোক্কা খেলে লাফিয়ে লাফিয়ে। এতো দিন পাশে বাড়ি ছিল না বিধায় কোনো ধরনের সমস্যাই ছিল না, খোলা বারান্দায়ই ছিল সব ভাইবোনের প্রাণ কেন্দ্র। কিন্তু এখন পশ্চিম দিক কুপোকাত করে বাড়ি উঠছে, আশ্রয় খোয়া যাওয়ায় সবাই মনোক্ষুণ্ন। এরমধ্যে প্রেমের প্রোগ্রেস হিসেবে দেখা গেল রাজমিস্ত্রী ছেলে লুঙি ছেড়ে জীনস ধরেছে, স্পঞ্জের স্যান্ডেলের বদলে সে এখন চামড়ার স্যান্ডেল পরছে, হাতে ঘড়ি তো আছেই, আবার যখন কন্ট্রাক্টর না থাকে তখন চোখে রোদ চশমাও শোভা পায়। ছেলে নায়ক রাজ-রাজ্জাকের মতো ফিটফাট হয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে লাগল আর সীমাও দুই টাকা প্যাকেটের মিনিপ্যাক সানসিল্ক শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে এলোকেশী ববিতার ভাবভঙ্গি করে ঘুরতে লাগল। এতোদিন সীমার চুল লম্বা করার তাগাদা ছিল কিন্তু এখন সে কাঁচি নিয়ে কঙ্কার আর তার মায়ের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল চুল কেটে দেয়ার জন্য। বাহারি ঢংএ ওড়না পরতে লাগল, পায়ে নুপূর। পরিবর্তন এতো প্রকট যে সবারই চোখে পড়ছিল। ওই ছেলের বেশির ভাগ কাজই পড়তে লাগল তার বাড়ির পূর্ব পাশে আর সীমার কঙ্কাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে। সারা বাড়ি ঝাট দিতে মুছতে সীমার যতক্ষণ সময় লাগে পশ্চিমের বারান্দা মুছতে সীমার ঠিক ততক্ষণ কিংবা তারচেয়ে বেশি সময় লাগতে লাগল। এতোদিন ফুলের টবে চৌদ্দবার বলে বলে পানি দেয়াতে হতো আর এখন ঘুম থেকে উঠেই সীমা সারা বাড়িতে কেউ ওঠার আগেই পানির বালতি নিয়ে পশ্চিমের বারান্দায় দৌড় দেয়। আগে বলে বলে কঙ্কার মা যে টবের যত্ন করাতে পারতো না, সীমা সারাক্ষণ এখন ন্যাকড়া নিয়ে সেই টবগুলোর আগাপাশতলা মুছতে লাগল, টবের গাছের গোড়া খুঁচিয়ে দিতে লাগল। পাশের বাড়ির কাজের ধুলোবালিতে পশ্চিমের বারান্দার টব নষ্ট হওয়ার বদলে আরো চকচক করতে লাগল। বরং বাড়ির অন্য যে দিকগুলোতে ধুলো থাকার কথা নয়, ঝাড় পোছের অভাবে সেদিকে ধুলো জমতে লাগল। ডাকলে সীমাকে খুঁজে পাওয়া ভার আজকাল, হয় সে পশ্চিমের বারান্দায় নয় সে তার ঘরে সাজ গোজ করছে। চুল খুলে চুল বাঁধছে কিংবা টিপ খুলে অন্য টিপ লাগাচ্ছে। কিন্তু রান্নার বুয়া সারাক্ষণ শ্যেন দৃষ্টি রাখতে লাগল সীমার উপর। সীমা কতোক্ষণ পশ্চিমের বারান্দায় থাকে তার রিপোর্ট বিবি সাহেবকে সার্বক্ষণিক দিতে থাকে সে। ক্রিকেটের আপডেটের মতো বুয়ার আপডেট চলতে থাকতো। অসহ্য হয়ে কঙ্কার মা প্রস্তাব করলেন বারান্দায় মোটা চিকের ব্যবস্থা করা হোক যাতে কেউ কারো মুখ দেখতে না পায়। কতো আর কাউকে পাহারা দিয়ে রাখা যায়। সবাই মন খারাপ করে তাতে সায় দিলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্যাক করে উঠল কঙ্কার ভাই। যখন পাশের বাড়ির ওদের দোতলার কাজ সম্পন্ন হবে তখন না চাইলেও তাদের বারান্দার কর্ম শেষ, সুতরাং যে কদিন খোলা মেলা হাওয়া উপভোগ করা যায় সেটাই ভালো। আর সীমার প্রেম সংক্রান্ত কারণে কিছুতেই বারান্দায় চিক আসবে না। ভাইয়ের কথা থাকতেই হবে কারণ ঐপাশে বাড়ি ওঠায় সবচেয়ে ভুক্তভোগী সে। ভাইয়ের ঘরের জানালা এবং দরজা দুটিরই সংযোগস্থল এই বারান্দা। তাই চিক পর্ব আপাতত বাদ গেলো।

চিক পর্ব বাদ যাওয়াতে অবশ্য কঙ্কারাও মনে মনে খুব খুশি হলো। একটু শ্বাস নেয়ার অবকাশ তবুও রইল এ বাড়িতে আপাতত। ভাইয়া বলাতে যেভাবে এটি এক কথায় স্থির হলো কঙ্কাদের শত কথায়ও তা স্থির হতো না। এই ব্যস্ত পুরুষশাসিত ঢাকাতে যাবে তো কোথায় যাবে কঙ্কারা? পার্ক, লেকের ধার, সিনেমা হল, রাস্তার মোড় কোথাও তরুণীদের কোনো স্থান নেই। বাইরের আড্ডা, আলো-বাতাস সব পুরুষদের একচেটিয়া দখলে। ভার্সিটি থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে অজানা সব বিপদ কল্পনা করে মা যেভাবে বারান্দা আর ঘর করেন, মনে যতো ইচ্ছেই থাকুক আর বন্ধুদের আড্ডা যত ভালোই লাগুক, মায়ের সেই চিন্তিত মুখটি মনে হলে কঙ্কা অস্থির পায়ে বাড়ি চলে আসে। বাইরে যাবেই-বা কোন্ চুলোয়, এ সমাজে কি মেয়েদের বাইরে যাওয়ার কোনো স্থান বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে? একবার ইয়ার ফাইন্যাল শেষে সব বন্ধু এবং বান্ধবী মিলে ঠিক করলো পরীক্ষার মানসিক চাপ যেহেতু শেষ আজ সারাদিন ওরা টিএসসিতে এলোমেলো ঘুরে, মজা করে সেলিব্রেট করবে। বাংলা একাডেমীর সামনের জায়াগাটাতে একজন বন্দুকয়ালা তখন বেলুন আর বন্দুক নিয়ে প্রায়ই বসে থাকতেন। হাঁটতে হাঁটতে ওরা সেখান দিয়ে যেতে গিয়েই হুজুগে সবাই মিলে লাগল তার কাছে নিশানা পরীক্ষা করতে। যখন কঙ্কা তার টিপ পরীক্ষা করছিলো হঠাৎ মেয়েলী প্রখর ঘ্রাণশক্তির কারণে পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল একজন মধ্য বয়স্ক লোক কঙ্কাদের দিকে কিংবা ঠিক সেই মুহূর্তে কঙ্কার দিকেই চোখে তীব্র এক ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কঙ্কার হাত কেঁপে গেলো। কি ছিল সেই দৃষ্টিতে? কঙ্কা খুব বখাটে মেয়ে যে হঠাৎ আনন্দের কারণে বন্ধুদের সাথে নিশানা পরীক্ষা করছে, সেই বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন সমবয়সী ছেলেও আছে? এই ধরনের তরুণ সমাজের কারণে দেশ রসাতলে যাচ্ছে? জানে না কঙ্কা কিন্তু অনুভব করতে পারে সেই রকমই একটা কিছু যেনো ছিল তার চোখে। ক্রিকেট জয়, নোবেল জয়, আনন্দ মিছিল সব কিছুতে পুরুষদের অধিকার। তবে মেয়েরা একেবারে বাদ না, জানালা, বারান্দা কিংবা ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে তো পাচ্ছেই। এই কি কম স্বাধীনতা? সৌদি হলে তো এই আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হতে হতো। নিজের বাড়িতেই বা কিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা? আনন্দে জোরে চিৎকার দেয়া যায় না, পাশের বাড়ি থেকে শুনবে, লক্ষি, ভালো মেয়েরা জোরে কথা বলে, হাঁটে না, চিৎকার তো দূর কি বাত।

সব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সীমা আর মিস্ত্রী প্রেমের দুর্বার বন্যায় ভাসতে লাগল। দুজনের ছবির আদান প্রদান হতে লাগল। বিভিন্ন পার্বণে যখন কঙ্কাদের বাড়িতে ছবি তোলা হয়, তখন সীমাও সাজগোজ দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে লজ্জা লজ্জা মুখ করে গলা নামিয়ে বলে, আপা, আমারে একটা ছবি তুলে দিবেন, বাড়িতে লইয়া যামু। তখন কঙ্কারা সীমাকে ছবি তুলে দিতো, ওদেরও তো একটা সাধ আহ্লাদ আছে। সে ছবি প্রিন্ট হয়ে আসলে ওদেরগুলো ওদেরকে দিয়ে দেয়া হতো। বাড়িতে নিয়ে মা-ভাই-বোনদেরকে দেখাবে, গল্প করবে। সেসব ছবি তো ছিলোই সীমার কাছে, সীমা বারান্দার গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ছবি ছুড়ে দিলো পাশের বাসার উদ্দেশ্যে কিন্তু বিধি বাম। ছবি পড়ল কঙ্কাদের বাসার সীমানার মধ্যেই। আর পড়বি তো পড় একেবারে দারোয়ানের ঘাড়ে যাকে বলে। দারোয়ান সেই ছবি নিয়ে উপরে এসে কঙ্কার মাকে ছবির ইতিহাস বলে গেলো, সাথে দারোয়ান আবার এই খবরও দিয়ে গেলো যে মিস্ত্রীর সাথে কথা বলে সে জেনেছে যে সীমা নাকি ওই মিস্ত্রীকে নিজেকে এই বাড়ির মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছে। কঙ্কার মা তো এই কথা শুনে রেগে কাঁই। এতোবড় সাহস। মা কড়া করে দারোয়ানকে বলে দিলেন মিস্ত্রীকে যেনো সীমার আসল পরিচয় জানিয়ে দেয়া হয় এবং সীমাকে কোনো কারণে নিচে দেখলে যেনো সাথে সাথে মাকে এসে খবর দেয়া হয়। সীমার নিচে নামা নিষেধ। দারোয়ান এতে বেশ খুশি হলো, মাঝে মধ্যে সবার চোখ বাঁচিয়ে নিচে বা ছাদে সে সীমার সাথে ফষ্টিনষ্টি করত, সে জায়গায় ভাগ বসাবে অন্য কেউ, একি সহ্য করা যায়? রান্নার বুয়া আবার সেই আগুনে ঘি ঢাললেন এই বলে যে বাড়িতে কেউ না-থাকলে সীমা কর্ডলেস ফোন নিয়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। মিউজিক সিস্টেমে গান বাজায়। আর যায় কোথায়, কঙ্কার মা সীমাকে এই মারে তো সেই মারে। মনিবের কাছে ঝাড় খেয়ে সীমার সব রাগ যেয়ে পড়ল রান্নার বুয়ার উপরে। বুয়াকে বলল সীমা, তুই তো কালো পেত্নী, বুড়ি তোর সাথে তো কেউ প্রেম করে না, সেই হিংসায় তুই আমার সাথে এমন করিস। রান্নার বুয়াও ছেড়ে দেয়ার পাত্রী না। তিনি বললেন, আমি তো তোর মতো বেহায়া নির্লজ্জ মেয়ে না যে ঘুরে ঘুরে ব্যাটাদের সাথে প্রেম করে বেড়াবো। আমার নিজের আর বংশের একটা ইজ্জত আছে না। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, পর্দা করি, তোর মতো বেহায়া তো না যে চুল ছেড়ে ছেড়ে বারান্দায় যাই। সীমা তেড়ে গেলো আবার, হ হ ইজ্জত আমার জানা আছে। জামাই তো লাথথি দিয়েছে, এখন এই চেহারা আর শরীর নিয়ে অন্য কাউকে পাস না সেটা বল। তোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায় চুল আছে যে ছাড়বি, ঘুরবি? দ্যাখা তো একটাকে দ্যাখা যে তোকে পছন্দ করেছে কিন্তু তুই করিস নাই। এবার সীমা আসল জায়গায় ঘা বসিয়ে দিয়েছে। গ্রাম্য বেশবাস করে সারাক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকা ভাঙা চেহারার বুয়ার দিকে শহরের রাজমিস্ত্রীরা কেউ যে আকর্ষিত হয়নি সেটা তো ঠিকই। রান্নার বুয়া বিবি সাহেবকে ডেকে কান্নাকাটি, তার মতো ইজ্জতদার মহিলাকে সীমার মতো চূড়ান্ত ফাজিল মেয়ে এমন সব কথা বলে অপমান করা, কিছুতেই সে আর এই বাড়িতে থাকবে না, এখনই যেনো পাওনা দেনা মিটিয়ে তাকে বিদায় দেয়া হয়, রান্নার জন্য অন্য লোক দেখা হোক। রান্নার বুয়া জানতো কোথায় হাত দিতে হবে। কঙ্কার মা প্রেশারের রুগী, তিনি আগুনে যেতে পারেন না আর কঙ্কারা সব ভাইবোন পড়ছে। এ সময়ে এই বাসায় তিনি অসম্ভব একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তাকে ছাড়া এ বাসার গতি নেই। একটা সব জানা রেডি লোক পাওয়া তো আর সহজ কথা নয় আজকালকার বাজারে। সন্ধ্যাবেলা একথা শুনে কঙ্কার মায়ের মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়লো, তিনি সীমাকে ডেকে বুয়ার কাছে মাফ চাইতে বললেন কিন্তু জেদি সীমা মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো, মাফ চাইলো না। আর কঙ্কার মা নিজেকে সামলাতে পারলেন না, দিলেন ধরে দু চার ঘা সীমার পিঠে বসিয়ে। কঙ্কার ভাই এসে তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামলালো, মাকে নিয়ে গেলো। মা এমনিতেই প্রেশারের রুগী, উত্তেজনা তার শরীরের জন্য মোটেই ভালো না। সীমাও গেলো কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে আর বুয়া গেলো বীরদর্পে বিজয়ী মুখ নিয়ে রান্নাঘরে।

এ ঘটনার কিছুদিন পর এক ছুটির দিনে বেশ ভোরে কঙ্কার ঘুম ভেঙে গেলো। সারা বাড়ির সবাই তখন ঘুমে বিভোর, ছুটির দিনের আয়েশী ঘুম। ক্লাশের পড়াশোনার চাপে আজকাল আর গল্পের বই পড়ার সময়ই পায় না কঙ্কা। ভাবল ঘুম যখন ভেঙেই গেলো শুয়ে না-থেকে যাই একটু বই পড়ি। যেই ভাবা সেই কাজ। উঠে কঙ্কা হাত মুখে ধুয়ে চায়ের মগ নিয়ে বই হাতে বসার ঘরে যাচ্ছিল। দরজা জানালা খোলা দেখে আর রান্না ঘরের টুকটাক মৃদু শব্দে কঙ্কা বুঝতে পারল মা একবার উঠে ওদেরকে ডেকে দিয়ে গিয়ে আবার শুয়েছে। খুব সন্তর্পণে কঙ্কা যাচ্ছিল যাতে কারো ঘুম না ভেঙে যায়। বসার ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই হঠাৎ অকারণে বারান্দার দিকে চোখ গেলো তার। তার ই.এস.পি বলছিল কিছু একটা ঘটছে ওদিকে। এগিয়ে যেয়ে দেখতে পেলো রাজমিস্ত্রী মজনু হাতে পাইপ নিয়ে দুলে দুলে ছাদের উপর ডাই করে রাখা ইট ভিজাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে ইট ভিজাচ্ছে দেখে জীবন বীমার এ্যাড এর কথা মনে পড়ে গেলো কঙ্কার। জীবন বীমার এ্যাডে যেমন করে বুড়ো বয়সে হাতে পাইপ নিয়ে ঠোঁটে স্মিত হাসি ঝুলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফুল গাছে পানি দিতে দেখায়, মুখে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগার, অনেকটা সেই রকমই ইটে পানি দেয়ার ভাব, এই ভঙ্গি দেখে কঙ্কার সন্দেহ হলো, মনে হলো এই ভঙ্গি এমনি এমনি না, নিশ্চয় কাউকে ইম্প্রেস করার ব্যাপার এর মধ্যে আছে। কঙ্কা আস্তে করে দরজা আর ওয়ালের সংযোগ স্থলের যে ফাঁকটা আছে, সেদিক দিয়ে উঁকি দিতেই দেখল সীমা রান্নাঘরের বারান্দার সাথে এই বারান্দার যে সন্ধিস্থল সেখানে বসে কি যেনো একটা বাটছে। মসলা বাটা যে একটা আর্ট সেটা সেদিন প্রথম অনুধাবন করলো কঙ্কা। দুই হাতে শিলটাকে আলতো করে ধরে নৃত্যের ভঙ্গিতে একবার সীমার হাত দুটো উপরে উঠছে আবার নিচে নামছে। মনে হচ্ছিল রোমান্টিক কোনো গানের কোরিওগ্রাফী হচ্ছে 'গাঙ্গে ঢেউ খেলিয়া যায়, ও কন্যা মাছ ধরিতে আয়'। হাতের সাথে সাথে সীমার পুরো শরীর ছন্দময় ভঙ্গিতে ওঠানামা করছিল পাটার উপর। খুব রোমান্টিক দৃশ্য। এই লীলাময় ভঙ্গিতে মসলা পিষা হচ্ছিল কিনা কে জানে, নাকি শিল শুধু পাটার বুক ছুঁয়ে মধুময় ভঙ্গিতে আসা যাওয়াই করছিল। কঙ্কা যেমন সন্তর্পণভাবে গিয়েছিলো ঠিক সেভাবেই চলে এলো কেউ টের পায়নি। এই সাতসকালে কারো প্রেমময় অনুভূতি নষ্ট করতে তার কিছুতেই ইচ্ছে করলো না। কিন্তু প্রেমিক যুগল মজা টের পেলো আরো আধ ঘণ্টা পরে। কঙ্কা ভেবেছিলো মা আবার শুয়ে পড়েছে কিন্তু না, মা মুখ হাত ধুয়ে রান্নাঘরে গেলো চেক করতে কি কি কতোদূর এগিয়েছে। আজকে ছুটির দিনে সবাই একসাথে আরামসে বসে বাসায় নাস্তা খাবে। তাই নাস্তার বিশেষ আয়োজন। রান্নার বুয়া যখন বললেন ছোলা এখনও বাটা হয়নি, হালুয়া তাই বসাতে পারেনি, মা গেলেন সীমার বাটাবাটি চেক করতে। এতোক্ষণেও এটুকু ডাল বাটা কি করে শেষ না হলো। মা যেয়ে দেখলেন সীমা সেই লীলায়িত ভঙ্গিতে শিল-পাটা নিয়ে খেলা করে যাচ্ছে। দূরে কোথাও রেডিওতে কোনো সিনেমার প্রেমের গান বাজছে। রাগে মা জ্বলে উঠলেন, মায়ের চিৎকারে সাত সকালে সব কাক উড়ে যাওয়ার অবস্থা। একে তো ছুটির দিন, পাড়াময় সব ঘুম, নিঝুম শান্ত কোনো শব্দ নেই তার মধ্যে সাত সকালে মায়ের এই চিল চিৎকার। কঙ্কার ভাইয়া বিছানা ছেড়ে দৌড়ে উঠে গেলেন মাকে নিয়ে আসতে, মায়ের এক কথা ওকে আমি রান্নাঘরের বারান্দায় ডাল বাটতে দিয়ে এসেছি ও কোন সাহসে শিল-পাটা নিয়ে এই বারান্দায় এসে বসল। ভাইয়া মাকে শান্ত করার জন্য অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগল। কদিন পরেই ভাইয়া পাশ করে বেরোবে আর চাকরি মোটামুটি রেডি। সেজন্য ধুমসে কঙ্কাদের আত্মীয়-স্বজন ভাইয়ার জন্য মেয়ে দেখছে। প্রায়ই আশেপাশের বাসার আন্টিরা এসে কঙ্কার মাকে খবর দিয়ে যায় যে আপনার ছেলের খোঁজ নিতে আজ একজন এসেছিলেন। ভাইয়া বোঝাতে লাগল তুমি যদি এভাবে চিৎকার করো মা তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি আমার জীবনেও বিয়ে হবে? পাড়ার লোক যখন বলবে ছেলের মা এমন খানে দজ্জাল তখন কোন্ বাবা প্রাণে ধরে মেয়েকে আমার কাছে দিবে? তুমি তোমার ছেলের ভবিষ্যৎটা একবার ভাবো মা। ইত্যাদি-নানান অকাট্য যুক্তির পর আস্তে আস্তে মা একটু শান্ত হলেন।

কিন্তু সীমা আর সেই রোমিও এই অপমান সহ্য করতে পারল না। পরদিন বিকেলে সীমা ছাদে কাপড় তুলতে গেছে, কাপড় নিয়ে সীমা আর আসছেই না। এমনিতে সীমা ছাদে গেলে যথেষ্ট দেরি করে, ছাদে যেয়ে প্রথমে এদিকে ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি দিবে ঘুরবে, গান গাইবে। তা নিয়ে রোজ বকাঝকাও খায় কিন্তু আজ তো ঘণ্টা পার হয়ে গেলো সীমা আসছে না। প্রথমে রান্নার বুয়াকে পাঠানো হলো সীমাকে ছাদ থেকে ডেকে আনতে আর এদিকে কঙ্কার মা তো বাসায় বসে গরগর করছিলই, আজকে ও নামুক নীচে, আমার একদিন কি ওর একদিন। বিকেলের সব কাজ পড়ে আছে ওদিকে মহারাণীর দেখা নেই। কিন্তু বুয়া এসে খবর দিল ছাদ তন্নতন্ন করে দেখে এসেছে কোথাও সীমা নেই। তখন দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো সীমা কি নিচে গেছে, দারোয়ান সেটা বলতে পারল না। তাছাড়া দারোয়ান আছরের নামাজ আদায় করতে কিছুক্ষণের জন্য মসজিদে গিয়েছিল, মেইন গেট তখন অরক্ষিত ছিল। দারোয়ানকে বলা হলো নিচে খুঁজে দেখতে। কিন্তু তখনও কারো মাথায় সীমা পালিয়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনার কথা মনে হয় নি। এতো বড়ো দুঃসাহস সে করবে এটা তাদের সবার কল্পনার অতীত ছিলো। চিনে না জানে না কদিনের দেখায় কারো হাত ধরে চলে যাওয়ার মতো অসম্ভব ব্যাপার কে ভাবতে পারে? দারোয়ান নিচে দেখে এসে বলল, সীমা সেখানেও নেই। মা তখন বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে খুঁজে আসতে বললেন, অন্য ফ্লোরের মেয়েদের সাথেও সীমার বেশ সখ্য আছে যদি সেখানেও যেয়ে থাকে। নেই নেই নেই কোথাও নেই। কি করা এখন। বাসার সবার সব কাজ মাথায় উঠলো, সবাই মিলে সীমাকে খোঁজা চলল। এর মধ্যে রান্নাঘরের বুয়া জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল যে তার ঈদে পাওয়া নতুন শাড়িসহ আরো দুখানা ভালো শাড়ি আর সেগুলোর সাথের ম্যাচিং ব্লাউজ, পেটিকোট আর তার নতুন স্যান্ডেল জোড়াও নেই। সীমা নিজের ভালো দুটো জামা নেয়ার সাথে সাথে বুয়ারগুলোও নিয়ে গেছে। পুরনো কি আধ পুরনো কিছু সাথে নিয়ে যায়নি। এ খবর পাওয়ার পর মোটামুটি বোঝা গেলো কি হয়েছে। এরমধ্যেই সন্ধ্যা নামলো, ভাইয়া বাড়ি ফিরলো। সব শুনে গেলো পাশের বাসায় চেক করতে–আসলেই কি সেই রাজমিস্ত্রির সাথে গিয়েছে নাকি অন্যকিছু। সেই রাজমিস্ত্রির কথা সেখানে কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না তবে এটা ঠিক, বিকাল থেকে তার দেখাও নেই। রাত কাটলো উদ্বেগ আর উত্তেজনা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে। বাবা কিছুটা মায়ের উপর বিরক্ত, মা কেনো আগে থেকেই টের পেলেন না। কিন্তু কতোদিন ধরেই মা বাবার সাথে বলছিলেন কোনোদিন কোনো অঘটন ঘটে যাবে, তার আগেই আমি ওকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে চাই। সেজন্য কঙ্কার নানুকে ফোন করে কঙ্কার মা আর একটা লোক যোগাড় করতেও বলে দিয়েছিলেন। হয়তো সেই থেকেই সীমা তক্কে তক্কে ছিলো। টেলিফোনে তো বড় রাখঢাক করে কথা বলা হতো না আর মা রেগে গেলে সীমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন বলে শাসাতেনও বটে।

পরদিন ভোর সকালেই কঙ্কার বড় মামা কঙ্কাদের বাড়ি এলেন। ঠিক হলো ভবিষ্যতের দায় এড়াতে পুলিশে খবর দিয়ে রাখাই ভালো। যদিও চব্বিশ ঘণ্টা পার না হলে পুলিশ মিসিং পার্সন নথিভুক্ত করে না। কঙ্কাদেরকে বলা হলো সীমার একটা ছবি খুঁজে রাখতে, থানায় যাওয়ার সময় লাগবে। আর সীমার বাবা-মাকে বাড়ি যেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আস্তে ধীরে খবর দেয়াটাই ভালো হবে এই ডিসিশন নেয়া হলো। ডিসিশন নিতে পেরে বাড়ির বড়রা একটু হালকা হলেন, বাড়ির গুমোট ভাবটা একটু কাটলো। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে লাগল। দুপুরে সবাই যখন একটু রিলাক্সভাবে খেতে বসেছে, তখন ঝনঝন শব্দে ফোন বেজে উঠল। ফোন মাইই ধরলেন। আজকাল রাস্তার মোড়ে মোড়ে পি,সি,ও হওয়াতে ফোন আর কোনো বড় ব্যাপার না। সীমা ফোন করেছে, ফোনে মাকে বলছে, আমারে মাফ-সাফ কইরা দিয়েন, আমি ভালোই আছি, আমার স্বামীর সাথে, আমার জন্য খাস দিলে দোওয়া কইরেন আফনে। সামনে পেলে মা হয়তো সীমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলতো, বহু কষ্টে মা নিজেকে সংবরণ করে সীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথা থেকে ফোন করেছিস? সীমা বলল এখন আমরা সিলট আছি। সত্যি বলল না মিথ্যা কে জানে। সীমা আবার বলল আপনি এট্টু ফোন কইরা আমার আব্বা-আম্মারে এই খবরটা দিয়েন আর খালুজানরেও কইয়েন আমার জন্য খাস কইরা দোয়া করতে। মা শুধু বলতে যাচ্ছিলেন তুই এভাবে না-বলে চলে গেলি কিন্তু বেশি কিছু বলার আগেই সীমা লম্বা বিনীত ছালাম দিয়ে ফোন ডিসকানেক্ট করে দিল। ফোনের পরে পুলিশে যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত বাদ দেয়া হলো। আস্তে আস্তে যত দিন যাচ্ছিল আবিষ্কার হচ্ছিল সীমা পালিয়ে যাওয়ার জন্য বহু দিন ধরেই তৈরি হয়েছিল। রান্নাঘরের শোকেস থেকে সীমা কিছু বাসনপত্র, গ্লাস সরিয়ে রেখেছিল, বিছানার চাদর, টেবিলের কাপড় এধরনের অনেক কিছুই নিয়ে পোটলা করে ছাদের কোথাও-বা নিচে গ্যারেজের পাশে এদিক-সেদিক লুকিয়ে রেখেছিল। এতো বড় সংসার থেকে কেউ চারটে কাচের বাসন বা গ্লাস কিংবা দুটো বিছানার চাদর সরিয়ে রাখলে খুব সহসা সেটা ধরার উপায় তো কিছু নেই। আর এই সমস্ত নিদারুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণীয় তথ্যগুলো আবিষ্কার করছিলেন বুয়া আর দারোয়ান। কিন্তু যাবার সময় হয়তো বেচারী সীমা তাড়াহুড়ায় সব জিনিস নিয়ে যেতে পারেনি। নতুন সংসারের স্বপ্ন ছিল তার চোখে, যেমন প্রত্যেক বাঙালি মেয়েরই থাকে, সেই স্বপ্নকে সার্থক রূপ দিতেই পাখির মতো একটু একটু খড়কুটো একত্র করছিল। যাকে এখন চৌর্যবৃত্তির অপরাধের নামে আঁকা হচ্ছে।

এই নিষ্ঠুর শহরে প্রেম খুঁজে পাওয়া তো আর সোজা কথা নয়। কেউ যদি খুঁজেও পায় তার প্রেমের রাস্তায় আসে হাজারো বাধা। কারো প্রেম দেখার বা বোঝার কারো সময় বা আগ্রহ নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল এখানে হলো সেই কথা। কঠিন শহরের কঠিন প্রেম। আর তারচেয়েও কঠিন হয় তার পরিণতি। যদি রাজমিস্ত্রিকে পাড়ার লোক ধরতে পারত তাহলে তার কি হতো ভাবা যায় না আর সীমার পরিণতির কথা তো বাদই থাকলো। খবর শোনার পর সীমার বাবা-মা কঙ্কাদের বাড়ি এসে অনেক আস্ফালন করলেন, মেয়েকে পেলে টুকরো টুকরো করে কেটে পানিতে ভাসিয়ে দিবেন, কি কুক্ষণে এমন কলঙ্কিনী মেয়ে জন্ম দিয়েছিলেন, আগে জানলে জন্মের মুহূর্তেই মেয়ের মুখে লবণ ঢেলে মেরে ফেলতেন, মেয়ের সাথে চিরজীবনের সম্পর্ক ছিন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। আস্ফালন শেষ হলে সীমার মা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন সন্তান বাৎসল্যের কারণে। সীমার বাবা মুখ গুঁজে, মাথা নিচু করে বসে রইলেন সারাটা সময়। কারো চোখের দিকে তাকালেন না, কারো সাথে কোনো বাক্য বিনিময়ও করলেন না। হয়তো এমনটাই হবে সীমা ধারণা করেছিল সেজন্যই কি সীমা এই কঠিন শহর ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে গেলো তার প্রেমের জীবনের সন্ধানে? কেউ তার প্রেমের কদর করতে পারবে না সেই জ্ঞান সীমার মধ্যেও হয়তো ছিল, তাই সবার থেকে দূরে নিজের জীবন খুঁজতে গেলো সে। হয়তো সেখানে প্রেমের অপরাধে তাকে দিন রাতের গঞ্জনা, অভিশাপ সহ্য করতে হবে না, সহ্য করতে হবে না মাস্তান বাহিনী কিংবা আত্মীয় স্বজনের হুমকি ধামকি। সারাদিন কাজের পরে কারো প্রেমময় চোখের দিকে তাকিয়ে সে ভুলে যাবে পরিশ্রমের ক্লান্তি। কারো সমুদ্রসম ভালোবাসা সীমার সারা জীবনের পাওয়া না-পাওয়ার, দুঃখ বঞ্চনার হিসাবকে ভুলিয়ে অন্যকোনো সুখের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। ভুলে যাবে অনেক কিছু না পাওয়া, দুঃখ, অপমান, বঞ্চনার ইতিহাস। বেরসিক ঢাকা আর যাই বোঝে, কিন্তু মরার প্রেম বোঝে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ কি জাত সংসারে?

নিশি আজকাল বলতে গেলে কিছুই খেতে পারছে না। সব খাবারে গন্ধ লাগেই। এই গন্ধ থেকে আবার অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসও মাথায় আসে। গরুর মাংসকে মনে হয় ঘোড়া বা গাধার মাংস, আর মনে হলেই তিন গুণ বেগে বমি বেরিয়ে আসে। নিজে রান্না করলে খাওয়ার প্রশ্ন তো আসেই না কারণ রাঁধতে রাঁধতেই সে বমি করতে করতে কাহিল হয়ে যায়। অয়ন যদিও বলে, তুমি রেঁধো না নিশি, অফিস থেকে ফিরে আমিই করে নিবো। তুমি একটু আমাকে এগিয়ে দিও আর দেখিয়ে দিও। নিশির মর্নিং সিকনেসও প্রচণ্ড। বেলা বারোটা অব্দি মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারে না বলতে গেলে। টুথপেস্ট মুখে তুলতে পারে না, পেস্টের গন্ধেই নাড়িভুঁড়ি উলটে আসে। পৃথিবীর সব কিছুতেই গন্ধ পায় সে। খাবার, টুথপেস্ট, সাবান, ঔষধ। ডাক্তার বলেছেন, কারো কারো তীব্র মর্নিং সিকনেস হয়। এখন সবে তো আট সপ্তাহ যাচ্ছে, যতোদিন যাবে আস্তে আস্তে এগুলো কমে যাবে। সে যখন কমবে তখন কমবে। এখন তো আর কমছে না। প্রাণ যায় যায় অবস্থা এখন। কিন্তু তারপরও সারাদিন নিশি ঘরে শুয়ে বসে থাকবে আর বেচারা অয়ন খেটেখুটে ফিরে এসে রাঁধবে ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়, তাই কষ্ট হলেও নিশিই রেঁধে ফেলে। তবে আচার মেখে নিশি দু-এক লোকমা ভাত মুখে তুলতে পারে। ডাল আর আচার মাখা নয়তো শুধু আচার মাখা ভাত এই হলো নিশির খাদ্য। নিশির এই দুরবস্থা দেখে আশে-পাশে থাকা বন্ধু বান্ধবেরা মাঝে মাঝে খাবার দিয়ে যায়। অন্যের হাতের রান্না হলে নিশি একটু খেতে পারে। মূল সমস্যা তো রান্নার গন্ধে। অন্যে রেঁধে আনলে গন্ধটা ততো তীব্র ভাবে পায় না। এ পরবাসে নিশির বেশ বন্ধু অনিতা। দুজনের মধ্যে ধর্ম থেকে শুরু করে ভাষার অনেক কিছুর পার্থক্য যেমন আছে তেমনি আবার অনেক চিন্তা-ভাবনার মিলও আছে। সেই মিলগুলোই পার্থক্য ছাড়িয়ে দুজনকে দুজনের কাছে নিয়ে এসেছে। অনিতার শাশুড়ি এসেছেন দেশ থেকে। যখন নিশি বেশ সুস্থ ছিল দু বন্ধুতে বেশ গল্প হতো অনিতার শাশুড়ি এলে কি কি করবে তাই নিয়ে। এদিকে এখন উনি এসে গেছেন, কিন্তু নিশি দেখাই করতে যেতে পারলো না। অনিতার শাশুড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসার সময় দেশ থেকে অনেক আচার আর খাবার দাবার নিয়ে এসেছেন, ছেলে বৌ নাতনিদের জন্যে। অনিতা আচার দেখে খুব খুশি। শাশুড়িকে বন্ধুর কথা বলে বললো, চলুন মা ওর সাথে দেখা করে আসি আর ওকে আচারও দিয়ে আসি। বেচারী চারটা খেতে পারবে তাহলে। অনিতার শাশুড়ি দেশ থেকে এসে এখানে বোর হচ্ছেন। উইকএন্ড ছাড়া বেড়াতে যাওয়া নেই, উইকডেজে সবাই যার যার মতো কাজ আর স্কুল নিয়ে ব্যস্ত। যাক তাও কারো বাড়ি যাওয়া হচ্ছে।

কিন্তু যখন শুনলেন মুসলমানের বাড়ি যাওয়া হবে তখন উনি দ্বিধায় পড়ে গেলেন। কি করবেন, কি করেন? তিনি ময়মনসিংহের কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, সারা জীবন নিষ্ঠার সাথে আচার পালন করে গেছেন। শেষ বয়সে তিন মাস ছেলের বাড়ি বেড়াতে এসে তার ধর্ম নষ্ট করবেন, তা কি করে হয়? অনিতাও ঝামেলায় পড়ে গেলো। বিদেশে তো সবার প্রধান পরিচয় বাংলাদেশি। মুসলমান-হিন্দু ব্যাপারটা তো ততো সামনে আসে না। এখন কি করে? নিশি তার এতো বন্ধু যে না গেলেও মুখ থাকবে না তার কাছে। পরে শাশুড়ির সাথে রফা হলো, শাশুড়ি আসবেন তার মুসলমান বন্ধুর বাসায় এক শর্তে, তাকে এখানে জল স্পর্শ করতেও বলা হবে না। অনিতা সেভাবেই নিশিকে ফোন করে জানালো। বন্ধুর দুঃখ বন্ধু না-বুঝলে আর কে বুঝবে? নিশি বলল, ঠিক আছে আমি জলও সাধবো না। অনিতা আর তার শাশুড়ি বাসায় ঢুকলে নিশি পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করল, তিনি নিশিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনেই দুজনের কুশল জিজ্ঞাসা করল। আস্তে আস্তে গল্প জমে উঠল। গল্প করতে তো ভালোই লাগে কিন্তু বেশি কথা বললেই আবার শরীর খারাপ করতে শুরু করে। এর মধ্যেই আবার নিশির বমি শুরু হয়ে গেলো। নিশির শরীর যেমনি থাক অনিতাকে সময়মতো বাড়ি ফিরতে হবে, বাচ্চাকে আনতে হবে স্কুল থেকে। অনিতা নিশিকে তাই বাই করে তাড়িমড়ি ছুটল শাশুড়িকে নিয়ে বাচ্চার স্কুলে। কিন্তু এরকম অসুস্থ একটা মেয়েকে একা বাড়িতে ফেলে যেতে উনার মন টানছিলো না। বাচ্চা মেয়েটা প্রথম বার পোয়াতি হয়েছে, কেউ কাছে নেই। একা বাড়িতে পড়ে রয়েছে, খেতে পারছে না কিছু। আজ দেশে থাকলে মা থাকতো কিংবা শাশুড়ি থাকতো কাছে, এটা সেটা রেঁধে খাওয়াতো। মাথায় হাত বুলাতো। আহারে, কার না কার মেয়ে এখানে এভাবে পড়ে আছে। নিশি উনাকে বিদায় দিতে গাড়ির কাছে আসতেই উনি নিশিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে, গালে বেশ কয়েকটা চুমু খেলেন। নিশি সসঙ্কোচে বাক্যহীন। নিশির হাতে ছোঁয়া এক গ্লাস পানি উনি খাবেন না, পবিত্রতা নষ্ট হবে সে জায়গায় উনি দেদারসে নিশিকে চুমু খেয়ে ফেললেন!

এরপর প্রায়ই উনি নিজে এটা সেটা নিরামিষ রান্না করে নিশির জন্য নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে লাগলেন। ছেলে বৌয়ের জন্য আনা নিজের হাতের বানানো আচারও নিয়ে আসতে থাকলেন। ব্যস্ততায় অনিতা অনেক সময় আসতে না চাইলে উনি জোর করে অনিতাকে নিয়ে চলে এসে নিশিকে আদর করে খাইয়ে যেতেন। কিন্তু উনি নিজে নিশির হাতের ছোঁয়া এক গ্লাস পানিও কখনো এ বাসায় স্পর্শ করেননি। আর নিশিকে তিনি মিষ্টি গলায় শাসন করতেন নিজের যত্ন নেয়ার জন্যে। নিশি কেনো ওর মাকে বলে না, ওর কাছে এসে থাকার জন্যে। এখনি তো মাকে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। মাকে যেনো বলে সে কথা বার বার তাগাদা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেতেন। যাওয়ার সময় বার বার নিশির কপালে চুমু খেয়ে, নিশির সারা মাথার চুল লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বিদায় নিতেন। উনি যখনি বিদায় নিতেন, নিশির মনে একটা আলাদা অনুভূতি খেলা করতো। যাকে এতোটাই কেউ ভালোবাসে যে বার বার চুমু দিয়ে মাথা মুখ ভিজিয়ে দেয় তার হাতের স্পর্শে এমন কি বিষ থাকতে পারে? কি হবে তার হাতের ছোঁয়া পেলে? মাসির এই ভালোবাসায় যে আন্তরিকতার কোনো খাঁদ নেই সে কথা নিশির অন্তর জানে, ভালোবাসা অনুভব করা যায়। তাহলে ধর্ম কি ভালোবাসারও ওপরে থাকে? জানে না নিশি কিন্তু মন মানতে চায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনশো টাকা

বইসা থাইকা থাইকা অধৈর্য হইয়া উঠছিল করম আলী। বাদ জুম্মা সালিশ হওনের কতা, এহন বেইল আসরের দিকে গড়ায় গড়ায় কিন্তু মাতবর সাব আর ইমাম হুজুরের দেহা নাই। না খাইয়া না দাইয়া তহন থাইকা বইসা রইছে এই ভাদ্দর মাসের গরম মাতায় লইয়া। দেহ দেহি! করম আলী গরীব মানুষ। তার ডাকা সালিশে মানুষজন বেশি আসার কতা না। ইটা এমুন মজার কুন সালিশও না। চ্যাংড়া পুলা মাইয়ার পিরীতের কেস কিংবা পরের বউ লইয়া ইটিশ পিটিশ এর গটনা হইলে মানুষ বেশি হয় সালিশে, তয় আজকে জুম্মাবার, বেশির ভাগ মানুষই জুম্মা পইড়া, জুম্মার দিনের চাইরটা বালা মন্দ খাইয়া এট্টু গড়াগড়ি দিয়া হেরপর বাজারের দিকে কিংবা কামে কাজের সইন্ধানে বাইর হয়। হেই হিসেবে আইজকার সালিশে লুক মন্দ হয় নাই। মসজিদের উঠান ভইরাও, পুষ্কুনির দিকে যাওনের রাস্তার কাছের কাডল গাছটা পর্যন্ত মানুষ হইছে। তার আর তার বউয়ের মইদ্যের কাইজ্জার কথাডা তো অল্প বিস্তর হগলতেই জানে। মজার না-হইলেও গটনা ইটাও খারাপ না দেহার লাইগ্যা। হগলতে আইসাই দুইডা বালা মন্দ কতা করম আলীরে জিগাইয়া নিজেদের মইদ্যে খুশগল্পে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। করম আলী বুঝে তার দিকে কারু টান নাই, অবসর আছে, তারা আইছে মজা দেখতে। তার দিকে যদি কারু টান থাকতো তাইলে কি আইজ আর তার সালিশ ডাইকতে লাগে? কিন্তু মাতবর সাব আর ইমাম সাব না আইলে ফয়সালা দিবো কেডা?

আইজ একটা ফয়সালা না লইয়া সে বাড়ি যাইবো না। আড় চুখে সে উলটা দিকে চাইলো। এহনো হারামজাদি বউটা তার দিকে পিছ দিয়া বইসা রইছে। ছাপার একখান রঙিন শাড়ি পরা, মাতায় গুমটা টানা। এইপাশ থেইকা পিছনের শাড়ি আর হাতের কয়টা কাচের সবুজ চুড়ি ছাড়া কিছুই দেহা যায় না। বাপের বাড়ির দ্যাশের তন লগে বাউজ, বুইন লইয়া আইছে, তাগো লগে কতা বারতা কইতেছে। চড়াৎ করে গুস্বাটা তার আবার মাতায় উইঠা গ্যালো। মাতারি তোর এত্তো চুপা। বাতও খাইরি আমার আবার চুপাও দিবি আমারে। কিসসুটি কওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাইপো না তারে। যদি দুইপরে খাইতে বইসা দেখছে তরকারিতে লবণ কম, কইলেই খ্যান খ্যান গলায় মাতারি কইবো, তরকারির লবণ ঠিকই আছে, আপনার জিহবাতই লবণ কম। কাহাতক আর দিন রাইত সইহ্য করা যায়? হাজার হোক করম আলী একটা পুরুষ মানুষ না? নিজের জমিও আছে, হউক অল্প কিন্তু আছে তো! তার কুনু ইজ্জত নাই এই হারামজাদির কাছে। এই লাইগ্যাই মাজেই মাজেই মনের সুখ মিটাইয়া চুলের মুঠিত দইড়া দেয় দুই চাইরটা। তাইলেই শুরু হয় বিলাপ। আরে গেরামের কুন পুরুষ মানুষটা মাজে মইদ্যে তার ঘরের বউরে দুই চাইরটা না দেয়? তুই কি মিয়া বাড়ির বিবি, যে তোরে আপনে তুমি জিগাইতে হইবো? মাইর দিলেই এই মাতারী কানতে কানতে বাফের বাড়ি যায়। এদিকে ঘর সংসার কে দেহে?

বুঝলাম পুলাপাইন তিনটারে লগে লইয়া যাস। কিন্তু ওইটাই সংসারে সব? হাঁস মুরগাগুলারে খাওন দেয় কে? তুই বাড়িতে না-থাকলে যে গেরামের পুংটা পুলাপাইন বাড়িত ডুইক্যা লাউটা, কলাটা চুরি কইরা লইয়া যায়, হেই গুলান পইড় দেয় কে? করম আলীরে দুইটা ভাত ফুটায় দিব কে, হেই চিন্তা মাতায় আহে না। স্বার্থপর মাইয়া মানুষ। চিন্তা করতে করতে বেফানা লাগলে করম আলী নিজেরে সান্ত্বনা দেয়, বাবা আদমরে যেই জাতি বেহেস্ত ছাড়া করছে, তাগো কাছে আর চাওনের কি আছে? বজ্জাত মাইয়ালুকের হাড্ডিরে শায়েস্তা করার জইন্যই আজকের সালিশ। হুজুর আইসা আইজকা বন্ননা দিবো, স্বামীর কতা যে সমস্ত ইস্ত্রীরি লুক শুনে না রুজ হাশরের ময়দানে তাদের কি কট্টিন শাস্তি হইবো। হাবিয়ার আগুনে পুড়বো, হাবিয়ার আগুনে।

হঠাৎ সব্বাইরে লইড়া চইড়া বইতে দেইখ্যা করম আলী চাইয়া দেহে উত্তর-পুব কোনার জমিনের শ্যাষ সীমানার তাল গাছের তলে শাদা পায়জামা পাঞ্জাবীর রেখ দেহা যায়। হুমম, আট্টু নজর কইরা দেকলো মাতায় ছাতিও আছে। আইতাছে, মাতবর সাব আর ইমাম সাব আইতাছে, এক লগেই আইতাছে। ইমাম সাব থাহেন মাতবর সাবের কাচারি ঘরের পাশে, উনারা ভদ্দরলুক মানুষ, এক লগেই চলাফেরা আর উটা বসা করেন। আবার আড় চুখে চাইলেন সামনের দিকে, উহহহ, এক হাত গুমটা টাইন্না নয়া বউর মতো বইছে এহন। কতো লাজরে। গলা ফাইরা ফাইরা যহন সারা পাড়ার কাকপক্ষী উড়াইয়া ঝগড়া করছ তহন কুতায় থাহে এই লাজ? তাইর লেইগ্যা পাড়ার লুকে কতো দিন কইছে, বউটারে এতো মারিস না করম, এতো মারন ঠিক না। ইজ্জতের কতা। গরের কতা সব পরে জানে। মারে কি আর সাধে? চুপ থাকবার পারে না? করম আলীর মাতাডা এট্টু গরম হেইটা তো হগলেই জানে। তাই বইলা কি স্যা লুক খারাপ? সাতেই সাতেই কি আবার তার মাতা ঠাণ্ডা অয় না? বউরে কি শাড়ি সু দেয় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যায়? ইমাম সাব মসজিদে ডুকনের আগেই সবাই সিদা হইয়া জায়গায় বইসা গ্যালো।

হুজুর ডুকা মাত্রই সবাই দাঁড়াইয়া বড় সালামালকি দিলো। করম চেয়ার টাইন্যা ঠিক কইরা দিল একটা মাতবর সাবের আর একটা ইমাম হুজুরের। উনাদেরকে চেয়ার মাপ দিয়া এক্কেরে গাছের নিচের ছায়ার মইদ্যে দিল যাতে কারু গায়ে রোইদ না-লাগে। উনারা গইন্য মাইন্য লুক, রোইদ বিষ্টির অইভ্যাসতো উনাগো নাই। উনাদের থিক্যা হাত পাঁচেক দূরে বড় একটা কাঠের বেঞ্চিতে হাই স্কুলের মাষ্টার সাব, পুষ্ট মাষ্টার সাব, আরো গেরামের মাতা যিনারা আছেন, তারা বইসছেন। তিনাদের থিক্ক্যা আরো এট্টু দূরে মাটিতে হাঁটু ভাইঙ্গা করম আলী আর গেরাম বাসী বইছে। সবশেষে মহিলারা। সালাম দুয়া শেষ হইতেই ইমাম সাব গলা খাঁকারি দিয়া কইলেন, সময় বেশি নাই, বেশি দিরং করণ যাইবো না। আসরের জামাত ধরতে হইবো সব মুসুল্লি ভাইদেরকে। এই সবে সময় নষ্ট কইরা নামাজ দিরং করলে আল্লাহ তালা গুস্বা করবেন। সালিশ কে ডাকছে? বিপদে পড়া গলায় করম কইলো, আমি হুজুর। করম আলী মনে মনে কয়, এত্তো কইয়া হুজুররে দইড়া সালিশ ডাকাইলাম আর হুজুর কয় সালিশ কে ডাকছে! ইমাম সাব স্বাভাবিক সময়ের থাইক্যা আরো গম্ভীর গলায় কইলেন, কও তুমার আর্জি কও, শুনি, দাঁড়াইয়া কও।

এইবার করম আলী দাঁড়াইলো সর্ব সম্মুখে। হাতের মইদ্যে এখন তার গলার গামছাটা। সাদারনত সে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পইড়া থাকলেও আইজকা তার নিজের সালিশ উপলক্ষ্যে শ্বশুর বাড়ি বেড়াইতে গ্যালে যে পিরানটা পিন্দে সেই পিরানটা গাও দিয়া আইছে। দূর ছাতা, হাত ক্যান গামায়? গামছায় হাত ঘষতে ঘষতে করম কইলো হুজুর, আমি আবার বউরে কিছু কইতে পারি না, হ্যায় মুহে মুহে অনেক চুপা করে। কতায় কতায় গুস্বা কইরা বাপের বাড়ি যায়। সোয়ামীর খেদমত বলতে কিছুই করে না। আপনে এর এট্টা ল্যায্য বিচার করেন হুজুর। হুজুর সব শুনলেন তারপর কইলেন, একজনের কতায় বিচার করণ ঠিক না। এইটা ল্যায্য অয় না। হুজুর গলাটা উঁচা কইরা কইলেন, করম আলীর বউ কি এইহানে উফস্থিত আছো? যদি থাহো তবে পর্দার মইদ্যে থাইক্যা তুমার কিছু কওনের থাকলে কইতে ফারো। করম আলীর বউ উইঠ্যা দাঁড়াইয়া মাতার গুমটা আবার ঠিক করলো, আরো লম্বা করলো। হুজুর আর মাতবর সাবরে আদাব দিয়া কাইন্দা কাইন্দা কইতে লাগলো, হেতানে বাড়িত আইসা আমারে যিতা মুক দিয়া না আহে হিতা কইতে থাহে। আমি কিছু কইবার গেলে আমারে মারতে আহে, পিডায়। হুজুর আর মাতবর সাব চুপ করে সফুরার কতা হুনলেন। তারা এহন মাতা নিচু কইরে চুখ বন্ধ কইরে ভাবতিছেন। গুরুত্বপুন্ন কতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কওনের আগে করম আগেও দেখিছে মাতবর সাব আর হুজুর চুখ বন্ধ কইরে ভাইবা লয়।

করম আলী আরাম কইরা বসলো। এইবার হুজুর বালো করি সফুরারে ধুবেনি। বেশরম মাইয়া মানুষ, সোয়ামীর নামে নালিশ করে, দুজখে যাইবি নিগগাত, দুজখ। করম আলী জানে সে অন্যায় কিছু করে নাই। হাদিসে আছে, বেয়াদ্দপ বউরে শাসন করা, মারা ফরজ। সে তো ধম্মের বাইরে কিছু করে নাই। এইবার ইমাম হুজুর শুরু করলেন তার বয়ান। বিচারের রায়ের আগে হুজুর সব সময় কুরানের আয়াত বয়ান করেন। হুজুর কুরান বন্ননা করলেন পরথমে, তারপর তার তফসীর কইরলেন। এবার হাদিসে কিতা কয় সেইগুলাও কইতেছেন। ইস্ত্রীর কি কমম করা দরকার, সোয়ামীর কি রহম ব্যভার করা উচিত, এইসব এইসব। করম আলী আস্তে আস্তে আবার অধৈর্য হইয়ে উঠতে লাগলো, এইসব ভালু ভালু কতার লাইগ্যে তো সে সালিশ ডাকে নাই। সে আশায় আছে, কহন সফুরারে ধইরে সব্বাই তার পায়ের কাছে আনি ফেলবে, মাপ চাওয়াইবে। সে গাই গুই করপে, মাপ দিবে কি দিবে না ভাব করবে। তহন হগলে তাকে চাইপে দইড়ে কবে, ভুল তুই সবার থাহে মিয়া, বউটারে মাফ কইরে দেও, গরে নিয়া চলো। সেই সুযোগে সে সফুরারে নিয়ে গরে যাবে। আইজ একটা মাস হইয়া গ্যালো সফুরা বাপের বাড়ি, কে রেন্ধে দেয়, কিভাবে খায় সে? খালি খালি ভাত আর একজন কদ্দিন খাইতে পারে? একজন মুনিষ্যি তো সে। রাইতে একলা ঘুমের কষ্টের কতা তো আর মুহে আনতি পারে না। তার উপড় পুলাপান তিনটারেও মাস দইড়া চোহে দেহে না।

করম ইট্টু পর পর উইঠে দাঁড়াইয়া হুজুরের ঠিক খাপ খাচ্ছেনা ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দাবলীর সাথে। নজর আদায়ের করার চেষ্টা কইরতে লাগল। করম খালি কইতে চায়, হুজুর আপনে সফুরারে এট্টু ইস্ত্রীর কইরতব্যটা কন। পিছন থাইক্যা সব্বাই তহন তারে থামাইয়া চুপ করাইয়া বসায় দেয়, সে তার কথা শ্যাষ করতে পারে না। রাগে গুস্বায় তার তহন ফাল পাড়তে মন চাইতেছিল। হালার পুত হুজুর তুমি জুম্মাবারে মসজিদে কতো ভালু ভালু খুতবা পড়ো, বয়ান দাও, খোদার পরে ইস্ত্রীর স্বামীরে সেজদা করা উচিত, যে ইস্ত্রীরি সোয়ামীর অবাইধ্য হয় ফেরেশতারা তারে অবিশাপ দেয় আর আইজক্যা তুমার জুবান খালি এই দিক হেই দিক কয়? আমি আর বুজি না। মহিলা দেকছে কয়টা, তাগো কাছ থিকা সময় অসময় বাড়িত যাইবার কালে চালটা, ফলটা পায়, উনাগো নিয়া উনি আইজকে কিছু আর বইলবো না। আর হুজুর কি কইতেছে ভদ্দরলুকের ভাষায়, তার বেশির ভাগ তো করম আলীই বুঝবার পারতাছে না আর সফুরা বুইঝপে তার কটুটা। বেলা গড়াইয়া আসরের আজানের ওয়াক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া গ্যাছে দেইখ্যা হুজুর সালিশ শ্যাষ গুশুনা করতে চাইলেন। জিগাইলেন, করম, তুমার আর কিছু বলনের আছে? করম মনে মনে উত্তর দিলো, আর কিছু? আরে আপনে তো কিছুই কইলেন না। কিন্তু মুহে কইলো, না হুজুর আর কিছু বলনের নাই। পাশে বসা মাতবর সাব কইলেন, সালিশ ডাকনের খরচা দাও তাইলে, সালিশ শ্যাষ করি। আইশ্চইয্য হইয়া মাতায় হাত দিয়া করম কইলো, সালিশের আবার খরচা কি মাতবর সাব? হুজুর গুয়ামুড়ি হাসি দিয়া কইলেন, আছে আছে, খরচ আছে। দুনিয়াতে কুনু বালা জিনিস খরচ ছাড়া হয় নাকি, মিয়া? মাতবর সাবও সায় দিলেন, খাঁটি কতা, একদম ঠিক কতা। মাতবর সাব কইলেন তখন, তুমার বউ তো সালিশে আসপার চায় নাই, তারে যে ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার পাঠায়া ধরাইয়া আনলাম নৌকা ভাড়া দিয়া, তার খরচ কে দিপো, শুনি?

উফায় না-পাইয়া কান্দা কান্দা গলায় কইলো করম, খরচ কতো দেওন লাগবো? হুজুর কইলো, তিনশো টাহা মাত্তর। এমনেতেই ভাদ্দর মাসের গরমে গা পুড়তে ছিলো আর অহন তো মনেও পুড়ানি শুরু হইলো। এক ফুটা বাতাস নাই কুন ধার থাইক্যা। করম হুজুর আর মাতবর সাবের দিকে চাইয়া কইল আমার বিচার এর কি রায় হইলো, বউক্কি যাইপো আমার লগে? হুজুর কইলো হ্যার যাইবার মন চাইলে হ্যায় যাইপো, আমরা তো আর তারে জুর কইরতে পারি না। টাশকি খাওয়া করম একবার মাতবর সাহেবের দিকে চায় আর একবার ইমাম সাহেবের দিকে। ভয়ে তেষ্টায় করমের বুক থাইকা গলা পর্যন্ত শুকাই গ্যাছে। তারপরও গলার জুর আইন্না আবার কইয়া উঠল, আমি গরীব মানুষ এত্তো ট্যাহা কুনখানে পামু? মাতবর সাব বিরক্ত গলায় কইলেন, কুতায় পাবি তার আমি কি জানি? তোর বউ আননের জন্য দফাদার পাঠাইলাম, তার উপর নৌকা বাড়া, এগুলো কে দিবো শুনি? এগুলা খরচ আছে না? লুঙ্গির খুটার থিক্কা ট্যাহা নগদ একশো গুইন্না গুইন্না হুজুরের হাতে দিয়া করম বাকি টাকা সত্বর দিয়া দেয়ার কতাও দিলো সবার সামনে মাতবর সাবের কাছে। কেউ কুনো দিশা পাইবার আগেই এরপর যাইয়া খপ কইরা সফুরার হাত দরলো। কইলো, ও বউ গ্যালে গ্যাছে তিনশো ট্যাহা, তুইও বুঝছস আর আমিও বুঝছি। ল এইবার বাড়িত ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষরণ

মানিব্যাগটা পকেটে নিয়েছে কিনা এই নিয়ে হারুন তিনবার চেক করলো। প্রত্যেকদিনই তা করে। অফিসে যাওয়ার সময় তার চিরুনি, মানিব্যাগ, রুমাল, চশমা, অফিসের ফাইল প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটে খুঁটে বার বার চেক করে নেয়। অফিসের গাড়ি আসার ঠিক দশ মিনিট আগে সে রোজ নিচে নেমে যেয়ে পোচের কাছে হাঁটাহাঁটি করে। পাছে তার জন্য না আবার অন্য কাউকে তুলতে দেরি হয়ে যায়। কোনো কারণেই তার রুটিন এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। খুব সাবধানী ছেলে সে, খুব সাবধানী। কোনোকিছু নড়চড় কিংবা হারানোর সুযোগ তার কাছে নেই। নিজের জামা-কাপড়, ফাইলপত্র সে নিজের মতো গুছিয়ে রাখে, কারো সাহায্যের অপেক্ষায় নেই। নোরার অসহ্য লাগে এসব মিচকেপনা। ছেলেরা হবে ছেলেদের মতো-একটু অগোছালো, ম্যানলি। জিনিসপত্র হারাবে, খামখেয়ালিভাবে চলবে, হাঁক-ডাক করবে, না-এ একেবারেই ম্যান্দা মারা যাকে বলে। সিগারেট পর্যন্ত খায় না! বলে কিনা স্বাস্থ্যের জন্য হানিকারক। সিগারেট না খেলে কোনো ছেলেকে কি ছেলে ছেলে মনে হয়? বেপরোয়া কোনো ব্যাপারেই নেই হারুন, সব হিসেব করে তবেই পা ফেলে সে। নোরার হাতে একবার বিকিনি পরা মেয়ের ছবি দেয়া তাসের প্যাকেট দেখে এমনভাবে চমকে উঠেছিল যেন নোরা হাতে সাপ নিয়ে ঘুরছে। মিনমিনে গলায় বললো, তুমি কি তাস খেলো নাকি? নোরা তার পক্ষে যতোটা স্বাভাবিক থাকা সম্ভব ততোটা স্বাভাবিক গলায়ই বললো, পেশেন্স খেলা আমার ছোটবেলার অভ্যাস। কোনো কিছু নিয়ে প্রচণ্ড রেগে গেলে বা মন খারাপ থাকলেই যে সে সারাক্ষণ পেশেন্স খেলে, সেটা আর বললো না। এ নিয়ে বাবা মায়ের আর্দশে বড় হওয়া এই ছেলে আবার কী উপদেশ দিতে বসবে কে জানে?

হারুন খুবই অস্বস্তির সাথে চারপাশ সতর্ক চোখে দেখে নিয়ে মিনমিনিয়ে বললো, তাহলে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে খেলো, যাতে আব্বা-আম্মা না-দেখেন। বোঝ অবস্থা, শুধু পেশেন্সই তো খেলছে নোরা, নাকি? বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তো আর টুয়েন্টি নাইন খেলছে না। সেটুকুতে থামলেও নোরা হয়তো মানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারত, কিন্তু আবার বলে উঠলো, আর একটা ভালো ফুলের কিংবা পাখির ছবি দেয়া তাসের প্যাকেট কিনে নিও। এগুলা দেখলে আব্বা-আম্মা আবার মাইন্ড করতে পারেন। ঘরের বউ তুমি। আর সহ্য করতে পারলো না নোরা। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে ফেললো, বাপি এই প্যাকেটটা আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে এনে দিয়েছেন, তা জানো? হারুন আরো বিব্রত হয়ে অসহায় গলায় বলে উঠল, ঠিক আছে, আমি না হয় অফিস থেকে আসার পথে গুলশান থেকে তোমার জন্য এক প্যাকেট বিদেশি তাস নিয়ে আসবো। রাগে দুঃখে, অভিমানে নোরা গুম হয়ে রইলো। এমনিতে হারুন ওর মন রাখার জন্য অনেক কিছুই করে, করতে চায়, কিন্তু সব সময় লোকে কী বলবে, লোকে কী বলবে, কোনটা করলে লাভ হবে এই তটস্থ ভাবটা নোরা মেনে নিতে পারে না। রাতে যখন নোরা ভিক্টোরিয়া সিক্রেট কিংবা রাফ লওরেন-এর রাত পোশাক পরে ওর পাশে বসে, হারুন ঠিক করে ওর দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে না। এমনভাবে তাকায় যেনো নোরার গায়ে কোনো কাপড় নেই। অস্বস্তি নিয়ে জানালার পর্দা টানতে থাকে যাতে পাশের বাড়ির কেউ ওদের দেখতে না পায়, বারান্দার দরজা বন্ধ রাখে। লজ্জায়-অপমানে নোরা নীল হয়ে, অনেক স্বপ্ন দেখে কেনা পছন্দের সে সব পোশাক তুলে রেখে আড়ং থেকে সুতির ম্যাক্সি কিনে নিয়েছে।

নোরার বাপি কী দেখে যে তাকে এই প্যাঁত প্যাঁতে মধ্যবিত্ত পাত্রের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন কে জানে? নোরা কিছুতেই এই বিয়ে করতে চায়নি। মাথায় তেল দিয়ে, স্যুট-টাই পরে যখন ভ্যাবলার মতো নোরার সাথে কথা বলতে এসেছিল, তখনই নোরা তাকে চরম অপছন্দ করে ফেলেছিলো। আর হারুনের মা'তো বলতে গেলে তার হাত-পা সব টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এতো মধ্যবিত্ত মানসিকতায় নোরা মানিয়ে নিতে পারবে না, বাপিকে বার বার বলেছিল সে। কিন্তু বাপির এক কথা, স্টুডেন্ট খুব ভালো ছিল, অফিসে পারফরমেন্স খুব ভালো। খুব দ্রুত খুব উন্নতি করবে। বাইরে যাবে ট্রেনিং-এ, ফিরে এলেই কোম্পানি থেকে আলাদা ফ্ল্যাট আর আলাদা গাড়ি পাবে। মাত্র বছর দু-তিনের ব্যাপার বইতো নয়। চিরজীবন নোরাকে শ্বশুর-শাশুড়ির ঘর করতে হবে না। এ ক'টা দিন হাসতে হাসতে দেখতে দেখতেই চলে যাবে। আর আপাতত নোরার যা দরকার তার জন্য বাপি তো আছেই। অফিসের বড়কর্তাদের নজরে আছে এই ছেলে, উন্নতি করবে অনেক। নোরার 'না' আর নোরার মায়ের হ্যাঁ-না'কে আমলে না-এনে বিয়ের আয়োজন করে ফেললেন বাপি। নোরা জানে বাপি তাকে কতো ভালোবাসে, তার ক্ষতি হবে এমন কাজটি বাপি কখনো করবে না। তাই আর অমত না-করে রাজি হয়ে গেলো। আর হারুন দেখতে এমন খারাপ কিছু নয়, মিথ্যে বলবে না নোরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর এই মধ্যবিত্ত বাড়ির নিরানন্দময় জীবন। প্রতিদিন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে বলে নোরা এখনো বেঁচে আছে। ক্লাশের পরে করিডোরে, লাইব্রেরিতে আর ক্যান্টিনে জম্পেশ আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে। অনেক সময় ফেরে না, মায়ের কাছে চলে যায়। মায়ের সাথে শপিং করে, রাতে বাইরে খেয়ে মা তাকে ড্রপ করে যান। যখন বড় আপুনিটা বিয়ে করে বাইরে চলে গেলেন, তখন থেকে নোরা আর মা দুজনেই ভীষণ ভালো বন্ধু হয়ে গেলো। একসাথে ঘোরা, শপিং, পার্টি। হারুন অবশ্য এসব নিয়ে তাকে তেমন কিছু বলে না আর শ্বশুর-শাশুড়িকে তো তেমন পাত্তাই দেয় না নোরা। দরকার নেই বাবা বেশি ভাবের আর ঝগড়ার। তারচেয়ে তোমরা তোমাদের মতো থাকো, আমিও আমার মতো ভালো থাকি। কদিন থেকে ওদের বন্ধুদের গ্রুপ বেশ গরম, ঢাকায় 'টাইটানিক' এসেছে। বন্ধুরা সব্বাই যাচ্ছে গ্রুপে গ্রুপে সিনেমাটা দেখতে, কেউ কেউ তো তিন চার বার দেখে ফেললো এই ছবিটা। যদিও নোরা ভিসিডিতে দেখেছে এই ছবিটা কিন্তু হলে যেয়ে বড় পর্দায় ছবি দেখার আনন্দই আলাদা। বন্ধুরা বার বার বলছে, চল একসাথে যাই, কিন্তু নোরা আসলে হারুনের সাথেই যেতে চায় এই সিনেমাটা দেখতে। এতো রোমান্টিক একটা ছবি, তেমন কারো পাশে বসে দেখতে ইচ্ছে করে। যদিও হারুন মোটেও রোমান্টিক টাইপ না কিন্তু তবুও, ওর স্বামী তো বটে। হাতে হাত রেখে দেখবে দুজন একসাথে।

রোজ ফিরতে হারুন দেরি করে ফেলে। সেদিন সন্ধ্যায় নোরা রাগের চোটে কেঁদেই ফেললো। তোমার কোনো আগ্রহ নেই আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার। কথাটা সত্যি সিনেমা-টিনেমার প্রতি হারুন তেমন আকর্ষণ অনুভব করে না। কিন্তু নোরার কাছে ধরা পরে হারুন ভাবলো, ঠিক আছে কাল যাবোই যাবো নোরাকে নিয়ে সিনেমায়। নতুন বউয়ের চোখের পানিতে সে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। বিকেল বিকেল হন্তদন্ত হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। একটু আগে থাকতে না-গেলে আবার টিকেট পাওয়া যাবে না, দুদিন আছে আর। বাড়ি ফিরে দেখে নোরা তৈরি। নোরা আজ স্বামীর সাথে বেরোচ্ছে বলে কানাডা থেকে আপুনির পাঠানো মেরুন ফ্রেঞ্চ শিফনের শাড়ি পরেছে। এমনিতে শিফনের সাথে স্লিভলেসই ভালো লাগে কিন্তু হারুনের মুখটা মনে করে সে একটা বড়োসড়ো ব্লাউজ পরে নিল। সুন্দরী নোরাকে কার্ল করা চুল আর মেকাপে অপ্সরী লাগছিল। হারুন হাত-মুখ ধুয়েই বেরিয়ে পড়ল নোরাকে নিয়ে। গলির মাথায় যেয়ে রিকশা নেবে জানা কথা গলির ভিতর সে কিছুতেই বউয়ের সাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রিকশা দিয়ে যাবে না। পাড়ার মুরুব্বিরা সব্বাই আছেন। ছিঃ!

পুরো সিনেমাটা নোরা হারুনের হাত ধরে দেখল। হলের অন্ধকারে, নোরার স্পর্শ আর সিনেমার গল্পটা সদাসাবধানী হারুনকেও কিছুটা তরল করে তুলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করে যখন লিওনার্দো ডি ক্যাপরিও তার প্রেমিকাকে বাঁচানোর জন্য যখন নিজের জীবন দিয়ে দিলেন, নোরা তা দেখে হাপুস নয়নে কেঁদেই গেলো। সিনেমা শেষ হতে হতে রাত প্রায় ন'টা। নোরা এখুনি বাসায় ফিরতে চাইছে না। সেই তো যেয়ে ঘুপচি ফ্ল্যাটে বসে থাকা। তার থেকে আজকে ও বাইরে হারুনের সাথে ঘুরবে, খাবে। অন্যদিন হলে হারুন হয়তো রাজি হতো না কিন্তু সিনেমার গল্পটা, প্রায় সুনসান হয়ে আসা রাতের নিরিবিলি ঢাকা, আকাশের বুক চিরে জ্বলে থাকা অসংখ্য নাম না জানা তারা আর পাশে বসে থাকা তন্বী তরতাজা বউয়ের চুলের সুগন্ধ হারুনকে দুর্বল করে ফেললো।

দুজন হাত ধরে এই প্রথম রিকশা করে যাচ্ছে। কোথায় খাবে, কোথায় খাবে ভেবে ভেবে নোরা বলল, চলো মোহাম্মদপুরের বিহারী ক্যাম্পে যাই, রুমালি রুটি আর বটি কাবাব খাবো। সেখানকার বটি কাবারের স্বাদই আলাদা। হারুন আজকে নোরার সব কথাতেই রাজি। রিকশা আসাদ গেটের কাছ দিয়ে যাচ্ছে। ঐ জায়গাটা রাত না-হতেই ভীষণ নিরিবিলি হয়ে যায়। বিরাট বিরাট সব গাছ আর ঝোপ। লোক চলাচল খুবই কম। এই নির্জনতাকে কাজে লাগিয়ে ওরা দুজন রিকশায় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। হঠাৎ ভূমি ছেদ করে দুই পাশ থেকে দুটো হোন্ডা এসে নোরাদের রিকশাটাকে থামিয়ে দিলো। দুটো হোন্ডায় চারজন টগবগে যুবক বসে আছে। তাদের পোশাক-আশাক রীতিমতো আকর্ষণীয়। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খুবই ধনী ঘরের ছেলে। রিকশা থামিয়ে দিয়ে খুবই পরিচিত ভঙ্গিতে বললো, কোথায় যাচ্ছেন এতো রাতে? হারুন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নোরার দিকে তাকালো, ভাবলো নোরার পূর্ব পরিচিত কেউ। নোরা ভীত চোখে তাকালো হারুনের দিকে, হারুনের চেনা কেউ কি? ওরা দুজনই আমতা আমতা করতে লাগলো, কে কি জবাব দিবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না। ছেলেগুলো খুব ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে পরের মুহূর্তে ভোল পাল্টে নোরাকে আদেশ দিলো, ম্যাম, আপনি আমাদের সাথে আসুন তো, আমাদের একটা দরকার আছে। নোরা আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল, কী দরকার? হোন্ডার পেছনে বসা একটা ছেলে ফিচলে হাসি দিয়ে বললো, কী দরকার বুঝো না সুন্দরী? কথাটা শেষ হতে বাকি ছেলেগুলো একসাথে হেসে উঠল।

হারুন আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল, কে আপনারা, কী চাইছেন? পেছনে বসা দুজন তড়াক করে হোন্ডা থেকে নেমে একজন হারুনের দিকে এগুলো আর একজন নোরার দিকে। হারুনের মাথায় শীতল ধাতব কী একটা বস্তু ঠেকাল আর একজন এসে দাঁড়ালো নোরার পাশে। অস্ত্র ঠেকিয়ে রেখেই হারুনের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে কিন্তু পরিষ্কার গলায় বলল, আমরা তোমার বউয়ের ইয়ার লাগি, চিনতে পার নাই আমাদের মাঙ্গির পুত? হারুন ভয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যহারা হয়ে গেলো। তারপর হাতজোড় করে মিনতি করতে লাগলো তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে। সেই তরুণটি আরো শীতল গলায় বলল, বেশি ট্যা ফো করবি তো এখানেই লাশ ফেলে দিয়ে মাইয়া নিয়া চলে যাবো। তুই কি চাস? চুপচাপ তোর বউকে বল আমাদের সাথে আসতে। কোনো গণ্ডগোল মানেই তোর লাশ শালা। হারুন তো তো করতে করতে নোরার দিকে তাকালো কিন্তু গলা দিয়ে পরিস্কার কোনো আওয়াজ বেরোলো না। হোন্ডায় বসা এক তরুণ একটা বোতল থেকে তার গলায় কিছু ঢালতে ঢালতে বলল, ইজি বস, ইজি। কোনো ব্যাপার না, দুই ঘণ্টা আপনি একটু ঘুরেন-ঘারেন, হাওয়া বাতাস খান। দুই ঘণ্টা পর এসে বউরে নিয়ে যাবেন, কোনো ব্যাপার না বস। ভয়ে হারুনের প্যান্ট ভিজে গেছে। কখন যে হয়ে গেছে সে টের পায়নি। হারুন আবার তার পূর্বের সাবধানী অবস্থায় ফিরে গেলো। নোরার দিকে মিনতি ভরা চোখে তাকালো, অসহায় নোরা কী করবে বুঝতে পারছে না। নোরার শরীরটা পুরো কাঠের মতো হয়ে গেলো হারুনের আচরণে। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি অন্য হাতে হারুনের পেটে জোরসে একটা ঘুষি মারতেই হারুন হড়বড় করে নোরাকে বলতে লাগলো, তুমি ওদের সাথে যাও। নোরা প্রায় চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই তার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটা ধাতব গলায় বললো, কোনো সীন করার চেষ্টা করবেন না ম্যাম। বলতে বলতেই তাকে টেনে নিয়ে হোন্ডায় তুলে ফেললো। হারুনের কাছে দাঁড়ানো ছেলেটা রিকশাওয়ালার গালে জোরে এক থাপ্পড় দিয়ে বলল, পিছনে তাকাবি না, উল্কার মতো উড়ে যা।

এতক্ষণ রিকশাওয়ালা ভয়ে সিঁটিয়ে ঘটনা দেখছিলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে রিকশা ঘুরিয়ে দিলো ছুট। নোরাকে হোন্ডার মাঝে বসিয়ে একজন নোরার সামনে বসল চালকের আসনে আর একজন নোরার পেছনে। হোন্ডাগুলো ক্রিসেন্ট লেকের পাশের বড় বড় ঝোপের অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে একটা আওয়াজ আসলো, দু'ঘণ্টা পরে তাহলে ব্রাদার। কিছুদূর যাওয়ার পরই রাতের ঢাকার তাজা হাওয়া হারুনের মাথায় লেগে হারুনের ভ্যাবাচ্যাকা ভাব চলে যেয়ে মাথা দ্রুত কাজ করতে শুরু করলো। সদা সাবধানী হারুন কিছু দূর যেয়ে রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে দিলো। ভাড়া হাতে নিয়ে অবাক চোখে রিকশাওয়ালা হারুনকে দেখলো তারপর বিনাবাক্যে কেটে পড়লো।

সদাচঞ্চল নোরা এখন অনেক চুপচাপ। সে রাতের পর থেকে সে অপ্রয়োজনে কোনো প্রয়োজনেও হারুনের সাথে কোনো কথা বলে না। যদিও হারুন তাকে অনেকভাবে নিজের অসহায়ত্বাটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে, পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিইবা করতে পারতো হারুন তখন। আর তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ তো ঘটনাটা জানে না। নোরার বাপি আর হারুন মিলে ব্যাপারটাকে খুব দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করেছে। কোনো স্ক্যান্ডাল হওয়ার সুযোগই দেয়নি তারা। হারুন সব ভুলে যাওয়ার জন্য তৈরি আছে। নোরাকে সে যেমন ভালোবাসতো, তেমনিই ভালোবাসবে। নোরাকে সেসব নিয়ে ভাবতে হবে না। নোরা তার পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দিক, ঘর-সংসারের দিকে মনোযোগ দিক। জীবনে চলতি পথে কতো ঘটনাই ঘটে, সব ধরে রাখলে কি চলে? দুই বছরের ট্রেনিং-এর জন্য সামনে হারুনকে অফিস থেকে লন্ডনে পাঠাচ্ছে। ভিসা কাগজপত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। কতো কাজ। নোরার ভিসাও নিতে হবে, ফ্যামিলি অ্যালাউন্স পাবে অফিস থেকে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে নোরাকে নিয়ে ইউরোপ ট্যুরটাও সেরে ফেলবে। লন্ডন, প্যারিস, রোম-কতোদিনের স্বপ্ন তার। আর লন্ডন থেকে ফিরে এসে গুলশানের ফ্ল্যাটে উঠবে। এই এঁদো শুক্রাবাদে আর নয়। সামনের সোনালি দিনের অনেক গল্প হারুন তাকে দিন-রাত শুনিয়ে যাচ্ছে।

নোরা গুম হয়ে সে সব শোনে। আসলে কি কোনো কথা নোরার কানে যায় কি না তাও জানে না। হঠাৎ করে চতুর্দিক নোরার খুব কুৎসিত মনে হতে থাকে। সব কিছুতেই তার বমি পায়। সযতনে হারুনের স্পর্শ সে এড়িয়ে চলে। কী করবে কার কাছে যাবে কিছুই ভেবে পায় না। ক্লাশ বন্ধ, পড়া বন্ধ। এই পড়াশোনা, বন্ধু-বান্ধব সব কিছুই অর্থহীন মনে হয় তার। একটা রাত তার জীবনটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। কী করে সে জীবনটাকে আবার ঠিক করবে? হারুনকে মুছে ফেলবে, নাকি ভয়াল সেই রাতটাকে? বাপি-মা'ও সারাক্ষণ তাকে একই কথা বলে যাচ্ছে, ভুলে যা নোরা, ভুলে যা। কী ভুলে যাবে নোরা? তার জীবনসাথী কতোগুলো বদমাশের হাতে তাকে ফেলে কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছে সেটা, নাকি কয়েক ঘণ্টায় তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়টাকে। নাকি সমাজ আর লোকলজ্জার ভয়ে সবার এই ঘটনাটাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াসটাকে? বার বার গোসল করেও অশুচি ভাবটা যায় না নোরার। নখ দিয়ে খামচে নিজের শরীরটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলতে যদি পারতো সে! কিংবা আরো বড় একটা জঘন্য শাস্তি দিতে পারতো তার শরীরটাকে! গুম হয়ে বসে সে সারাদিন এমনই অনেক কিছু ভাবে। কী ভাবে সে নিজেও জানে না। শূন্য মন আর দুচোখ নিয়ে দিনরাত একা ঘরে নোরা আপন মনে তাস শাফল করে, বিছানার উপর তাস বিছায় আবার শাফল করে, আবার বিছায়। যদিও নোরা ভালোভাবেই জানে একটা দুর্ঘটনার কাছে জীবন সমর্পণ করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু অহর্নিশি ভেতরে বয়ে চলা এ ক্ষরণের হাত থেকে সে বাঁচবে কোন্ উপায়ে? কতোদিন এ সভ্য সমাজে এ অপরাধের বিচার হবে না?

০৪.০৯.০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মজিদ মিয়া

মাইর খাইয়া মজিদের চাইর লম্বর বউ ফুলির চিৎকার শুরু হইলো আবার। দিন নাই, রাত নাই পান থাইকা চুন খসুক না খসুক মজিদ ফুলিরে মারে। মজিদ আর ফুলির বিয়া সাত মাস শেষ হইয়া আটে পড়ল। প্রথম ছয় মাস ভালাই ছিল। মজিদ বেলা অবেলায় ঘরে আইতো, বউ বউ কইরা জান দিতো। গন্ধ ত্যালটা, সাবান কিংবা হাট বারে রঙিন চুড়ি, ফিতাটা নিয়ে আইতো বউয়ের জইন্য। যহন তহন দরজায় খিল দিইয়া বউরে লইয়া রংগ রস করতো। কতো ভাবে ফুলিরে আদর করতো। পিরিতের কতা কইতো। লজ্জায় ফুলি খালি পলাইতে চাইতো, চোখ ম্যালতে পারতো না। সারা রাইত ফুলিরে ঘুমাইতে দিতো না, জাগাইয়া রাখতো। কিন্তু মাস দুই তিন ধইরা কী যে হইলো মজিদের যহন তহন ফুলিরে মারে। কি কারণে মারে ফুলি তা আন্দাজই করতে পারে না। মজিদের মন জুগানোর লাইগ্যা ফুলি জান দিয়া কাম কইরা যায়, মজিদের কতার আগে সব কইরা থোয়, তাও সোয়ামীর মন পায় না। কালাকান্দির হুজুরের কাছের থন একটা বশীকরণ তাবিজ আনবো কিনা বুইজা পাইতেছে না।

আইজ সকালে উইঠ্যা হাত মুখ ধুইয়া আইলো পান্তা খাওনের লাইগ্যা। ফুলি পান্তা দিতেই, দুই লুকমা মুখে দিয়ে ফুলিরে গালি। পান্তা নাকি গান্ধা হইয়া গ্যাছে, ঠিকমতো ভিজান হয় নাই। তাড়াতাড়ি ফুলি খাইয়া দেকলো, না পান্তাতো ঠিকই আছে, গান্ধা হয় নাই। এই কথা হুইন্যা লগে লগে মজিদ তড়াক কইরা উইঠ্যা ধরলো ফুলির খোঁপাত। মারতে মারতে ফুলিরে মাটিতে ফালাইয়া দিয়া বাইরের ঘরের থন লাঙল লইয়া হনহনাইয়া চইলা গ্যালো মাঠে। বিলাপ করতে করতেই ফুলি দুপুরের পাক সারলো।

মাঠ থাইক্যা আইসা মজিদ গ্যালো গোসলে। আইসা খাইতে বইলো। ফুলি তাড়াতাড়ি গরম ভাত আর ডিমের সালুন দিলো। ডিমের সালুন মজিদ খুবই ভালা পায়। ফুলিতো মনে করছিলো সোয়ামী খুশি হইব। মজিদ কইয়া উঠলো, বান্দির ঝি, এইডা কি রানছস? নুন দিয়া ঘাইট্যা রাখছোস, মুহে দেওন যায় না। নুন কি তোর বাপের বাড়ি থাইক্যা আহে নাকি হারামজাদী? হিসাব নাই? ফুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিন মিন কইরা কইলো, রান্ধনের সুময় জরিনা চাচি আইছিলো। হ্যারে দিছিলাম লবণ চাখনের নাইগ্যা। হ্যায় তো কইলো ঠিক আছে।

কি মাইনষের মুহের জুডা তুই আমারে খাইতে দেছ? তোর এতো বাড় বাড়ছে হারামজাদি? তরকারির কাঠি দিয়াই আরম্ভ করলো এইবার মজিদ। আমি খাওনের আগে তুই অন্যরে দেছ? আইজকা তোর একদিন কি আমার একদিন ফকিন্নির ঝি।

ফুলি মারে-বাবারে কইয়া চিৎকার কইরা কানতে লাগলো। কিন্তু মজিদের তাতে কিছু যায় আহে না। মনের শান্তিমতো ফুলিরে পিডাইয়া, তারপর লাথি মাইরা ভাত-তরকারি উল্টাইয়া দিয়া মজিদ হাটে চইলা গ্যালো। ফুলিও যাতে খাইতে না-পারে তার লাইগ্যা সব নষ্ট কইরা দিলো। থাক শয়তান মাইয়া লুক, তুই উপাস থাক।

সইন্ধ্যায় হাট থাইকা আইসা ফুলিরে কইলো, ওই আবাগীর বেটি, হাত মুখ ধুমু, দে লুটা-গামছা দে। ফুলি ঘরের মইদ্যে থাইক্যা গামছা আইন্যা হাতে দিলো মজিদের। লুটা আনার জন্য কলতলায় যাইয়া নিচা হইতেই পাছায় মজিদের লাতিতে ফুলি উল্টাইয়া পইড়া গ্যালো। মজিদ লাতির উপর লাতি দিতে লাগলো। বিজা গামছা তুই গরে হান্ধায় রাখছোস ক্যান? ওই মাগী, তুই আমাকে বিজা গামছা দিলি যে? ফুলি ব্যাতায় বেদনায় চিক্কুর পাইড়া কানতে লাগলো। বিকালে ফুলি গরের চালার থাইক্যা খডখডা কডকডা গামছা উডাইছে। বিজা ক্যামনে হইবো?

সোয়ামীর এই ব্যবহারে দিশা বিশা না পাইয়া ফুলি কাঁনতে কাঁনতে জিনগাইলো, তুমি এরহম করো ক্যান? তুমি কি আর আমারে রাখপা না?

এতোক্ষণে মজিদ একটু ঠাণ্ডা হইলো। দীর্ঘদিন পরে তার মুহে এট্টু হাসি আইলো। যাক, তার চেষ্টায় কাম হইছে। হাসি মুখে দাওয়ায় বইলো মজিদ আস্তে ধীরে। তারপর নূরানী হাসি মুহে আইন্না কইলো, এতো মাইর মারি তুরে, তুই এইডা এহনো বুঝপার পারস না?

হেরপর এতিম ফুলি মজিদের অনেক হাতে পায়ে ধরলো। কিন্তু ইমাম সাব আর গাঁয়ের তিনজন মুরুব্বিরে সাক্ষী রাইখ্যা মজিদ ফুলিরে ধর্মমতে শরীয়ত মুতাবেক তালাক দিলো। ফুলি নিজ হাতে লাগান উডানের গাছ, লাউ মাচান থাইক্যা শুরু কইরা হাঁস-মুরগী সবগুলারে বুকে লাগাইয়া বিলাপ কইরা কানলো। হেরপর মুরুব্বিদের কাছে মাফ সাফ চাইয়া বিদায় লইয়া চইলা গ্যালো। কই, কেউ জানে না।

এর ঠিক তিন মাস পরে গাঁয়ের মানুষ দেকলো খেতের আইলের মাঝ দিয়া মজিদ রুমাল মুহে লাজুক লাজুক ভাবে আগে আগে হাঁটতাছে আর তার পিছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিছনে সুন্দর মতো এক মাইয়া গুলাপী রঙের জরির শাড়ি পইরা মজিদের পাঞ্জাবীর কুনা দইড়া আহে। মাইয়ার মাতায় ইয়া বড়ো গুমটা। চকের বাতাসে গুমটা এট্টু পর পর পইড়া যায়, তহন গিল্টি করা নথের পাশ দিয়া কাজল কালো বড়ো বড়ো দুইটা মায়াময় চুখ দেহা যায়। মনে লয় পাঁচ লম্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌধুরী আলমের গল্পখানা

নকলের ভরসায় বার তিনেক ম্যাট্রিকে পাশ দেয়ার চেষ্টা করিয়া অবশেষে ক্ষান্ত দিলেন চৌধুরী আলম। তারপর কিছুদিন ইতিউতি ঘুরিলেন। কি করিবেন, কি করা যায়, অল্পসময়ে অধিক উপার্জনের সকল নাড়িনক্ষত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করিয়া বিদেশ যাওয়াটাকেই শেষ পর্যন্ত বাছিয়া লইলেন। তাহাদের উপজেলার নাঈম মাষ্টারের ছেলে মোখলেছ জার্মানী থাকে। কিছুদিন আগে দেশে আসিয়াছিল গলায় বিরাট ক্যামেরা আর হাতে আলোজ্বলা ঘড়ি পরিয়া। মনে হয় সমস্ত উপজেলায় যেনো আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। টেরি-কাটা সিঁথি নিয়া সে যখন বাজারে আসিত তখন এবার বিয়ে করিবে কিনা তাহা জানিবার জন্যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা প্রায় উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সব গুণবতী কন্যাদের মহান পিতাদের বাড়িতে বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই শেষ পর্যন্ত অসম্ভবে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার জন্যে। বাড়িতে নানা পদের আশ্চর্য জিনিসপাতি নিয়া আসিয়াছে সে। মেশিন টিপিয়া মশলা বাটনা যায়, ভাত রান্না করিবার জন্যেও মেশিন আনিয়াছে। যদিও গ্রামে বিদ্যুৎ পাওয়াই মুছিবত। বিদ্যুৎ একদিন থাকে তো তিনদিন থাকে না। কিন্তু সেটা বড় কথা নহে, বড় কথা হইলো সেসমস্ত মেশিন নাঈম মাষ্টার তাহার কাচারি ঘরে কাঁচের পাল্লা দেয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, সেগুলো দেখিতে প্রায়ই এ গ্রাম সে গ্রামের লোক তাহার বাড়ির কাচারিতে যাইয়া বসেন। সম্ভ্রমের সহিত সেগুলোকে নাড়াচাড়া করিয়া নাঈম মাষ্টারের ভাগ্য নিয়া ঈর্ষান্বিত হন ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

পিতাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ভাগে পাওয়া কিছু জমিজমার বেশ অনেকখানিই বন্ধক দিয়া আর ভগ্নিপতিদের নিকট হইতে কিছু ঋণ লইয়া দালালের সহিত আঁতাত করিয়া জার্মানী যাইবার ব্যবস্থা সেও করিয়া লইল। তারপর এক শুভদিন দেখিয়া মায়ের দোয়া মাথায় লইয়া উড়োজাহাজে চাপিয়া বসিল। আসিয়া নামিল জার্মান দেশে। প্রথমে পুলিশের হ্যাপা। বহুকষ্টে সে হ্যাপা কাটাইয়া ইমিগ্রেশন পার হইয়া বিমানবন্দরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। মুগ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ে চারপাশে ঘাড় ঘুরাইয়া যতোই তাকাইতেছিল তাহার বাক ততোই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। খুশি হইয়া মনে মনে তিনবার কহিল, সুবানাল্লাহ–সুবানাল্লাহ–সুবানাল্লাহ। দেশ হইতে আসিবার সময় দালাল তিনজনের ঠিকানা দিয়াছিলেন, কাহাদের সাথে তাহাকে যোগাযোগ করিতে হইবে। তাছাড়া সে নিজেও তাহার ভগ্নির শ্বশুরকুলের এক নিকট আত্মীয়ের ঠিকানা নিয়া আসিয়াছে। এখন তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া যোগাযোগের পালা। ভগ্নির শ্বশুরকুলের আত্মীয়র তাহাকে এয়ারপোর্টে নিতে আসিবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কাহাকেও সেরকম দেখা যাইতেছে না। কোনদিকে যাইবে, কোথায় খুঁজিবে ভাবিতে ভাবিতে দিশাহারার ন্যায় ে সামনে পা বাড়াইলো। দরজার বাহিরে আসিতেই ঠাণ্ডা একখানা দমকা বাতাস তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিল। বুঝিতে পারিতেছিল না কি করিবে। বোঝা না বোঝার দোলার মাঝেই সাথে করিয়া আনা কিছু শীতের কাপড় বাহির করিয়া পরিয়া ফেলিল। শুরু হইলো তাহার যাত্রা অজানার উদ্দেশ্যে।

পরিচিত বাঙালি ভাইদের পরামর্শে উকিল ধরিয়া, দেশ হইতে পিতা আর ভগ্নিপতির সাহায্যে কিছু ভুয়া কাগজপত্র আনিয়া, পাসপোর্টের নাম ঠিকানা বদল করিয়া রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর কেস ঠুকিয়া দিল। দেশে সে অমুক বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা ছিল, অমুক তমুক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ তাহাকে সরকারি দলের রোষানলে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহার এখন বাংলাদেশে জীবন বিপন্ন ইত্যাদি প্রভৃতি বহু মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সে জজ সাহেবদের মন গলানোর চেষ্টা করিল। যদিও প্রথম দুইবার অকৃতকার্য হইলো, তৃতীয়বার আবার নতুন নাম ঠিকানা, নতুন কাগজপত্র লইয়া আবার চেষ্টা দিল, এবার অন্য আর এক শহর হইতে। দান দান তিনদান। এইদানে জজসাহেব কিঞ্চিত বিগলিত হইয়া বিবেচনার জন্যে তাহার মামলা নথিভুক্ত করিলেন। কিন্তু পেট পুড়ে আগের শহরের জন্যে, তাছাড়া পরিচিত না থাকিলে কাজও পাওয়া যায় না। তাই সে আপাতত পুরনো শহরেই ডেরা গাড়িলো। কেইসের তারিখ আসিলে সে আসিয়া নতুন শহরে হাজিরা দিয়া যায়, মাসে মাসে সরকারের ঘর হইতে পাঠানো হাত খরচ নিয়া, পুলিশের খাতায় সহী দিয়া আবার পুরনো শহরে ফিরিয়া যায়। সেখানে সে একটি রেস্টুরেন্টে সপ্তাহে সাতদিনই দশ থেকে বারো ঘণ্টা ধোয়াপোঁছার কাজ করিয়া থাকে। থাকে কিছু বাঙালি ভাইয়ের সহিত একটি বাড়ি ভাগাভাগি করিয়া। সব ব্যাচেলর। বেশির দিনই রেস্টুরেন্ট হইতে খাইয়া আসে বিধায় খাওয়ার খরচও তাহার বাঁচিয়া যায়। মাস না ঘুরিতেই পয়সা, মাস না ঘুরিতেই হাত লাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু শেষ রক্ষা হইলো না। এইখানেও তাহারা কাগজপত্র নিয়া আবার সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগিলেন। গাট্টিপুট্টি বাঁধিয়া আবার না ফিরিয়া যাইতে হয় এই দুশ্চিন্তায় প্রায় পাগল হইয়া যাইবার দশা হইল তাহার। এতো টাকা খরচ করিয়া আসিয়া যদি এতোদিন পর খালি হাতে ফিরিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে কি হইবে? দেশে ফিরিয়াই-বা করিবে কি? অনেক ভাবিয়া শেষে দেশীদের পরামর্শমতো একটা জার্মান বুড়ি যোগাড় করা হইলো। বুড়ির শরীর ভর্তি অনেক দয়া। তিনি পয়সার বিনিময়ে এইসব বিপদগ্রস্ত বালককে উদ্ধার করিয়া থাকেন। একেবারে বিয়েতে চৌধুরী আলমের কেমন যেনো বাধো বাধো লাগিতে লাগিল। সারা জীবন বিবাহ নিয়া অনেক স্বপ্ন, কল্পনা ছিল তাহার। কিন্তু এ কিসের মধ্যে সে পড়িবে? অনেক ভাবিয়া ঠিক করিল কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করিবে। যে যে যার যার বাসায় থাকিবে। শুধু কাগজের স্বামী–স্ত্রী হইবেন তাহারা। তাতে পয়সা গেলেও ধর্ম, সমাজ আর কুমারত্ব তো টিকিয়া থাকিল, এইগুলাই যদি না-থাকিবে তাহলে এই জীবন রাখিয়া আর কি লাভ? বুড়ি মেমসাহেব তাতেও রাজি। চৌধুরী আলম হইবে তাহার চার নম্বর বাঙালি স্বামী। এর আগেও তিনি আরো তিনজন বাঙালি বালককে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই পেশায় তিনি বিস্তর অভিজ্ঞ। আগের স্বামীদের নিকট হইতে তিনি পোলাও, রোস্ট খাইতে শিখিয়াছেন। শাড়ি আনিয়া দিয়াছিল একজন বাংলাদেশ হইতে, তাহাও প্যাঁচাইতে জানেন অঙ্গে, বাংলাদেশ ও তাহার পারিবারিক কালচার সম্পর্কেও যৎসামান্য জ্ঞান আছে। পুলিশ ধরিলেও সমস্যা হইবে না, ম্যানেজ করিয়া লইতে পারবেন। কিন্তু তাহাকে টাকা প্রথমেই দিয়া দিলে ভালো, তাহার এখন কিঞ্চিত হাতটান যাইতেছে।

টাকার অঙ্ক শুনিয়া চৌধুরী আলমের পিলে চমকাইয়া গলায় আটকাইয়া বাঁধিয়া গেলো প্রথমে। কিন্তু এরচেয়ে যোগ্য পাত্রীও আর নাই। জার্মান পাসপোর্ট হইল একখানা সারাজীবনের নিশ্চয়তাপত্র। টাকাটা ভাবিলেই শুধু চলিবে না। আজকাল পুলিশের সন্দেহ আর উৎপাতও সাংঘাতিক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এতো টাকা তাহার হাতে সত্যই নাই। টাকা পাওয়ামাত্র তো সে দেশে পাঠাইয়া দেয়। তাছাড়া যিনি এই বুড়ি জার্মান মেম যোগাড় করিয়া দিয়াছেন তাহাকেও তো কিছু কমিশন দিতে হইবে। সেইটাও একদম ছোট কিছু না। যাহা ছিল তাহা অগ্রিম দিয়া, বাকি টাকা মাসে মাসে পরিশোধ করিবে অঙ্গীকার করিয়া, সাক্ষী রাখিয়া তাহারা কাগজপত্রে সই সাবুদ করিল। মাসে মাসে গভর্মেন্ট হইতে পয়সা আসামাত্র সে মেম বুড়ির হাতে নিজে যাইয়া টাকা দিয়া আসিতো। আর রেস্টুরেন্টে কাজ করিয়া যাহা পাইতো তাহা প্রতি মাসে পিতার কাছে পাঠাইতে লাগিল। প্রথমে বন্ধকি জমি ছুটাইতে পিতাকে অনুরোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিল। এই শুনিয়া ভগ্নিপতি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। তাহার টাকা আটকাইয়া রাখিয়া এহেন মশকরা! বেঈমান শ্যালক আর ততোধিক বেঈমান শ্বশুরের সাথে আর কোনো সম্পর্কই রাখিবেন না তিনি। বিবাহের পর হইতে এই বাড়ির জন্যে তিনি কম কি কিছু করিয়াছেন? নাবালগ শালা-শালিদের পড়াশোনা বিয়েশাদি কোনটায় চুপ থাকিয়াছেন? নিজের আপন রক্তের ভগ্নিদের জন্যে যাহা তিনি করেন নাই, তাহার চাইতে অনেক বেশি শালিদিগের জন্যে করিয়াছেন। সকল কর্মের এই প্রতিদান? কন্যার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া নিরুপায় পিতা প্রথমেই ছুটিলেন তাহার 'বাড়ির মাথা' স্বচ্ছল বড় জামাইকে ঠাণ্ডা করিতে। যাহাই হোক বড় জামাই এর হাতে কিছু গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আসিলেন পিতা। তিন চার বছর না ঘুরিতেই বিস্তর দেনা শোধ করিয়া ফেলিল কৃতিমান ছেলে চৌধুরী আলম। আরো দেনা শোধ করিতে পারিত কিন্তু এইদিকে যে মেমবুড়িকেও মাসে মাসে টাকা দিতে হয়। আজকাল মাঝে মাঝে এইটা ঐটা বায়না করে। তাহাও কিনিয়া দিতে হয়। হোক না কাগজের, তবুও বউ বলিয়া কথা।

এর মাঝে আর এক অঘটন ঘটিয়া গেলো। মেম বুড়ির দেনা যখন প্রায় শোধ করিয়া আসিয়াছে। কোন দুর্বৃত্ত যাইয়া পুলিশের কাছে রিপোর্ট করিয়া দিলো। পুলিশ আসিয়া তাহাকে মেম বুড়ির বাসায় না পাইয়া থানায় তলব করিল। সেই যাত্রায় বিস্তর মিথ্যা কথা বলিয়া রক্ষা পাইলেও দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেলো। বারবার আল্লাহ্ বাঁচাইয়া দিবেন না। কিছু একটা করা দরকার। সবার পরামর্শে সে মেম বুড়ির সাথে তাহার বাড়িতে থাকিতে লাগিল। ইহাতে আর এক গোল বাধিল। সংসারের বিস্তর খরচা, বাড়ি ভাড়া, বিল আজকাল তাহাকেই বহন করিতে হয়। তাহার ওপর আছে মেম বুড়ির মদ, সিগারেট, দামি ফল, মাংসের খরচা। শুধু তাহাই নহে, মেম বুড়ি ঘরের কুটোটিও নাড়তে চায় না, রান্না হইতে শুরু করিয়া যাবতীয় গৃহস্থালী কাজও তাহাকেই করিতে হয়। নইলে মেম এমন চিৎকার করিয়া অকথ্য জার্মান ভাষায় গালাগালি শুরু করেন যে ঘরে টেকাই দায় হইয়া পড়ে। হাড় কালা করিয়া খাটিয়া যাহা রোজগার করিতো আজকাল মেম বুড়ির চাহিদা মিটাইতে তাহাও সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। বারবার সে তাহার অভীষ্ট লক্ষ্য হইতে দূরে সরিয়া বা পড়িয়া যাইতে লাগিল। ঐদিকে বাড়ি হইতে ক্রমাগত পিতার নিদারুণ তাগাদা ঋণ শোধ করিবার জন্যে। চৌধুরী আলম কাহাকেও কিছু কইতে পারে না, সইতেও পারে না। নিদারুণ মানসিক পীড়নের মধ্যে তাহার কালাতিপাত হইতে লাগল। উপায় না দেখিয়া সে সস্তা ব্র্যান্ডের সিগারেট খাওয়া, আফটার শেভ ব্যবহার করা, সস্তার জামা কাপড় পরা ইত্যাদি শুরু করিয়া দিলো। ইহা করিয়া যে কয়টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পয়সা সে বাঁচাইতে পারে। এইভাবে বছর পাঁচেক সময় লাগিল তাহার ঘরে বাইরে সমস্ত দেনা শোধ করিতে। এবার কিছু নতুন ধানী জমি কেনাতে হাত দিবে মনস্থ করিয়া বাবাকে পত্র দিল। প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা জানাইলেন, ছোট বোন সেয়ানা হইয়া গেছে, জমি কেনার চাইতেও তাহার বিবাহ দেয়া অতীব জরুরি। হাতে একখানা সুপাত্র আছে, সে টাকার বন্দোবস্ত করিলেই তিনি শুভকাজে হাত দিতে পারেন। চৌধুরী আলম শুধু সম্মতিই দিল না, সমস্ত বন্দোবস্ত সহকারে পিতাকে বারংবার বলিয়া দিল, বিবাহ এমনভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে যেনো সবাই বুঝিতে পারে চৌধুরী বংশের মেয়ের বিবাহ হইতেছে, জার্মান প্রবাসী চৌধুরী আলমের ভগ্নির বিবাহ হইতেছে।

সবার সম্মতিতে ধুমধামের মধ্যে দিয়া ভগ্নির বিবাহ হইয়া গেলো। সোনার গহনা, ফার্নিচার, খাওয়া দাওয়ার সমস্ত খরচ মিটাইতে চৌধুরী আলমের সে বছরের পুরা রোজগার চলিয়া গেলো। চৌধুরী আলম আস্তে আস্তে খেয়াল করিতে লাগিল টাকা উপার্জন সে করে বটে কিন্তু দেশ হইতে বাবা মা, ভাই, বোন, বোনের জামাইরা কি করিয়া তাহার টাকা খরচ হইবে তাহা আগেই প্ল্যান করিয়া ফেলে। তাহার ইচ্ছা, স্বাধীনতা কিংবা মতামতের মূল্য সেখানে খুবই সামান্য। চিঠিতে তাহার স্বাস্থ্য, শরীর, অন, ঈদে সে কি খাইয়াছে কিংবা কি করিয়াছে এধরনের শারীরিক বা মানসিক অবস্থার খোঁজ খবর নেয়া আজকাল প্রায়ই না-র কোটায় গিয়া ঠেকিয়াছে। বরং চিঠি জুড়িয়া আজকাল বিশদভাবে লেখা থাকে আরো কিছু টাকা হইলে আরো কিছু আরামের রসদ কিনিয়া তাহারা হয়তো আরো একটু আনন্দ করিয়া থাকিতে পারিতো। সে কবে দেশে আসিতে পারিবে, আদৌ আসিতে পারিবে কি না, সে খোঁজটুকুও সেইভাবে আজকাল আর কেউ নেয় না। প্রতিটি চিঠিতে সে এই লাইনটি খুঁজিয়া বেড়ায়-তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, তুমি কবে বাড়ি আসিবে। কিন্তু লাইনটির সাক্ষাৎ আজকাল আর মেলে না। মা নিজে পত্র লিখিতে পারেন না, ইহাকে তাহাকে ধরিয়া লেখান। মা হয়তো বলেন লিখিতে, কিন্তু যাহারা লেখেন, তাহারা লেখেন না বা লেখাটা দরকারি মনে করেন না। এইভাবে আশা-নিরাশায় দিন কাটিয়া রাত্রি আসে। রাত্রি কাটিয়া ভোর হয়।

এখন চৌধুরী আলম ভুল উচ্চারণে হইলেও বেশ কাজ চলিয়া যাইবার মতো জার্মান বলিতে পারেন। বন্ধুরা গাড়ি হাঁকাইয়া বেড়ায়। তাহারও বহুদিনের শখ, একটু গাড়ি চালাইয়া দাপাইয়া বেড়াইবে। আস্তে আস্তে ড্রাইভিংয়ের কোর্স করিয়া তিন চারবার অকৃতকার্য হওয়ার পর ডয়েচ ড্রাইভিং লাইসেন্সও হাসিল করিলেন। মনের আনন্দ আর মনে থাকিতে চায় না। প্রায় গাড়ি হাঁকাইয়া এই সিটি ঐ সিটি চলিয়া যান। পুরনো বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, খোঁজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর করেন। বুড়ি মেমকেও হাত করিবার রাস্তা সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। আগের মতো সব এতো দুর্বিষহ লাগে না। কিছুটা সহিয়া আসিয়াছে।

হাতে কিছু পয়সা জমিয়াছে, সাথে শরীরে কিছু মেদ। আর সপ্তাহে সাতদিন জানে খাটিতে ইচ্ছে করে না। তাই কিছু ভালো কাপড় চোপড়ও খরিদ করিলেন। মাঝে সাঝেই ক্যামেরায় নিজের ছবি তুলিয়া নিজেই মুগ্ধ নয়নে নিজের দিকে তাকাইয়া থাকেন। হাতে কাগজ আসিলেই প্রথমে যে জিনিসটি তিনি করিবেন তাহা হইলো দেশে গিয়া একটি সুকন্যা দেখিয়া বিবাহ। মেম বুড়ির সাথে ইহা নিয়া মাঝে মাঝে আলোচনাও করেন। মেম বুড়ির সুবাদে এখানেও তাহার কিছু এদেশী বান্ধবী আছে, তাহাদের সাথে সময় সুযোগ মতো মেলামেশা করেন তিনি। কিন্তু বিবাহের একান্ত আশা আদর্শ বাঙালি রমণীকেই। জার্মান মেয়েরা যে খারাপ তাহা নহে, বরং অনেকদিকে হয়তো দেশি মেয়েদের চাহিয়াও ভালো। কিন্তু মুসলমান না, কলেমা জানে না, পর্দা করে না-এগুলো আসলে সব বিরাট সমস্যা। এভাবেই তাহার প্রায় আট বছর কাটিয়া গেলো সুদূর প্রবাসে। আট বছর পর পুলিশের কাছ হইতে বহু কাঙ্ক্ষিত সেই চিঠি আসিয়া হাজির হইল, যাহাতে লেখা, আজ হইতে তাহাকে জার্মান দেশে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ দেয়া হইলো। সে এখন চাহিলে এই দেশের নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন করিতে পারে। এই আনন্দে দিশেহারা হইয়া চৌধুরী আলম প্রথমে জার্মানের বাঙালি মসজিদে বিরাট আয়োজন করিয়া মিলাদ পড়াইল। যথাসময়ে কাগজপত্র জমা দিয়া নাগরিকত্বের আবেদন করিয়া দিয়া দেশে আসার যোগাড়যন্ত্রে মন দিল। বহুদিন কাটিয়া গেলো অনাথের মতো প্রবাসে, এইবার তাহাকে রুখিবে কে?

পিতাকে ফোন করিয়া এই সুসংবাদ জানাইয়া টেলিফোনে মাকে চাইলো। মা শুনিয়ে যারপর নাই খুশি হইলেন, আল্লাহর দরবারে সিন্নি মানত করা ছিল তাহাও সামনের জুম্মাবারেই মসজিদে পৌঁছাইয়া দিবেন বলিলেন। এবার লজ্জা লজ্জা গলায় চৌধুরী আলম কহিলেন, বিবাহের বয়স তো তাহার প্রায় যায় যায়। তাহার জন্যে একখানা সুন্দরী, গুণী পাত্রীর সন্ধান করিয়া রাখিতে, আসিয়া এইবার এই শুভকাজও সে সমাধা করিয়া যাইতে চায়। বিস্তর টাকা পয়সা সে বাড়িতে পাঠাইয়াছে, ধুমধাম করিয়া বিবাহ করিবে, বাবাকে বলিয়া সব আয়োজন যেনো মা করিয়া রাখেন। এইখানে বাঁধলো গোল। বাবার কানে কথা মা পৌঁছাইয়া দিলেন। বাবা কহিলেন, বিবাহ করিবে ঠিক আছে। কিন্তু টাকাপয়সা তো তেনার হাতে নাই। সমস্ত টাকা তিনি ব্যবসা, জমিতে লাগাইয়া ফেলিয়াছেন। বিবাহের খরচ তাহাকেই যোগাইয়া আনিতে হইবে। তেনার দ্বারা সম্ভব না। চৌধুরী আলম ইহা শুনিবামাত্র প্রায় মূর্ছা যায় যায় অবস্থা। এই দশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরে তাহার সঞ্চয় বলিতে কিছুই নাই। যাহা আয় করিয়াছিল নিজের কাছে এক কড়িও না-রাখিয়া সমস্তই পিতার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল সরল বিশ্বাসে। আজ তার এই প্রতিদান। তাহার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলো। সে পণ করিলো ঠিক আছে, নিজের দায়িত্ব নিজেই লইয়া সে দেশে গমন করিবে। দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে কাজে লাগিল আর প্রতিটি সেন্ট সে নিজের কাছে রাখিয়া দিল। এখন থেকে টাকাই তাহার বাবা–ভাই–বন্ধু-আপনজন। টাকা দিয়া সে কাহাকেও আর বিশ্বাস করিতে রাজি নয় বাড়িতে চিঠি লেখা, ফোন করা ইত্যাদি যোগাযোগ তাহার কিঞ্চিত কমিয়া গেলো। মাসে মাসে আগের মতো মানিঅর্ডার না-পাইয়া বাবা, ভাই, ভগ্নিপতি তাহার প্রতি বেশ রুষ্ট হইলেন। অবশেষে পকেটভর্তি জার্মান মার্ক নিয়া প্রায় তেরো বছর পর এক সকালে সে প্রথমবারের মতো স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলো।

অনেক অনেক বছর পরে দেশে আসিয়া বিমানবন্দরে আপনজনদেরকে দেখিয়া প্রথমে বাকরুদ্ধ হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বাবা আরো কতো বুড়িয়ে গেছেন, মাকেও কেমন যেনো কাহিল লাগছে। ছোট বোনটাকে এইটুকু দেখিয়া গিয়াছিল, তাহার বাচ্চা পায়ে পায়ে কাছে আসিয়া তাহাকে মামা বলিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিমানবন্দর হইতে মাইক্রোবাস রিজার্ভ করিয়া সকলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। বাকি কুশলাদি কথাবার্তা পথে যাইতে যাইতে হইবে। প্রথম কয়েকদিন চলিল সবার আনাগোনা, কুশল বিনিময়, দেখা সাক্ষাৎ উপহার বিনিময় পালা। একটা ঘোরের মধ্যে চৌধুরী আলমের প্রথম কিছুদিন কাটিয়া গেলো। যখন তাহার কানে উপহার সম্পর্কে কিছু অসন্তোষ আসিতে লাগিল তখন আস্তে আস্তে তাহার ঘোর কাটিতে আরম্ভ করিল। একার উপার্জন দিয়া পরিবারের সবার জন্যে উপহার কিনিতে হইলে এমনিতেই তাহার জন্যে অনেক, এর মধ্যে তাহার টিকিট, বিয়ের খরচ, টুকটাক সংসারের অন্যান্য খরচ তো আছেই। চৌধুরী আলমের মনে অনেক আশা ছিল তাহার পরিজন তাহাকে এতোদিন পর কাছে পাইয়া শুধু তাহাকেই ভালোবাসিবে, সে ই মুখ্য হইবে, উপহার হইবে গণ্য। ভালোবাসার কাছে উপহার কি বস্তুর নাম? কিন্তু বাস্তবে উলটা ঘটিয়া গেলো। এতো খরচা, সাধ করিয়া, যে ছোট বোনের বিবাহ সে দিল, তাহার স্বামীর জন্যে সে কোট নিয়া আসিয়াছিল জার্মান হইতে। ছোটবোনের স্বামীর প্রথম উপহার বলিয়া কথা। কাঁদো কাঁদো মুখে, সে কোট তাহার ছোটবোন ফেরত লইয়া আসিল। কহিল, এই কোটের জন্যে সে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি দ্বারা বিস্তর অপমানিত হইয়াছে। তাহারা গরীব বলিয়া ঠিক ততো গরীব না যাহা তাহার ভাইজান ভাবিয়াছে। দুই চারিটা ভালো কাপড় চোপড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোট প্যান্ট তাহাদেরও আছে। এই ধরনের সস্তা জিনিস দিয়া তাহাদের অপমান না করিয়া বরং কিছু না-দিলেই তাহারা খুশি থাকিতো। চৌধুরী আলম টাশকিত হইয়া নিশ্চুপ হইয়া গেলেন, আশি মার্কের কোট তিনি নিজে কোনোদিন পরিধান করেন নাই। দশ মার্কের ওপরে কোনো কাপড়ই তিনি নিজের জন্যে প্রথমাবস্থায় কিনেন নাই। সেই জায়গায় আশিটি মার্ক খরচ করিয়া কেনা কোটে লোকে অপমানিত হইয়া গেলো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! সে কোনো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না। কি করিয়া সে বিদেশে উপার্জন করে তাহাও কেউ তাহার কাছে জানতে চায় নাই। কি চাকুরি করিলে কতো টাকা রোজগার তাহা জানার প্রতিও কারো আগ্রহ নাই। সবাই ব্যস্ত তাহার কাছ হইতে কতো খসানো যায় সেই চিন্তায়।

আর এভাবেই গুমরাইয়া মরে দেশের প্রান্তে প্রান্তে হাজার হাজার চৌধুরী আলমের হৃদয়ের গল্প। কেউ নাই সে গল্প শোনার, কেউ নাই সেই গল্প অনুভব করার, কেউ নাই সেই কষ্টের জায়গাটুকু মমতার হাতে স্পর্শ করার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রেইন সমস্যা

দুপুরে খেয়ে শুয়ে শুয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলো তিথী। অলস দুপুরটা আলসেমি করেই কাটিয়ে দেবে ভাবছিলো। হঠাৎ মুঠোফোনটা গান গেয়ে উঠলো, ঐ দূর পাহাড়ের ধারে...। অচেনা নম্বর থেকে ফোন, ধরবে কি ধরবে না ইতস্তত করছিল। এ সময়টায় অনেক সময় ব্ল্যাঙ্ক কল আসে, হাবিজাবি কথা বলে বিরক্ত করে আজে বাজে মানুষেরা। দোনামোনা করতে করতেই কখন যে ফোনের সবুজ বোতামে টিপ দিয়ে হ্যালো বলে ফেলেছে টের পায়নি সে। ফোনে দিশার বড় বোন নূপুর আপার গলার আওয়াজ পেয়ে তিথী প্রায় লাফিয়ে উঠলো। দিশার নতুন বিয়ে হয়েছে, বেশ আল্লাদেই ছিল পছন্দের মানুষকে বিয়ে করে। বন্ধুর সুখ দেখতেও সুখ। কিন্তু একি দুর্ঘটনা হঠাৎ!

দৌড়ে হাসপাতালে এলো সে। সবাই আছেন ওখানে, গম্ভীর মুখে পায়চারী করছেন অনেকে, কেউ কেউ হাসপাতালের বেঞ্চে বসে আসেন। একটা ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে সেখানে। দিশার চোখের দিকে তো চাওয়া যাচ্ছে না। কেঁদে কেটে বেচারি একদম একসা করে ফেলেছে। নাক মুখ সব ফুলে গেছে। অবস্থা দেখে তিথী ফিসফিসিয়ে নুপূর আপাকে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার কি বলেছেন? কি অবস্থা এখন ভাইজানের? নূপুর আপা কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দিলেন, এখনো ডাক্তাররা কিছু জানায়নি। সেই যে রোগী নিয়ে ওটিতে ঢুকেছে তারা আর কোন খবর নেই। ভিতরে কি হচ্ছে আমরা কিছুই জানি না। সবাই দোয়া পড়ছি যেনো খারাপ কিছু না হয়, তুমিও দোয়া পড়ো। তিথী চুপ করে রইলো, কি আর বলবে। আজকাল সবাই এতো বেপরোয়া হয়ে গেছে, সড়ক দুর্ঘটনা কোন ব্যাপারই না।

এর কিছুক্ষণ পরেই তিনজন ডাক্তার বের হয়ে এলেন ওটি থেকে। জানালেন মগজ পুরোই নষ্ট হয়ে গেছে। পুরনো মগজ ফেলে নতুন মগজ ঢোকাতে হবে মাথায়। সবাই আকাশ থেকে পড়লেন, এখন কি করা? এতো তাড়াতাড়ি মগজ কোথায় পাবেন তারা? ডাক্তাররা জানালেন হাসপাতালের মগজ ব্যাংকে মগজ আছে, মগজ পাওয়া যাবে। সেটা সমস্যা না। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেদের মগজ নিলে পুরো দাম দিতে হবে আর মেয়েদের মগজ নিলে অর্ধেক দামেই পাবেন। কার মগজ দিতে চান ওরা? এই বিপদের মধ্যেও ডাক্তারদের কথা শুনে মেয়েদের মুখ লাল হয়ে গেলো। কি বলতে চান ডাক্তার সাহেব? তিথী মেয়েদের নিয়ে আজেবাজে কথা সহ্য করতে পারে না। করবে না করবে না ভেবেও সে জিজ্ঞেস করেই ফেললো, 'এর মানে'?

ডাক্তাররা একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, মানে জানেন না আপনি? ছেলেরা তো নিজের কাজের বাইরে ব্রেন ইউজ করে না তাই তাদের মরার পর দেখা যায় প্রায় পুরো ব্রেইনটাই থেকে যায়। আর মেয়েরা তো সারাক্ষণ সব জায়গায় ব্রেইন ইউজ করতে থাকে তাই মরার পর ওদের ব্রেইন খুললে দেখা যায় মগজের প্রায় কিছুই নাই তাতে বর্জ্য পর্দাথটুকু ছাড়া। তো মগজ বেশি নিলে বেশি দাম দিবেন না আপনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেঁদেছে একেলা

সারাটা দিন মেজাজটা খিচড়ে থাকলেও নিশি মনটাকে বোঝালো অয়ন বাড়ি এলেই এগুলো নিয়ে কথা বলবে না সে। নিজেও সময় নিবে আর অয়নকেও সময় দিবে শান্ত হয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার। সারাটা দিন গেলো নিজের সাথে এই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টায় সারাক্ষণ মনকে বলে চলল, 'সংসার মানেই এই, সব তো নিজের ইচ্ছে মতো হয় না, বেশির ভাগ মানুষই যা চায়, তা পায় না। এগুলো আসলে বড় কোনো ব্যাপার না।' কিন্তু এই বাড়িটাতে নিজেকে শান্ত রাখাই সবচেয়ে দুরূহ কাজ। শ্যাওলা ধরা ছাদ আর নোনা ধরা দেয়ালের বুড়ো এই বাড়িটাতে তরুণ সূর্যটা উঁকিই দিতে চায় না। এ বাড়িটাকে মুখ গোমড়া করা বিষণ্ন মেঘ যেনো ঢেকে সারাদিন রাখে। বনেদী বাড়ির প্রাচীর পার করে মন খুশি করা কোনো রঙের প্রজাপতি পথ ভুল করে উড়ে এসে পড়ে না। সূর্যের উজ্জ্বল হাসি মাথা গলিয়ে চারপাশকে ঝলমল করিয়ে দেয় না এখানে। চারধারে উঁচু প্রাচীরঘেরা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো এক দ্বীপের প্রাচীনপন্থী বাড়ি আর তার মানুষগুলোকে এক এক সময় নিশির অসহ্য লাগতে থাকে। মোটামুটি আধুনিক চিন্তার বাড়ি থেকে গোঁড়া মানুষদের সংস্পর্শে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে সে। সারাক্ষণ গুমোট ধরা আবহাওয়া। মাঝে মাঝেই মনে হয় কতোদিন সে তাজা হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেয় না! নতুন আলো গায়ে মেখে স্নান করে না! মনে হয়, কোথাও বাতাস নেই, এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে সে, এক্ষুনি! দৌড়ে ছাদে চলে যেতে ইচ্ছে করে নীল আকাশটার কাছে আশ্রয় নিতে, কিন্তু বেলা অবেলায় বাড়ির বউয়ের এতো ছাদে কি, এই নিয়েই তো দিনরাত কতো কথা।

আর অয়নকে বলেই কি লাভ? বললেই তো ঝাঁঝিয়ে উঠবে, 'একটু মানিয়ে চলতে পারো না, সব মেয়েই শ্বশুরবাড়ি এসে নিজেকে মানিয়ে নেয়। এক সাথে থাকতে গেলে সবাইকেই মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হয়'। এই একসাথে থাকার ব্যাপারটাই পছন্দ নয় নিশির। যত্তোসব সেকেলেপনা। এখানকার সমস্ত কিছুই সেকেলে। খাবার সেকেলে, রান্না মানেই এক কাঁড়ি তেল মশলা দিয়ে মাছের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোঁপেয়াজা কিংবা তরকারি। অল্প তেল মশলায় গ্রীল, বেকড, ফ্রাই সব এই বাড়িতে অচল। স্যুপ নেই, স্যালাদ নেই। খাবার ব্যবস্থাও তথাস্তু। বাড়ির পুরুষরা আগে খাবেন তবে নারীরা। একসাথে টেবলে বসা ভাবাই যায় না এ বাড়িতে। অথচ নিশিদের বাড়ি কতো অন্যরকম। ভাইবোন, বাবা-মা মিলে একসাথে খাবার টেবলে ম্যারাথান আড্ডা হতো ক্রিকেট নিয়ে, সিনেমা নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে। এখানে কোনো স্বাধীনতা নেই। এক গলা ঘোমটা দিয়ে সারাক্ষণ সং সেজে থাকো। সালোয়ার কামিজ পরা বারণ, জিন্স-টিশার্টতো দূরের কথা। মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ, সিনেমা থিয়েটার নিষেধ আর চাকরি, সে তো সোনার হরিণ। কিন্তু তাদেরই আবার বউ শিক্ষিত হওয়া চাই, বাড়ির স্ট্যাটাস ঠিক রাখা নিয়ে কথা। একটানা এই একঘেয়েমিতে নিশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর কিছু হোক-না-হোক, সপ্তাহান্তে অয়নের ছুটিতে একটু বাপের বাড়ি অন্তত ঘুরে আসা চাই তার। মাঝে মাঝে অবশ্য বাপের বাড়ির নাম করে সিনেমা-থিয়েটার-শপিং এ যায়, লুকিয়ে একটু আধটু বাইরে খেয়ে আসে। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি ঠিক টের পেয়ে যান। যতোক্ষণ অয়ন বাড়ি থাকবে, মুখটি খুলবেন না, ছেলের সামনে বউকে খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু অয়ন বেরিয়ে যাওয়া মাত্র শুরু হবে নিশির সাথে খিটির মিটির। ছেলের বউকে কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা তারা দেন তাদের বাক্যবাণ দ্বারা, তার কোনো প্রমাণ তারা তাদের ছেলের কাছে রাখতে চান না।

বাপের বাড়ি গেলেই নিশি মন খারাপ করে, মান্ধাতা আমলের সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করে। আর ভাল্লাগছে না, পারছি না মা আর এভাবে। নিশির মা মাঝে মাঝে মেয়ের কারণে অয়নকে চাপেন, কেনো নিশি ইকোনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে বাড়ি বসে আছে? কেনো কোথাও ঢুকছে না আর বেশি দেরি হলে তো চাকুরি পাওয়াও সমস্যা হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অয়নের উচিত ওর বাবা-মায়ের সাথে কথা বলা। প্রয়োজনে উনি সাপোর্ট দিবেন। এর বেশি আর জামাইকে কিইবা বলতে পারেন? নিশিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অয়ন নিশির উপরে। মা হয়ে তিনি কেনো মেয়ের সংসারে নাক গলাচ্ছেন? নিশি বুঝতেই পারে না মানুষ এতোটা চক্ষু-লজ্জাহীন হয় কি করে? ছেলের মা দিনরাত সংসারে নাক গলিয়ে যাবেন আর মেয়ের মা হয়েছেন বলেই তিনি তার আত্মজার জন্য দুটো কথা বলতে পারবেন না? অথচ নিশির মা, অয়নের জন্য কতো মমতা নিয়ে রান্না করেন, যা যা অয়ন খেতে ভালোবাসে তা আলাদা করে সব সময় ফ্রিজে রেডি রাখেন। ভালো ভালো নজরুল সংগীত, পল্লীগীতির সিডি, অয়নের পছন্দের বই-ডিভিডি জোগাড় করে উপহার দেন। জামা কাপড়ের কথা না হয় বাদই। সেগুলো অয়ন ভাবে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জামাইকে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধ্য। কোনো দিন অয়নের মা করেছে এগুলো তার জন্য? সেই ভদ্রতার ধারটুকুও কি ধারতে নেই? অয়ন তার পরিবারের বিরুদ্ধে একটা কথাও সহ্য করতে পারে না। ওর বনেদী রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। নিশির পরিবারের টাকা-পয়সা থাকলেও সেই বনেদীয়ানা নেই, নিশিকেই সমস্ত সহ্য করতে হবে। নিশির তো সেটাই সমস্যা। বনেদীয়ানা চেনে না, বুঝতেও পারে না।

অয়ন বাড়ি ফিরলে নিশি কিচ্ছুটি না-বললে কি হবে, অয়নের মা রয়েছেন না? তিনি সারাদিন অপেক্ষা করে রয়েছেন কখন ছেলে বাড়ি ফিরবে। তিনি কি ছেলেকে নালিশ না করে ছেড়ে দিবেন? এত্তো বড় সাহস নিশির তার মুখে মুখে কথা বলে! খেয়ে দেয়ে রাতে ঘরে ঢুকলো অয়ন গম্ভীর মুখে। নিশিকে জিজ্ঞেস করলো, এসবের মানে কি? আর সহ্য হলো না নিশির। মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। তিক্ত গলায় খ্যাক করে উঠলো, এত্তোক্ষণ মায়ের কাছ থেকে কান পড়া নিয়ে এলে আর মানে বুঝে আসোনি? অয়ন গর্জে উঠলো, খবরদার মাকে নিয়ে কোনো কথা বলবে না। নিশিও সমান তালেই জবাব দিল, মা দিন রাত আমায় নিয়ে বলে যাবেন আর আমি বললেই দোষ হলো? যুক্তিতে না পেরে অয়নের রাগ এবার শক্তিতে রূপান্তর হলো। দাঁপিয়ে ধরতে এলেই নিশি আরো ঝাঁঝিয়ে উঠলো, খবরদার আমার গায়ে হাত দিবে না বলছি। বাধা পেয়ে অয়ন আরো হিংস্র হয়ে উঠলো। বাঘ রক্তের গন্ধ পেলে শিকারের গায়ে যেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি। নিশির সারা শরীর রুখিয়ে উঠে বাধা দিতে চাইলো অয়নকে। টানাটানি আর ধস্তাধস্তিতে নিশির নখ লেগে অয়নের গায়ের কয়েক জায়গা ছড়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। নিজের শরীরে রক্ত দেখে অয়নের মাথা খারাপ হয়ে গেলো। অয়ন তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নিশির দুই কাঁধে ধরে টেনে বিছানায় এনে ফেলে দিলো। আক্রোশে টেনে ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেললো। উন্মাদের মতো চড়ে বসলো নিশির উপর। সর্বশক্তি দিয়ে নিশির কচি বুক দুটো খামচে ধরল। কুঁকড়ে উঠে যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলো নিশি। দুই হাত জোর করে অয়নকে বাধা দিয়ে বলতে লাগল, না অয়ন না, প্লিজ না। চোখের পানি আর বাধ মানছে না। এই দম বন্ধ করা রাক্ষসপুরীতে ছিলই সে অয়নের জন্য, সেই অয়নই যদি আর তার না থাকে, তাহলে সে কি নিয়ে বাঁচবে?

এসব এখন আর অয়নকে স্পর্শ করছে না। হ্যাঁচকা টানে অয়ন শাড়িসমেত পেটিকোটটা খুলে আনতে চাইল। প্রথমবারে সফল না-হলেও তার পরের বারে সফল হলো। অয়নের দাঁত নিশির গালে, গলায়, কাঁধে মুখে বসে যেতে লাগলো। তাতে যাই থাকুক না কেনো ভালোবাসা কিংবা মমতার কোনো ছোঁয়াই ছিল না। নিশির মনে হতে লাগল বর্ণমালা বইয়ের অ এ 'অজগর আসছে তেড়ে'র ছবির সাপটা যেনো ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে গিলে ফেলছে, ও আর নিশ্বাস নিতে পারছে না। অয়ন তার শরীরের সমস্ত রাগ নিশির শরীরে ঢেলে দিতে চাইছে। প্রাণপনে বাধা দিয়ে ক্লান্ত নিশি এখন বিছানায় পড়ে আছে, যেন একটা জীবন্ত লাশ। শরীরে কোনো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে উষ্ণ পানি। কিন্তু সে উষ্ণতা অয়নকে ছুঁতে পারল না। পশুর মতো অয়ন তখন মাংস হাতড়াচ্ছে। শত হোক ব্যাটা ছেলে বলে কথা, ঘরের বউয়ের কাছে তো আর হার মানতে পারে না।

কাপড় গুছিয়ে নিয়ে বিছানার এক কোণে নিথর হয়ে পড়ে আছে নিশি। এই মুহূর্তে শরীরে পরিচিত কিংবা অপিরিচিত কারো স্পর্শ সে চায় না। বীর দর্পে ঘুমিয়ে আছে বীর পুরুষ। চোখের পানির বন্যা আর কিছুতেই বাঁধ মানছে না। নিশির হাজার বারণ সত্ত্বেও তাকে ছাপিয়ে উপচে পড়েই যাচ্ছে। নীল আকাশটা অপলক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে নিশির দিকে। জোছনা খুব সন্তর্পণে জানালা গলে পরম মমতায় নিশিকে জড়িয়ে ধরল। জোছনার বুকে মাথা রেখে নিশি হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে আকাশকে জিজ্ঞেস করল, রোজ রোজ নিজেকে অপমান করে আর কতোদিন এই বেঁচে থাকা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুলকথা

১

বকুল একবার উঠছে তো আবার বসছে বিছানায়। প্রচণ্ড অস্থির লাগছে কিন্তু কিছু করার নেই তার, জানে না কি করলে অস্থিরতা কমবে। টেবিলের ওপরে থাকা বইগুলো উল্টাচ্ছে, বানী বসু'র লেখা ইদানীং খুব টানে তাকে। বহুবার পড়া 'একুশে পা' আবারো খুলে বসলো, যদি মনটাকে ব্যস্ত রাখা যায়। কিছুক্ষণ অক্ষরগুলো চোখের পরে নাচানাচি করলো, অক্ষরগুলোকেই চিনতে পারছে না সে। পড়ার বৃথা চেষ্টা বন্ধ করে আবার বসলো। আজ ছুটির দিন হয়েছে বলেই জ্বালা। কোথাও যাওয়ার নেই তার, বন্ধু নেই বান্ধবী নেই। পার্লার আর বাড়ি, বাড়ি আর পার্লার-এইই জীবন প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বকুলের। কর্মঠ মেদহীন শরীর দেখে কেউ ধারণাই করতে পারবে না আটত্রিশ কাটাচ্ছে বকুল এখন। সবাই ভাবে বড়জোর ত্রিশ। যদিও আজকাল কেশে রূপালী রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। সেদিন ঝর্নাদিকে বলে মেহেদী রঙে ডাই করে নিয়েছে চুল। পরিচ্ছন্ন থাকতে বকুল খুবই ভালোবাসে। ছোটবেলার অভ্যাস, রাঙা কাকিমা করিয়ে দিয়েছেন। মেকাপ লাগিয়ে সাজে না সে খুব একটা, কিন্তু সবসময় ম্যাচিং শাড়ি–ব্লাউজ–জুতো। হাতে কানে রঙ মিলিয়ে সামান্য পলার চুড়ি আর দুল। এতেই অন্যদের থেকে আলাদা দেখায় তাকে। মাঝারি গড়নের বকুল যে খুব আহামরি কিছু সুন্দরী নয় তা সে নিজেও জানে। কিন্তু তার ছোট চোখের সাথে মিলিয়ে কিভাবে মোটা করে কাজল পরতে হবে আর মোটা গড়নের ভুরু প্ল্যাক করতে হবে, মোটা ঠোঁটটাকে কি করে আঁকলে বিশ্রী দেখাবে না সেটা তো সে-ই জানে আর তাতেই প্রায় কালো ঘেঁষা গায়ের রঙ, আর প্রায় ছোট দিকের মাঝারি গড়নের বকুল, মোটামুটি দেখতে ভালো, এই বিশেষণ পায় অন্যদের কাছে।

প্রিন্টেড জর্জেটের শাড়িটা আবারো ভালো করে পিঠের ওপর দিয়ে এনে শরীরের মাঝে ঠিকঠাক জড়ালো সে। বসে বসে নখ দিয়ে মেঝের ওপর নানা রকম আল্পনা কাটছিলো। ঠাণ্ডা মেঝেতে পা রেখে এই আল্পনা আঁকা খেলাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার অনেক অবসর সময় কাটে। তার জীবনের যেমন কোনো অবয়ব নেই, নেই এই আল্পনাগুলোরও কোনো আকৃতি প্রকৃতি। নেহাত জন্মেছে বলেই তার যেমন বেঁচে থাকা, তেমনই এই আল্পনার অস্তিত্ব, কেটে যাওয়ার জন্যই যাওয়া। মাঝে একবার উঠে পাশের ঘরের সবাইকে আর এক দফা চা নাস্তা দিয়ে এসেছে সে। বাড়িটা খুব বড় নয়, না চাইলেও পাশের ঘরের কথা অনায়াসে এ ঘরে বসে শোনা যায়। আর পাশের ঘরে তো রাখঢাক করে কথা বলা হচ্ছে না। সবাই যার যার মতামত জোর গলায় দিচ্ছেন। শুধু বকুল অনাহুত সেখানে, সামনে দিয়ে অনেকবার যাওয়া-আসা করলো, কেউ একবার তাকে বললো না বকুল তুইও বোস, গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এখানে, তোর থাকাটা জরুরি। সেও যে একটা মানুষ, তারও কষ্ট হতে পারে, কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে সেটা তাদের হিসেবের মধ্যেই নেই। কিন্তু সে যে হিসেবের মধ্যে পড়ে না তো সে অনেকদিন ধরেই জানে, জানে না? তারপরও মনের মধ্যে কিসের ক্ষীণ আশা সে এতোদিন লালন করেছিল?

আজো সেদিনটার স্মৃতি তার মনে জ্বলজ্বল করে। বোস বাড়ির রাঙাকাকু বিয়ে করে ফুটফুটে রাঙা কাকিমাকে নিয়ে এলেন। বকুল তার জীবনে কখনো এতো সুন্দর মানুষ দেখেনি, মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ দুর্গা প্রতিমা। দুর্গা ঠাকুরের মতো বড় বড় মায়াভরা চোখ, লাল টুকটুকে ঠোঁট আর পিঠ ভর্তি একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল। সারা পাড়ায় বলাবলি হতে লাগলো বউ এসেছে বটে বোস বাড়ি উজ্জ্বল করে। বকুল রোজ মায়ের সাথে আসে, মা যখন বাড়ির কাজ করে বকুল তখন রাঙা কাকিমার পাশে পাশে ঘুর ঘুর করে। হাসি হাসি মুখের রাঙা কাকিমাকে দেখে তার মনের আশ মেটে না। রাঙা কাকিমা যদি তাকে কিছু করতে বলেন সে কৃতার্থ হয়। এভাবে দিন যায় রাত আসে। রাঙা কাকিমার সাথে বকুলের খুব ভাব হয়ে গেলো। কাকিমা তাকে ছবির বই কিনে দিলেন, অ আ ক খ পড়াতে লাগলেন। বকুলের মা অন্য বাড়িতে যখন কাজে যায়, বকুল এ বাড়িতেই থাকতো। শয়নে স্বপনে বকুলের পৃথিবীর ভরে রইল শুধু রাঙা কাকিমা। বছরের পর বছর ঘুরেও যখন রাঙা কাকিমার ঘর উজ্জ্বল করে কেউ এলো না তখন রাঙা কাকু মা'কে বললেন বকুল আমাদের কাছেই থেকে যাক। আমরা ওকে পড়াশোনা করিয়ে বড় করবো। একথায় শুধু বকুল আর বকুলের মা নয় বকুলের পুরো পরিবার খুশিতে নেচে উঠেছিল। বকুলদের বস্তির অনেকেই বকুলের ভাগ্য দেখে হিংসা করেছিল, কেউ কেউ হয়তো নিশব্দে দুঃখের নিশ্বাসও ফেলেছিলো।

বকুল সেই থেকে রয়ে গেলো বকুল বোস বাড়ি। বয়স বেশি বলে সে প্রথমেই স্কুলে ভর্তি হতে পারলো না। কাকু কাকিমার কাছে পড়াশোনা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলো। দুপুরে কাকিমার সাথে ঘুমোতো, টিভিতে সিরিয়াল দেখতো। কাকিমা কতো গল্প করতো, বই-সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে শোনাত, রবীন্দ্র সংগীত থেকে আরতি মুখার্জী, লালনের গান থেকে কিশোর-সব কাকিমার পাশে থেকে জেনেছে সে। স্যান্ডউইচ কিংবা জিরা পানি, ইকেবোনা থেকে ঝাড়দানি–কাকিমা পাশে থেকে হাত ধরে ধরে বাড়ির মেয়ের মতো করে শিখিয়ে দিলো তাকে। হাঁটতে, চলতে, বলতে বোস বাড়ির মেয়েদের মতো হয়ে গেলো সে দ্রুত। মাঝে মাঝে মা ভাইবোনদের সাথে দেখা করতে নিজেদের বাড়িতে যায় বকুল, নিজেকে তার সেখানে খুবই বেমানান লাগে। কি চিৎকার করে মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে কথা বলে তার মা বাবা, ছিঃ। দুজনের প্রতি দুজনের কোনো ভালোবাসা তো নেই, শ্রদ্ধা-ভক্তিও নেই। এ ভাষায় কেউ কাউকে কথা বলে! ভাই বোনদের মুখের ভাষা শুনলে তো দুহাতে কান ঢেকে লজ্জায় নুইয়ে পড়তে হয়। দাদা-দিদিকে কিছু শিখাতে কিংবা বলতে গেলে উলটো তারা তাকে বিদ্রূপ করে হেসেই খুন হতো। বকুলের ভদ্দরলোকি তখন ভাই বোনদের কাছে একটা হাসির উপাদান। সহ্য করতে পারে না, কখন বোস বাড়িতে ফেরত আসবে সেজন্য অস্থির হয়ে ওঠে সে। ঐ ঘুপচি ঘরে আলো ছাড়া, বাতাস ছাড়া তার দম বন্ধ হয়ে আসতো। চারধারে আবর্জনার দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ করে আর কতোক্ষণই-বা থাকা যায়।

বকুল আস্তে আস্তে স্কুলে যেতে শুরু করলো। স্কুলের খাতায় তার বাবা মায়ের নাম এলো আর লোকাল গার্জিয়ান হিসেবে নাম এলো রাঙা কাকুর। পড়াশোনায় বকুলের তেমন মাথা ছিলো না আর পড়াশোনা করার তেমন ইচ্ছেও ছিলো না। ভবিষ্যতের কতোটুকুই কেউ বোঝে সে বয়সে? বোস বাড়ি থাকতে পেয়েই বর্তে ছিলো সে। অনেক কষ্টে কোনো রকমে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করলো বকুল। কাকা কাকিমা তার উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। তারা বললেন, স্কুল ফাইন্যাল তো হলো, ঠিক আছে, এখন বরং কিছু কাজ করো। বকুলের নিজের পড়াশোনায় আগ্রহ কম থাকলেও সে এ কথায় খুবই অবাক হয়েছিল। তখনো বোস কাকুরা সব যৌথ পরিবারে থাকেন। বাড়ির অন্য ছেলে কিংবা মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে সবারই খুব কড়া দৃষ্টি। এই রাঙা কাকিমাই সেজ কাকুর ছোট মেয়ের ইংরেজি ট্রান্সলেশন নিয়ে প্রত্যেক দুপুর পড়ে থাকেন। কিন্তু বকুলের পড়া কিংবা পরীক্ষা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথাই সে দেখলো না। হলে ভালো, না-হলেও ভালো।

কি করবে কি করবে? তাই নিয়ে বকুলও ভাবছে, বোস বাড়ির কেউ কেউ ভাবছেন আর ভাবছেন বকুলের বাবা মা। বকুলের মা-ভাইয়ের ইচ্ছে, তারা যদি দেখে শুনে বকুলকে পাত্রস্থ করে দেন তাহলে তো একটা হিল্লে হয়ে যায়, একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝাও নেমে যায়। স্কুল ফাইন্যাল পাশ মেয়েই-বা কম কি। তারা ইশারা ইঙ্গিতে বোস বাড়িতে একথাটা অনেকভাবে পাড়ল কিন্তু বোস বাড়ির কেউ তাতে গা করলো না। বোসরা তখন সবাই যার যার অংশ গুছিয়ে আলাদা হওয়ার তালে আছেন, সেই ব্যস্ততায় বকুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা পাথর চাপা পড়ে গেলো। রাঙা কাকিমা তো বকুলকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকার কথা ভাবতেই পারেন না, বিয়ে দিবেন কি? রাঙা কাকিমার বাতের ওষুধ কি মাথা টিপে দেয়া, রাঙা কাকুর অফিসের ভাত বাড়া তো ব্যাংকে যেয়ে বিদ্যুতের বিল দেয়া-বকুল ছাড়া সবই অচল। যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে কাকু কাকিমা বকুলকে আরো আঁকড়ে ধরলেন। বকুলের কাঁধে তখন রাঙা কাকিমার সংসারের চাবি, এই কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে বকুল তখন দিশেহারা। ছাদে যেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তরুণী সে গুন গুন গান গায়। কতো শতো স্বপ্ন তার দুচোখ বেয়ে অহর্নিশি উপচে পড়ছে। নিজের সৌভাগ্যে নিজেই ঈর্ষান্বিত সে। ছোট বাগানঘেরা মায়া ভরা এই বাড়ির একজন সে। যাকে ছাড়া এবাড়ির কেউ কিছু ভাবতে পারে না।

AMARBOI.COM

২

আস্তে আস্তে বকুল অনুভব করতে লাগলো তার ওপর কাকু কাকিমার এ নির্ভরতা নিতান্তই স্বার্থের, ভালোবাসানির্ভর নয়। আগে পাড়ার কেউ যদি বকুলকে ডেকে জিজ্ঞেস করতো, ও বকুল কি খবর তোর? এভাবে বোস বাড়ি পড়ে থাকলেই চলবে? পরের সেবা করেই যাবি? বিয়ে থা, চাকরি কিছুই করবি না? বকুল খুব বিরক্ত হতো। তোদের অতো দরকার কী বাপু, সে হবে যখন সময় হবে। কিন্তু সময় তো বয়েই যাচ্ছে, ষোড়শী বকুল এখন বাইশের তন্বী। কচি শরীর এখন অনেক পরিণত। কাকু কাকিমা তাকে নিয়ে কোনো কথা বলছেন না। কাকিমা নিজে যখন কাঁচা হলুদ, মুলতানী মাটি, চন্দন কাঠের গুঁড়োর ফেসপ্যাক বানিয়ে মুখে লাগান তখন যত্ন করে তা বকুলের গায়ে মুখেও লাগিয়ে দেন। পেঁয়াজের রস, মসুরের ডাল, নারকেল তেলের সাথে মিশিয়ে তার মাথায় লাগিয়ে চুলের যত্ন করা শেখান। তাকে সাথে নিয়ে পরিণীতা দেখতে যান, বইয়ের সাথে সিনেমার চিত্রনাট্যের তুলনামূলক আলোচনাও করেন। কিন্তু এসবের বাইরে তার আর কোনো অস্তিত্ব কোথাও নেই। কাকিমার সাথে শাড়ি কিনতে কিংবা ফুচকা চটপটি খেতে গেলে কিছু আগ্রহী লোভী চোখ তাকে ঘিরে ঘুরঘুর করে, নতুন হিট ফিল্মের গান গেয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, কারণে অকারণে শিস দেয়, বকুল খুব আশায় থাকে কাকিমার চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বে সেসব, কাকিমা নিশ্চয় কিছু বলবেন। এতো দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা কাকিমার নজরে শুধু বকুলই কেনো এড়িয়ে যায় তাই ভেবে সে হয়রান।

বুক ভরা অভিমান নিয়ে একদিন বকুল কাকু কাকিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাবা-মায়ের কাছে চলে গেলো। কাকু কাকিমা অনেক বাধা দিলেন, বোঝালেন তাদের কে দেখবে, তাদের কি হবে, বকুল ছাড়া আর কে আছে তাদের, ঘুরে ফিরে সেই কথা। বকুলের কিছু চাই কিনা, তার ভবিষ্যতের কি হবে সেটা কাকু কাকিমা একবারের জন্যও বলেন না। বাবা মা তার জন্যে বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। এদিক সেদিক থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগলো। শুক্রবার শুক্রবার করে ছুটির দিনে, তাদের বস্তির ঘুপচি ঘরে নানা পদের পুরুষ মানুষ তাকে দেখতে আসতে লাগলো। সুন্দর করে সেজেগুজে তাদের সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়ায় সে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে যথাসম্ভব নম্র গলায় জবাব দেয়। দাদা বাবা সাধ্য মতো মিষ্টি চা খাইয়ে তাদের আপ্যায়ন করতে লাগলেন। কেউ কোনো বাড়ির দারোয়ান, কেউ রেস্টুরেন্টের বয় কিংবা ফুটপাতের হকার। তাদের সাজ পোশাক, হাবভাব দেখে বকুল ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে যেতে লাগলো। কোনো কোনো পাত্র বকুলের সাথে একান্তে কথাও বললেন। বকুলের কি পছন্দ, কি চায়, সে এধরনের কোনো কথা নয়। বিয়ের পর সে কাজ করবে কিনা, সাহেবদের বাড়ি থেকে হঠাৎ চলে এলো কেনো, কোনো লটঘটের ব্যাপার আছে কিনা ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্ন।

বিয়ে নিয়ে বকুলের দেখা স্বপ্ন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ভাঙতে লাগলো। বুকের নিঃশব্দ কান্না রক্ত হয়ে ঝরতে লাগলো যেটা পৃথিবীর কেউ টের পেলো না। সেই ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ওপর পা দিয়ে, পণের টাকার পরিমাণ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে দরাদরি চলতে লাগলো। এতোদিন সাহেবদের বাড়ি থেকে বকুল খালি হাতে ফিরেছে, সেটা পাত্রপক্ষ মানতেই নারাজ। এ কি করে হয়। নিশ্চয়ই সাহেবদের বাড়ি থেকে দেয়া টাকা-পয়সা বকুলের বাবা-মা রেখে দিতে চাচ্ছেন। বোস বাড়ির পরিবেশের আলোকে বকুলের দেখা চেনা পুরুষদের সাথে এ পুরুষদের কোনো মিল ছিলো না। কিন্তু বকুলের নিজেরই-বা কি আছে? মা বাড়ির ঝি, তাকে বোসরা তাদের বাড়িতে রেখেছিল মাত্র, তার বেশি কিছু তো নয়। দেখতেও তেমন আহামরি নয়, আবার বিদ্যের দৌড়ও সেই স্কুল ফাইন্যাল পাশ। সে কতো রকমের কেক বানাতে জানে, কতো সূক্ষ্ম কুরুশের ঘর তুলতে পারে, সোয়েটার বুনতে পারে, শুনে শুনে সুনীলের কবিতা বলতে পারে কিংবা রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে এসব কথা জানতে এই পরিবেশের কোনো লোক আগ্রহী নয়। রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিত, সুচিত্রা মিত্র এরা এ পরিবেশে অপরিচিত আর বেমানান। বস্তির ঘরে প্রায়ই দাদা বৌদি, কিংবা বাবা-মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে বকুলের ছোট ছোট জিনিস নিয়ে মতান্তর হয়ে যেতো। প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যেতেই ধরা খেলো বকুলকে পেয়ে তারাও আনন্দিত নন, ফিরে এসে বকুলও আর সুখী নয়। রাগ করে চলে এসেছে বটে কিন্তু এখন প্রতি মুহূর্তে সে টের পাচ্ছে তার পৃথিবী আর এ পৃথিবী পুরোই আলাদা হয়ে গেছে। এ পৃথিবীর সে আর কেউ নয়। জাগতিক আরাম-আয়েশ যা রাগের মাথায় তুচ্ছ মনে হয়েছিলো সে সমস্ত যে জীবনে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, তা প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়তে লাগলো। গা মোছার জন্যে পরিষ্কার বাথরুম, চা খাওয়ার জন্যে গ্যাস বার্নার, বুক ভরে নিশ্বাস নেয়ার খোলা বারান্দা তাকে প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিতে লাগলো। কিছুদিন পর বকুলের রাগ পড়েছে কিনা দেখতে কাকু কাকিমা একদিন এলেন তাদের বস্তির ঘরে। রাঙা কাকিমা এসে বকুলকে জড়িয়ে ধরতেই সব অভিমান ভুলে কেঁদে আকুল হলো সে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে অভিমান ভাঙিয়ে তারা বকুলকে সাথে নিয়ে এলেন। এতোদিনে বকুল টের পেয়ে গেছে সে স্বাবলম্বী হলে তাদের ছেড়ে যদি চলে যায় সেজন্য তারা তার কাজ, পড়া কিংবা বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী নন। যা করতে হবে বকুলের নিজেকেই করতে হবে। ফিরে এসে বকুল এবার কোনো একটা কাজের কথা ভাবতে লাগলো। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে সে ভাবলো পার্লারে কাজ শিখবে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ দিয়ে এর চেয়ে ভালো আর কিইবা পাবে সে? তার মতো মেয়েদের বাইরে সব জায়গায় কাজ ততো নিরাপদ নয় এখনো এদেশে।

পাশের ঘরের হৈ চৈ'তে তার ভাবনার জাল ছিন্ন হলো। কাকুর বাড়ির লোক আর কাকিমার বাড়ির লোকের মাঝে চলছে আলোচনা। দুপক্ষই নিঃসন্তান কাকু কাকিমার সম্পত্তির চুল চেরা হিসাব নিয়ে বসেছে। তাদের অবর্তমানে কার কতোটুকু অধিকার, কে কাকু কাকিমার কতো কাছের, কতো আদরের, তার ওপর তো নির্ভর করছে কে কতোটুকু পাবে। মানুষের নিষ্ঠুরতায় এ ক'বছরে পুড়ে পুড়ে অনেক শক্ত হয়েছে বকুল, না কাঁদবে না কিছুতেই সে। চোখ জ্বালা করে আসলেও সে শক্ত হয়ে থাকবে। চোখের পানিকে সে মনের জ্বলুনিতে বাষ্প করে চারধারে উড়িয়ে দিবে। কার জন্যে কাঁদবে বকুল? কার কি হয় সে? সবাই কাকু কাকিমার অনেক কাছের লোক বটেই তো, শুধু বকুল ছাড়া। এই দূরের বকুল সকালে ঘুম থেকে উঠে কাকু কাকিমার নাস্তা বানায়, ওষুধ দেয়, দুপুরে তারা কি খাবেন তা রান্না ঝি'কে বুঝিয়ে দিয়ে পার্লারে যায়। সারাদিন কাজ শেষে ফেরার পথে ঘরের বাজার, ওষুধ আর যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে তবে ফেরে। ছুটির দিনে তাদের নিয়ে হাঁটতে বেরোয়, নাটক দেখতে নিয়ে যায়, কাকিমার অনেক দিনের না-দেখা মাসিকে মনে পড়লে তার বাড়ি খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে সেখানে নিয়ে যায়। অসুখ-বিসুখে দৌড়ে ডাক্তার ডেকে আনে। এহেন দূরের বকুলের মনে পাশের ঘরের আপাত রুক্ষ আলোচনা কোনো ছায়া ফেলে না, উল্লসিত ধ্বনিও কোনো রেখাপাত করে না।

৩

খোঁজ নিয়ে কাকিমার অনুমতি নিয়ে বকুল পাড়ার কাছাকাছি একটা পার্লারে ঢুকলো কাজ শেখার জন্য। মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে বকুল কাজ শিখতে লাগলো। ভুরু প্লাক দিয়ে শুরু করে খুব দ্রুতই স্কীন কেয়ারে পৌঁছে গেলো সে। কাজের জায়গায় আস্তে আস্তে অনেকের সাথে তার বেশ ভাব হলো। ভাগ্য বিড়ম্বিত অনেকেই আছে এ পৃথিবীতে তাহলে। সে শুধু একা নয়। দুর্ভাগিনীরা দায়িত্ব নিয়েছে সুখী মানুষদের সুন্দর করে সাজিয়ে গুজিয়ে তোলার। অন্যদের দুঃখের কথা শুনে, নিজের দুঃখ ভাগ করে এক রকম দিন কেটে যাচ্ছিলো বকুলের। সেখানে একটা আলাদা পরিবার তৈরি হলো তার। সবচেয়ে বেশি ভাব হলো ঝর্ণাদির সাথে। গোপন থেকে গোপন দুঃখও দুজন দুজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে লাগলো। স্বামী সন্তান নিয়ে ঝর্ণাদিকেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় দৈনন্দিন জীবনে। একদিন ঝর্ণাদি বকুলকে বললো, এতো ভালো কাজ শিখে এখানে কেনো পড়ে থাকবি তুই? আমি চলে যাচ্ছি ভালো পার্লারে, তুই যাবি সাথে? অনেক ভেবে বকুলও ঝর্ণাদির সাথে যাবে ঠিক করলো। মোটা বেতনে বকুল শহরের নামকরা পার্লারে এখন কাজ করছে। সকালে পার্লারে কাজে যায়, সন্ধ্যে বাড়ি ফিরে বাড়ির কাজ করে, কাকু-কাকিমার দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে বস্তিতে গিয়ে মা-বাবাকে দেখে আসে। তাদের ওষুধপথ্য, সংসারের কি প্রয়োজন দেখে-শুনে নিজের সামর্থ্যনুযায়ী যথাসাধ্য পূরণ করার চেষ্টা করে। বকুলের ভবিষ্যৎ ভেবে মা-বাবা দুঃখিত হন, তাদের সাধ্য সীমিত এই বলে বকুলকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন। বকুলের মাঝে মাঝে কেনো জানি বিশ্বাস হতে চায় না। তার মনে হয়, বিয়ে হলে সে যদি পর হয়ে যায়, মা বাবাকে না দেখে, এ ভয়েই কি মা-বাবা তার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পিছিয়ে থাকেন। এভাবেই ঘুরছিলো ঘড়ির কাঁটা, ক্যালেন্ডার তার পাতায় রঙিন ছবির সাথে বছরের সংখ্যা বদলে দিচ্ছিলো। আস্তে আস্তে মাথার ঘন চুল পাতলা হতে শুরু করেছে, চোখের কোলে ভাঁজ জমতে শুরু করেছে।

রাতে বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। দু-চোখের পাতা জুড়ে থাকে হতাশা, বিষাদ আর ক্লান্তি। জানালার বাইরের অন্ধকার আর তার দু-চোখের অন্ধকার এক সাথে মিশে যায়। বাইরের অন্ধকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষণস্থায়ী, আহ্নিক গতিতে ভোরের আলো রাতের অন্ধকারকে খেয়ে নিবে কিন্তু তার জীবনের অন্ধকারের কি হবে? আজকাল ঝর্ণাদি বলছেন বাবা মা, কাকু-কাকিমার আশা ছেড়ে দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে, ঝর্ণাদি সাহায্য করবেন। সেদিন স্টুডিওতে গিয়ে তিন/চার রকমের পোজে ফটো তুলে এসেছে সে, পাত্রপক্ষকে পাঠাবার জন্যে। ভয়ও লাগে, পত্রিকা দেখে একদম অচেনা অজানা লোক আসবেন, তারা মানুষ কেমন হবেন। যদি ঠকে যায়, তাহলে কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে সে। তারপরও মরিয়া হয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল পাত্র চাই শিরোনামে। খুব বেশি কিছু নিজের সম্পর্কে বলার তো ছিল না, খুব বেশি সাড়া পড়েওনি। যারাও বিজ্ঞাপন পড়ে এসেছিল তারাও তার আশ্রিত অবস্থা জানার পরে আর তেমন আগ্রহী হননি। বোস বাড়ির আশ্রিতা না-হয়ে যদি দত্তক মেয়ে হতো সে তাহলে হয়তো একটা সাধারণ আটপৌরে ঘরের, শিক্ষিত মার্জিত একটা ছেলেকে স্বামী হিসেবে পেতে পারতো। রাজপুত্র কিংবা ধনী কিংবা বিরাট কোনো চাকুরিজীবির আশা তো সে রাখেনি মনে। তাকে শুধু একটু বুঝবে, শিক্ষিত, মার্জিত এইটুকু স্বপ্ন দেখে সে তার কাঙ্ক্ষিত স্বামী নিয়ে। দু-একজন বয়স্ক বিপত্নীক সামান্য আগ্রহ প্রকাশ করলেও বকুল নিজেই কেনো যেন তার মন থেকে সাড়া পেলো না।

পার্লারের অনেকেই বলে তুই কেনো কারো সাথে ভাব করার চেষ্টা করিস না? কিন্তু ভাবটা কখন করবে বকুল আর কার সাথে? সে তো অফিসে কাজ করে না, কোনো ছেলের সাথে যোগাযোগ হওয়ার সুযোগ কোথায় তার জীবনে? রাস্তায় হাঁটার মাঝে কতো জনকেই তো দেখে, কাকে বলবে, এসো ভাব করি? আর বলবেই-বা কোন্ মুখে, আশ্রিতার প্রতি আগ্রহী হবেন? আর ভাবের কাণ্ড নিয়ে পাড়া থেকে মাঝে মাঝে যে ধরনের ঘটনা কানে আসে তাতে তার সাহসেও কুলায় না। এগুলো বড়লোকের ছেলে-মেয়েকে মানায়, তাদেরকে না। কাকু-কাকিমাকে গোপন করে পাড়া থেকে দু একজন চেষ্টা করেছিল তার বিয়ের জন্য কিন্তু কোনো শিক্ষিত ছেলে, সে যতো ছোট চাকরিই করুক, কারো বাড়িতে আশ্রিত থাকে এমন মেয়েকে বিয়ে করলে সমাজে লোকে কি বলবে সে কথা ভেবে বকুলের দিকে মুখ তুলে চাইলো না। আজকাল বকুল ভাবে তাহলে সে কোনো শ্রেণীতে রইলো? ভদ্রলোকের সমাজে সে গৃহিত নয়, আর ছোটলোকদের সমাজে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। বোস বাড়িতে এসে আজ সে কূল হারা। কিইবা ক্ষতি হতো যদি সে রাঙা কাকিমার মতো ছোট টিপ না আঁকতে জানতো কপালে কিংবা চিকন পাড়ের ডুরে শাড়ি না-পরতো। কপালে আজ থ্যাবড়ানো সিঁদুর নিয়ে কোনো সস্তার শাড়িতে নিজেকে জড়িয়ে, কারো আদরে সোহাগে দিন তো কাটিয়ে দিতে পারতো। তার কোল জুড়ে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতো যে হয়তো কারণে অকারণে তাকে মা বলে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতো।

আজ মনে হয় বৃথাই এই রবীন্দ্র সদনে যাওয়া, এই রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া। বৃথা এই রান্নার বই দেখে নানা রকম স্বাস্থ্যসম্মত রান্না করা। মার্জিত দেখানোর জন্য নিজের প্রতি এতো যত্ন নেয়া। বাবা-মাকে দেখতে বস্তিতে যখন যায়, ছোট বেলার খেলার সাথীদের সাথে দেখা হয়ে যায় কখনো সখনো। এক পলক দাঁড়িয়ে কুশল সংবাদ আদান প্রদানের ফাঁকে তৃষিত নয়নে সে তাদের ভিতরটা কেটে কেটে দেখে নিতে চায়। সস্তার শাড়ি, অমার্জিত সাজগোজ, তেল চুপচুপে চুল কিন্তু মুখে অন্যরকম একটা লাবণ্য। এর নাম কি সুখ? কোলে ছেলে নিয়ে যখন সংসার সম্বন্ধে হাজারটা অনুযোগ করে, গলার স্বরটা ওদের কেমন যেনো পালটে যায়, এটাই কি আনন্দ? তারা যখন তাকে বলে ঘর বর হয়নি, বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে, তার ভিতরটা কাঁপতে থাকে। সে কম্পনে মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কাকে বলবে এ কষ্টের কথা। কি হতো বোস বাড়িতে না-থেকে যদি দিদিদের মতো মায়ের কাছেই থেকে যেতো। যা জানতো না কোনোদিন সেটা হারাতো না। এখন মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, সুনীল, হেমন্ত, মান্নার চেয়ে এই বস্তির আকাশে ভেসে যাওয়া হিন্দী গান প্যায়ার কা তোফা তেরা, পাড়ার ছেলেদের খিস্তি গালি, বারোয়ারি পূজার মণ্ডপ এগুলোও একটা জীবন চালিয়ে নিতে কম কিছু না। বড় কিছু পেতে গিয়ে আজ সে নিঃস্ব হয়ে গেলো।

কী কী অন্যায় করেছে এ জীবনে? কী কী খারাপ কাজ করেছে? জ্ঞানত কার কার ক্ষতি করেছে? কার দুঃসময়ে হেসেছে, কার দুর্ভাগ্যে খুশি হয়েছে? ছোটবেলায় কত পাখির সংসার ভেঙে দিয়েছে গাছের ডাল থেকে, সেই কি ঘোর পাপ হল? সিনেমায় দেখা নায়ককে মনে মনে তার নিজের বলে কল্পনা করতো তাতেই কি তার চিত্ত অশুদ্ধ হল? তাই কি বিশেষ কারো ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হলো? কিন্তু সজ্ঞানে বড় কিছুর প্রতি হাত বাড়িয়েছিল কি? কি পাওয়ার জন্য আজ সব হারালো বকুল? কার কাছে এর প্রতিকার চাইবে? আজকে তার এই নিয়তির জন্য তার কি অপরাধ? কেন পৃথিবী তাকে তার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করলো? দিনটা কাজের মধ্যে কেটে যায়। ভয়াবহ লাগে একলা থাকা রাতগুলোকে। একাকিত্বকে চেনা যায় এই দুঃসহ দীর্ঘ রাতের দিকে তাকিয়ে। তারায় তারায় খুঁজে বেড়ায় সেই মুখ যা শুধু তার একান্তই নিজের। একাকিত্ব ফালা ফালা করে কাটে তাকে। দেহের তাপ তবুও সহ্য করে নেয়, মনের চাপ বয়ে বেড়ানোই দায় এখন।

নিজের ভাবনা থেকে হঠাৎ করে বাস্তবে ফিরে এলো। সকালে এসেছিল সবাই কিন্তু প্রায় দুপুর হয়ে এলো। দুপুরে কি সবাই এখানে খাবে? খাবার তাহলে বাইরে থেকে আনতে হবে, এতো লোকের খাওয়ার যোগাড় তো করেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুল। কি আনবে? মোগলাই না চায়নিজ? কাকিমাকে ডেকে জেনে নিতে হবে। বকুল সবসময় সব ম্যানেজ করে নেয় তাই হয়তো কাকিমা এসব নিয়ে ভাবছেন না। অভ্যাসবশত নিজেকে আয়নায় দেখে নিয়ে চুলে সামান্য চিরুনি বোলালো, শাড়িটা গুছিয়ে আঁচল ঠিকঠাক করল, মুখটায় ভালো করে পাউডার পাফ করে পায়ে পায়ে বসার ঘরের দিকে এগুলো। মনে যতো কষ্টই থাকুক, তার ছায়া মুখে পড়তে দিবে না। কালো মুখে পাউডার ঘষে ঘষে সুখের উজ্জ্বলতা নিয়ে আসবে। বকুল এখনো খাবার ব্যবস্থা করেনি শুনে কাকিমা অবাক হলেন। বললেন শিগ্‌গীর খাবার নিয়ে আসতে। খাবার এনে বকুল টেবিল রেডি করে সবাইকে ডাকতেই হই হই সবাই এলেন খেতে। খাওয়ার টেবিলে বেশ খুনসুটি করে আনন্দময় পরিবেশে খাওয়া হলো। বকুলও সবার সাথে হাসি-আনন্দে যোগ দিল, হ্যা হ্যা করে হেসে গড়িয়েও পড়ল মজার সব কথায়। বিকেলে সবাই বিদায় নিলেন। আলোচনা যা হলো তা উকিল ডেকে শীঘ্রই উইল করে ফেলবেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে।

ডাইনিং-এ দাঁড়িয়ে থালা-বাটি গোছাতে গোছাতে অনেক কথা শুনেছে বকুল। কিন্তু আগ বাড়িয়ে নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সন্ধ্যেবেলা ক্লান্ত গলায় রাঙা কাকিমা জানালেন, কাকুর প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা, ব্যাঙ্কে জমানো টাকা, কাকিমার পারিবারিক গয়না সব কাকু আর কাকিমার ভাই-বোনের ছেলেমেয়েরা সমান ভাগে পাবে। যতোদিন তাদের দুজনের কেউ বেঁচে থাকবেন, ততোদিন বকুল এ বাড়িতে থাকতে পাবে। আরো কি কি যেন বলেই যাচ্ছিলেন কাকিমা, কিন্তু বকুলের কান দিয়ে সেসব কথা আর ঢুকছে না। তার পৃথিবী টলছিল তখন। মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল তার, এ বাড়িতে জীবনের বত্রিশ তেত্রিশ বছর কাটিয়ে দিলো, আপনজনের সামান্য স্বীকৃতি হয়তো পাবে সে তাদের কাছে। কিন্তু একি শুনলো, কাকু-কাকিমা না-থাকলে তারপর কে জানে তারপর...? মনে মনে চিৎকার করে ভগবানকে বললো, তুমি তো জানতে ঠাকুর কাকু-কাকিমা আমি তাদের মন থেকে ডেকেছি, মন থেকে মেনেছি, মনে কোনো পাপ, লোভ ছিল না ভগবান। আমার এ সমস্ত ভক্তি ভালোবাসার বদলে আমি সামান্য স্বীকৃতি কেনো পেলাম না? কি পাপে তুমি আমায় এই সাজা দিলে? আমি এই পৃথিবীতে কেন কারো আপন হলাম না?

০২.০২.১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলোমেলো প্রেমের গল্প

১

তখন থেকে টেবিলের ওপর মোবাইলটা নেচে যাচ্ছে। হ্যাঁ বেজে যাচ্ছে না, নেচে যাচ্ছে। তিতলি বই খুলে বসে আছে বটে টেবিলে কিন্তু সেকি পড়ছে নাকি মোবাইলকে দেখছে বোঝা যাচ্ছে না। আনমনা প্রচণ্ড, শুধু সেইটুকুই বোঝা যাচ্ছে। তিতলি ভীষণ রেগে আছে সায়ানের ওপর। সায়ান বিকেল থেকে সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে ফোন করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে, কিন্তু তিতলি কিছুতেই ফোন ধরছে না। বাসায় যেনো কারো কানে না যায়, মোবাইলটাকে ভাইব্রেশনে দিয়ে রেখেছে তিতলি। বিকেল থেকে কতো এসএমএস, কতো কাকুতি মিনতি সায়ানের, ফোনটা একবার তোল জান। না তিতলি তুলবেই না, গতো দুই দিন ধরে কি কম কষ্ট পেয়েছে সে যে এখুনি সায়ানের ফোন ধরতে হবে? সায়ানের সব সময় কাজের দোহাই, সে খুব ব্যস্ত। আর তিতলি? তিতলির কি সায়ানের ফোনের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। গতো দুদিন সারাক্ষণ মোবাইল চেক করেছে, নাই কোনো মেসেজ, নাই কোনো মিসড কল। কাজ থাকলে কি তিতলিকে ভুলে যেতে হবে?

আজ তার সময় হয়েছে বলে কি আজই তিতলিকে ফোন তুলতে হবে? এ্যাহ কি আমার চাকুরিরে, ওনার ট্যুর পড়েছে বসের সাথে। যেনো আর কেউ সরকারি চাকুরি করে না আর তাদের বসের সাথে ট্যুর পড়ে না! তাই বলে কি দুমিনিটের জন্য কোনো ফোন করা যায় না? অথচ সেদিন রাতে খালাতো বোনের বিয়েতে গেছে তিতলি। সারাক্ষণ মেসেজ পাঠিয়ে যাচ্ছে, কখন ফিরবে বাড়িতে, অন লাইনে আসবে না আজ সে? মায়ের চোখ বাঁচিয়ে লেডিস রুমে যেয়ে তিতলিকে রিপ্লাই করতে হলো, আজ দেরি হবে ফিরতে, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। তখন কি আহ্লাদ সায়ানের, তুমি আমার দুচোখে উড়ে এসে না বসলে আমার ঘুম আসে না জান। তার দুদিন পরেই এমন আচরণ! সায়ানকে ভীষণ একটা শাস্তি দিতে ইচ্ছে করছে তিতলির, ভীষণ। কিন্তু তিতলির পৃথিবীতে এমন কোনো শাস্তিই নেই যা তিতলিকে না আঘাত করে সায়ানকে করে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ফোন তুলছে না সায়ানের, তিতলির কি কম কষ্ট হচ্ছে, কম কষ্ট? দুদিন পরেই টিউটোরিয়াল, পনেরো নাম্বার তাতে, সামনে থার্ড ইয়ার ফাইন্যাল। তাতে যোগ হবে এই নম্বর কিন্তু আজ তিনদিন হতে চললো সে পড়ায় মনই দিতে পারছে না।

ক্লাশে বসে থাকে ঠিকই, লেকচার ঢোকে না কিছুই তার কান দিয়ে। সবার চোখ বাঁচিয়ে মাঝে মাঝেই সেল চেক করে, মেসেজ এসেছে কিনা। সায়ানের সাথে ঝগড়া হলে সে ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত পারে না। মা বারবার জিজ্ঞেস করলেন আজ, ঐটুকু খেয়ে উঠে গেলি? সামনে পরীক্ষা তাই বাঁচোয়া, নইলে বাসার সবাই ভাবতো কি হয়েছে তিতলির? কিন্তু তাতে সায়ানের কি? তার তো তিতলির মতো মনের ছাপ মুখে পড়ে না। সে মহানন্দে অফিস করে যায়। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে এখন, তিতলি নিজেকে সামলানোর জন্য পিসিটা অন করলো। ভাবলো কিছুক্ষণ গেম খেললে হয়তো মনটা একটু হাল্কা হবে। তারপর ঠিক করে মন দিয়ে পড়তে বসবে। করবে না করবে না ভেবেও কখন যেনো মেসেঞ্জারে লগ ইন করে ফেললো। আর যায় কোথা, সায়ান ওকে ধরে ফেললো। এই এক সমস্যা তিতলির, সায়ান পাশে থাকলে তার মাথা আর হৃদয় আলাদা ভাবে কাজ করে না। সায়ান তার মাথার বারোটা বাজিয়ে ফেলে। মাথা অফ হয়ে শুধু মন কাজ করতে থাকে তার। যেভাবেই হোক, যতো কাণ্ডই ঘটুক সায়ান তাকে ঠিক বুঝিয়ে ফেলবে। সে কিছুতেই আর রাগ করে থাকতে পারবে না।

তিতলি কেঁদে কেটে তারপর এক সময় আবার সব ভুলে যাবে। হাঁদা সায়ানটা এসে লাইব্রেরির সামনে দাঁড়ালে তিতলি ওর সাথে না যেয়ে কিছুতেই পারে না। কতো ভাবে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে, কোন দিকে তাকাবেই না সোজা লাইব্রেরিতে ঢুকবে আর বেরোবে, কিন্তু লাইব্রেরির কাছাকাছি আসতেই তার অবাধ্য চোখ দূর থেকে কাকে যেনো খুঁজতে থাকে। সায়ান পাশে এসে খুব নরম গলায় যখন ডাকবে 'জান, কেমন আছো' তখন তিতলি আর এড়াতে পারে না। সব ভুলে সায়ানের হাত ধরে সে উড়তে থাকে। আর ভিতরে ভিতরে তিতলি জানে, সায়ানও জানে তার এই দুর্বলতার কথা। যখন অভিমানের তীব্রতা কমে যায় তিতলি অনেক সময় নিজেও খুঁজে পায় না কি নিয়ে সে এতো রেগে গেছিলো। হ্যাঁ, তিতলি স্বীকার করে তার রাগের কারণগুলো হয়তো খুবই সামান্য কিন্তু এই পৃথিবীর সবার কাছ থেকে পাওয়া সব আঘাত সইতে পারলেও সায়ানের কাছ থেকে সামান্যের থেকে সামান্য অবহেলাটুকুও সে সইতে পারে না। এই পৃথিবীর কারো কাছে সে হয়তো কিছুই না কিন্তু কোথাও একজন আছে যার তিতলির গলা না-শুনলে ভোর হয় না, তিতলির মেসেজ না পেলে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমাতে পারে না, মন দিয়ে অফিস করতে পারে না। তিতলিকে ঘিরে কারো দিন ও রাত আবর্তিত হয়, এই অনুভূতিটা কি কম? শুধু এই অনুভূতিটাই তিতলিকে দিন-রাত হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

মেসেঞ্জারে টুকটুক করে সায়ানের সাথে কথা বলতে বলতে কখন যে রাত তিনটা বেজে গেলো টেরই পেলো না তিতলি। সায়ান তাগাদা দিলো ঘুমকাতুরে তিতলিকে শুয়ে পড়তে। সকালেই ক্লাশ আছে। ঠিক করে না ঘুমালে মন দিয়ে লেকচার শুনতে পারবে না। তিতলির পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই সজাগ দৃষ্টি তার। তার জন্যে যাতে তিতলির পড়া নষ্ট না হয় সেদিকে খুব খেয়াল রাখে সায়ান। কথা শেষ করে শুতে যাচ্ছে, মশারি গুঁজছে এমন সময় মোবাইলটা আবার নড়ে উঠলো, সায়ান আবার। কৃত্রিম রাগ গলায় এনে তিতলি আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলো, আবার কি? নরম গলায় হাসতে হাসতে সায়ান বললো, ম্যাসেঞ্জারে কথা বলে কি মন ভরে? আজ তিন দিন হলো তোমার গলা শুনি না জান। তোমার গলা না শুনতে পেলে আমার কি রকম অস্থির লাগতে থাকে জানো না তুমি? এখন আমার সুন্দর ঘুম হবে, মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখবো তোমাকে নিয়ে। তিতলির গলা আবার ভরে এলো অভিমান, গত দুদিন কি সেটা তোমার মনে ছিলো না? সায়ানের মতো অত সুন্দর করে গুছিয়ে না বলতে পারলেও তিতলির তো তাই হয়, সেটা কি সে বুঝতে পারে না? ভালোবাসা আর অভিমানের দোলাচলে এক মিষ্টি মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ঘুমাতে গেলো তিতলি।

২

প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত কি লম্বা হয়ে যায়? চব্বিশ ঘণ্টা এতো লম্বা হয় কেনো তিতলি ভেবে পায় না। সপ্তাহের ছয়টা দিনকে তিতলির মাঝে মাঝে বছরের চেয়েও লম্বা মনে হতে থাকে। মনে হয় এ নিদারুণ সপ্তাহ আর শেষ হবে না, সায়ানের সাথে আর তিতলির দেখা হবে না। শুধু সায়ান যখন পাশে থাকে ঘড়িটা তখন উড়ে চলতে থাকে। এতো আনফেয়ার কেনো এই পৃথিবীটা। অপেক্ষার সময়টা এতো লম্বা আর...। সায়ান পাশে থাকলে সেই ঘণ্টাগুলো যেনো মিনিট থেকে সেকেন্ড-মাইক্রো সেকেন্ড হয়ে উড়ে যায়। কতো কি ভেবে রাখে, দেখা হলে সে সায়ানকে এটা বলবে ওটা জিজ্ঞেস করবে কিন্তু ও সামনে এসে দাঁড়ালে এমন ঝড়ের কাঁপন শুরু হয়, সময় কোথা দিয়ে ওড়ে, ভেবে রাখা কিছুই আর মনেও থাকে না, বলাও হয় না। আর তিতলির মাথাটাকে সায়ান তো কাজও করতে দেয় না। হলে ফিরে ব্যাগ গোছাতে গোছাতে তিতলির আবার রাগ হতে লাগলো। একটু দ্বিধায়ও পড়ে গেলো। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে সে। বাবা-মা তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন, অনেক বিশ্বাস করে তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে ঢাকা পড়তে পাঠিয়েছেন। এভাবে বন্ধুর হাত ধরে বেড়াতে যাবার কথা তাদের কানে গেলে তারা কি ভাববেন? বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনবেন না তার বিরুদ্ধে?

তিতলির কি এটা ঠিক হবে? কিন্তু যখনই অপর পিঠটা ভাবছে, সায়ানের এতো কাছাকাছি কদিন থাকতে পারবে, অজানা একটা ভয় আর আনন্দ তাকে ব্যাকুল করে তুলছে। নিজের মনেই অনেকক্ষণ নিজের যুক্তিগুলোকে সাজালো সে। সে তো পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছে না, বেশ মনোযোগী ভালো ছাত্রী সে, ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে তার। আর সায়ানের সাথে তার সম্পর্কটা একান্তই তার নিজের ব্যাপার। বাবা-মায়ের মেয়ে হয়েছে বলে কি তার নিজের কোনো পছন্দ থাকতে নেই। যুক্তিগুলো সাজাচ্ছে বটে কিন্তু নিজের মনই বলছে এগুলো ঠিক ততোটা জোরালো যুক্তি নয়। অস্থির লাগছে ভিতরটা। তিতলির দেরি দেখে ওদিকে সায়ান বারবার ফোন দিয়ে যাচ্ছে। নিজের ভিতরেই অধৈর্য হয়ে উঠলো সে। চার-পাঁচবার কল মিসড হবার পর ফোন ধরে বললো সে, আর আধ ঘণ্টা জান, প্লিইইজ। সায়ান একটু ক্ষুণ্ন হয়ে বললো, বাস কি তোর আমার জন্যে অপেক্ষা করবে নাকি? দ্রুত বাকি জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে ফেললো তিতলি তারপর ঢুকলো বাথরুমে। খুব ভালো করে গোসল সেরে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। নিজেকে খুব সাজাতে ইচ্ছে করছে সায়ানের জন্যে কিন্তু সাজগোজে অপটু সে আর কি করবে ভেবে পেলো না। সায়ানের কিনে দেয়া জিন্স আর ফতুয়া আর পছন্দের সুগন্ধী মেখে বেরোল।

সায়ান অপেক্ষা করছিলো হলের কাছাকাছি, তিতলি বেরোতেই ওকে টেনে নিয়ে সিএনজি ধরে বাস ডিপোর দিকে প্রায় উড়ে চললো। সিএনজিতে উঠেই সায়ানের ধৈর্যহীন কণ্ঠ বলে উঠলো, মেয়েদের কেনো যে এতো দেরি হয়, বাস মিস করিয়ে দিচ্ছিলি প্রায়। তিতলির মধ্যে অচেনা একটা অনুভূতি কাজ করছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে, কেনো সে নিজেই জানে না। মুখ ঘুরিয়ে রাখলো, সায়ানকে তার চোখের পানি দেখতে দিতে চাইছে না। উত্তর না দিয়ে রাতের ঢাকা দেখতে থাকলো। সোডিয়াম আলোর নিচে রাতের ঢাকাকে অচেনা লাগে। বাসের টেনশনে তিতলির এই পরিবর্তন সায়ান লক্ষ্যই করলো না। বাস কাউন্টারে যেয়ে নিজেদের ব্যাগ তাদের হাতে তুলে দিয়ে ভাবলো সামান্য কিছু স্ন্যাকস খেয়ে নেয়া যাক। দুপুরে এতো দেরিতে খাওয়া হয়েছে দুজনেরই যে ভাত খাওয়ার ইচ্ছে কারোই নেই এখন। সায়ানের কাপুচিনোর প্রতি দুর্বলতা আছে, তিতলি জানে সেটা। সামনেই সুইস বেকারী তাই তিতলি সেখানে যেতে চাইলো। এই জন্যেই মেয়েটাকে এতো ভালো লাগে সায়ানের। ওর সামান্য থেকে সামান্য জিনিসের প্রতি তিতলির ভালোবাসা মাখা যত্ন অনুভব করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে কখনো বলবে না, স্বীকারও করবে না যে, ওকে ভালোবাসে। বরং ঠোঁট উলটে বলে দিবে, আমার ঠেকা পড়েছে তোকে ভালোবাসতে। তিতলির এই ঠোঁট উল্টানো ভঙ্গিটা দেখতে এতো ভালো লাগে। সায়ান কাপুচিনো আর বীফরোল নিলো, তিতলি মাফিন আর কফি। খাওয়ার মাঝেই বাসের হর্ণ, দৌড় লাগালো দুজনে।

বাসটা বেশ নতুন, সিটগুলো বেশ ভালো। ডান পাশের রোতে মাঝের দিকে সিট পড়েছে দুজনের। রাতের বাসে বেশির ভাগ যাত্রীই ঘুমিয়ে আছেন। ঘুম নেই এই যুগলের। জানালা দিয়ে দুজন বাইরের দিকে তাকিয়ে তারা ভরা আকাশ দেখছে। প্রতিদিনের চেনা এই আকাশটা আজ খানিকটা যেনো অচেনা। রোজ যেনো আকাশটাকে ধূসর আর কালো লাগতো। আজ লাগছে খাপছাড়া গাঢ় নীল। মনে হচ্ছে পুরো আকাশ আজ চাঁদের প্রেমে মজে আছে। কাত হয়ে বেহায়া আকাশটা চাঁদের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। জ্যোৎস্নার আলো বাসের জানালা গলে তিতলির মুখে এসে পড়েছে। আলো মাখা তিতলিকে অচেনা লাগছে সায়ানের। এই তিতলি তার পুরোই অদেখা। সায়ানের হাতের মুঠোয় তিতলির হাত। এতো মায়া এই চোখে আগে কোনোদিন কি খেয়াল করেছিল সে? মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলার একটা তীব্র ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যদি কখনো এ সময় হারিয়ে যায় ভাবিতেই সায়ান নিজের অজান্তে জোরে চেপে দিলো তিতলির হাত, তিতলি শব্দ করতে পারলো না শুধু নড়ে উঠলো। তিতলি খানিকটা সহজ হয়ে উঠেছে এখন। তিতলির কানের কাছে মুখ এনে সায়ান বললো, একটা গান গাইবি, প্লিইইজ? চোখ নেড়ে না-করে সাবধানে সায়ানের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে রইলো সে। সায়ানের গায়ের গন্ধে একটা অচেনা মাদকতা সব সময়, যেটা তিতলিকে সারাবেলা মাতাল করে রাখে। এখন সে নিঃশব্দে চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে সায়ানের গায়ের গন্ধে ডুবে থাকতে চাইছে। ফিসফিস করে কথা বলে কিংবা গুন গুন করে গান করে এই নৈঃশব্দতার সৌন্দর্য নষ্ট করতে চাইছে না।

কারো চুলের গন্ধ এমন পাগলপারা কি করে হয়, কোনো ধারণাই ছিলো না সায়ানের। সব সময় তিতলির পাশে বসলে, তার গায়ের গন্ধের চেয়েও চুলের গন্ধ তাকে টানে বেশি। তিতলির চুলে নাক ডুবিয়ে রেখেছে সে, মাঝে মাঝেই নাক তিতলির চুলে ঘষছে। এতো কাছে এভাবে আর কোনোদিন তিতলিকে পায়নি সে। সবার চোখ এড়িয়ে আস্তে করে তিতলির কপালে আর মাথায় তার ঠোঁট ছোঁয়ালো। সারা শরীরে এক অজানা কাঁপুনি টের পেলো তিতলি। সায়ানের হাতে রাম চিমটি বসালো তার লম্বা নখ বসিয়ে। তারপর মুখ তুলে মিষ্টি করে হাসলো সায়ানের চোখে চোখ রেখে। সায়ানের সারা পৃথিবী সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিতে দুলতে লাগলো। তিতলি আর পুরো পৃথিবী এক মোহনায় মিশে গেলো তার। তিতলির বুকে আবার ধ্রিম ধ্রিম মাদলের বাজনা শুরু হলো। মনে হতে লাগলো সময় যেনো এখানেই থেমে যায়, এ বাসযাত্রা যেনো কোনোদিনই শেষ না হয়। ভোরের দিকে দুজনের কখন চোখ লেগে এসেছিলো টের পায়নি। স্বপ্ন আর বাস্তবে, বাস্তব আর স্বপ্নের ঘোরে রাস্তা কখন ফুরিয়ে গেলো টের পেলো না দুজনই। বাস যখন থামলো চারপাশে তখন নরম আলো পৃথিবীকে ছুঁয়ে দিয়েছে। চারপাশটাকে অন্যরকম স্নিগ্ধ লাগছে। ভোরের আলোয় এক ধরনের পবিত্রতা থাকে। এ আলো গায়ে মেখে নিজেকে কেমন যেনো শুদ্ধ মনে হতে থাকে।

বাস ডিপো থেকে বেরোতেই রিকশাওয়ালারা জেঁকে ধরলো, কোথায় যাবেন, কোন্ হোটেল। ভিড়ে পড়তে ইচ্ছে করলো না এসময়। খুব সাবধানে তিতলির হাত ধরে ভিড় বাঁচিয়ে সায়ান ডিপো থেকে বের হয়ে আসলো। ঐতো দূরে ক্যাব দেখা যাচ্ছে। হাত নেড়ে ক্যাবকে ওদের দিকে আসতে বললো। তিতলি রাগ দেখিয়ে বললো, কেনো অযথা এতোটা খরচা করবি শুনি? রিকশায় আরামে চলে যেতাম। সায়ানের চোখে দুষ্টুমির হাসি খেলা করে উঠলো, হেসে বললো, ঠিক আছে চলো না। রোজ তো আর করছি না। তিতলি রাগতে গিয়েও হেসে ফেললো। খুব ইচ্ছে করছিলো সায়ানের কোঁকড়ানো চুলগুলো হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিতে। আজ প্রথমবারের মতো ওরা দুজন দুজনার এতো কাছে, ব্যস্ত নগরীর পরিচিত মুখ আর ভিড়কে ফাঁকি দিয়ে। জীবনটা এতো সুন্দর কেনো? নিজেকে চিমটি দিয়ে দিয়ে দেখছে, সব কি স্বপ্ন, নাকি সত্যিই সে সায়ানের এতো কাছে আজ? যদি স্বপ্নই হয় তাহলে সে হাতজোড় করে প্রার্থনা করছে, এ ঘুম যেনো ভেঙে না যায়, তার স্বপ্ন যেনো হারিয়ে না যায়। পাতালপুরীর রাজকন্যা হয়ে সে ঘুমিয়েই থাকুক, যাক হারিয়ে তার সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি। সে অনন্তকাল সায়ানের হাত ধরে হাঁটবে, দূর থেকে দূরান্তে।

৩

মাঝে মাঝে তিতলি আর সায়ানের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়ে যায়। পরে ঝগড়ার কারণ দুজনের একজনও খুঁজে পায় না। কখনো খুঁজে পেলেও অবাক লাগে এটা কি এতো তীব্র অভিমানের কোনো ব্যাপার ছিল? তিতলি আর সায়ানের মাঝে ঝগড়া হয় কথাটাও বোধ হয় পুরো সত্যি না। ঝগড়া এক তরফা তিতলিই করে। সায়ান শুধু ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে যায়। কিন্তু সে মুহূর্তে সায়ান যা বলে তিতলি তাতেই আরো রেগে যায়। সেটাকেই উলটো করে ধরে, উলটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকে যায়। বোঝাতে বোঝাতে একটা সময়ের পর ক্লান্ত হয়ে সায়ান থেমে যায়, তিতলিও বকে বকে ক্লান্ত হয়, কাঁদে। দু-চারদিন চুপ করে থাকে, মাঝে মাঝে কথা, মেসেঞ্জার, ফোন সব দরজা বন্ধ করে রাখে সায়ানের সাথে। সময়ের সাথে রাগের তীব্রতা কমে গেলে আবার মিস করতে থাকে তার সাথী তার বন্ধুকে, তারপর আস্তে আস্তে আবার নরম হয়। সায়ানের মনে হয় দূরত্ব এ ঝগড়ায় বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সায়ান ব্যস্ত চাকরি নিয়ে, তিতলি পড়াশোনা নিয়ে। সময়ের পার্থক্য আর আছে ব্যস্ত ঢাকার অসহ্য যানজট। শহরের মধ্যে সামান্য একটু পথ অতিক্রম করতে প্রাণান্ত হতে হয়। তাই চাইলেও দুজনের নিয়মিত দেখা হয় না, মেসেঞ্জারই ভরসা। দুজন দুজনের মুখ দেখতে পায় না, অনর্গল কথা বলে যায়। তিতলির রাগের মুহূর্তে সায়ান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তিতলি কখনোই এতো কঠিন কঠিন কথাগুলো বলতে পারতো না, যা সে অনায়াসে মেসেঞ্জারের উইন্ডোতে লিখে ফেলে।

বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আকাশ পরিষ্কার হলে মিষ্টি হাওয়া যখন মনকে ছুঁয়ে এপাশ থেকে ওপাশে যায় তখন সায়ান তিতলির মাথার চুল সরাতে সরাতে গাল ছুঁয়ে মাঝে মাঝে বলে, রাগ করলে তুই আমার কোনো কথাই শুনিস না, জান। এতো ভয়ানক আক্রমণ করে এতো কঠিন কঠিন কথা কিভাবে বলিস তুই? তুই কি তোর নিজের মধ্যে থাকিস না? আমার মুখ তোর মনে পড়ে না একবারও? তিতলি লজ্জা পেয়ে বলে, তুই আমাকে থামিয়ে দিতে পারিস না? মাথা ঝাঁকায় সায়ান। তারপর বলে, তুই এতো দূরের হয়ে যাস তখন যে আমি আমার ভাষা হারিয়ে ফেলি, কথা খুঁজে পাই না তোকে মানানোর মতো। তুই তো ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকিস না। কাছে থাকলে জড়িয়ে ধরে তোকে বলতে পারতাম, তুই সব নিজের মতো ভুল ভেবে নিচ্ছিস জান, আমি এমন কিছুই করিনি আসলে। তুই কষ্ট পাস এমন কিছু আমি কেমন করে করতে পারি? তুই ভাবতেও পারবি না, তোর কঠিন কঠিন কথাগুলো আমায় কাঁদিয়ে দেয়, আমার চোখ ভিজে যায়। তিতলিও আস্তে আস্তে ভিজে নরম গলায় বলে তখন, তোর কান্নাই ইম্পর্ট্যান্ট, আর আমি যে কাঁদি তোর কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে, সেটা তো কিছু নয়। তুই কেনো বুঝতে পারিস না, পৃথিবী উলটে গেলেও আমার তেমন কষ্ট লাগে না। কিন্তু তুই তো পৃথিবীর মধ্যে পড়িস না, তোর সামান্য থেকে সামান্যতর জিনিস আমায় এলোমেলো করে ফেলে। সায়ান উত্তর দিতে পারে না, কারণ ইমপালসিভ হয়ে কিছু না কিছু সে করে ফেলে সত্যি কিন্তু তিতলিকে হার্ট করা তো সে মিন করে না।

গাল ফোলা কমে গেলে আবার কুট কুট এসএমএস আদান প্রদান চলে দিন
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর। রাতে তিতলি অনেক সময়ই পড়া নষ্ট করে সায়ানের পাশে বসে পড়ে। মেসেঞ্জারে বসাটাকেই পাশে বসা বলে দুজনে। খুটখুট টাইপ চলে দুপাশের দুজানালায়। সারাদিন কে কি করলো, সমস্ত তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ ব্যাপার দুজনেরটাই দুজনের জানা চাই। কখন দুজনে দুজনের জন্য কি ভেবেছিলো, কি খেতে গিয়ে মিস করছিলো বলতে বলতে ঘণ্টা পার হয়ে যায়। কোন গানটা ভালো লাগলো দুজনের সেটা শেয়ার করে শোনা চাই। একটাই সমস্যা, তিতলি রাত জাগতে পারে না। ভীষণ ঘুমকাতুরে সে। কিছুক্ষণ গল্প হলেই বলবে, আমি যাচ্ছি ঘুমাতে। কি করবে ঘুম না-হলে ঠিক করে পরদিনের লেকচার তার মাথায় ঢোকে না। একে তো এত অল্প সময় তিতলিকে কাছে পায় সায়ান। তারমধ্যে কথা না-বলতেই বলবে, ঘুমাতে যাই। অভিমান হয়ে যায় সায়ানের। মাঝে মাঝেই বলে ফেলে, আমার কি হবে রে? একা একা ঘুমুতে যাচ্ছিস যে বড়, আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তবে যা। তিতলি ফিক করে হেসে ফেলে, বুড়ো ধাড়ি ছেলে তোকে আবার ঘুম পাড়াবো কিরে। অভিমান নিয়ে সায়ান লেখে তখন, সারাটা দিন আমার সময় কাটতে চায় না, তোকে কখন কাছে পাবো সেই আশায় থাকি। তখন ঘড়িটা এতো স্লো চলে। আর তুই কাছে এসে বসা মাত্র লাফিয়ে লাফিয়ে ঘণ্টাগুলো মিনিটে আর মিনিটগুলো মুহূর্ত হয়ে চলতে থাকে, নট ফেয়ার, জাস্ট নট ফেয়ার। সায়ান যখন এমন আদর আদর কথা বলে, তিতলির তখন সায়ানকে রাগিয়ে দিতে ভালো লাগে। বেছে বেছে এমন সব কথা বলবে যাতে সায়ানের পিত্তি জ্বলে যায়। সায়ানের রাগী মুখটা কল্পনা করে হাসতে হাসতে লিখবে, পৃথিবীতে কিছুই ফেয়ার নারে, কী আর করবি, এসেই যখন পড়েছিস তখন বেঁচে যা। মনে মনে মুখ ভেংচি কেটে বলবে, আমায় যে কষ্ট দিস তখন, যা এখন ভালো করে মিস কর আমায়, বাঁদর ছেলে কোথাকার।

৪

যখন থেকে সায়ান পড়তে গেলো এ্যামেরিকা তখন থেকেই দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি চরম আকার ধারণ করেছে। ঝগড়া করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তিতলি। দুজনের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান আর সময়ের ব্যবধান তো আছেই তার সাথে আছে নিদারুণ মানসিক চাপ। চব্বিশ ঘণ্টা যার ভাবনায় সে বুঁদ হয়ে থাকে সারা পৃথিবী থেকে তাকে লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণা। সারাদিন মনে মনে যাকে ভেবে তার সময় কাটে, মুখে কখনো তার নাম উচ্চারণ না করতে পারার ব্যথা। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে লুকোচুরি খেলে কতো কষ্টে সায়ানের জন্য সময়টুকু সে জোগাড় করে রাখে তা সায়ান যেন আজকাল বুঝতেই পারে না। সায়ানের সবকিছুতেই দেরি হয় নইলে সে ব্যস্ত, সময় নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি তিতলিকে এড়িয়ে যাওয়ার বাহানা এগুলো তার। তবে কি বদলে যাচ্ছে তার সায়ান একটু একটু করে? আগে তো এতো ইনকনসিডারেট ছিল না, তিতলির সুবিধাই ছিল সায়ানের বড় চাওয়া, তিতলির সান্নিধ্যই ছিল তার বড় পাওয়া। কি করবে সে? সেই মিষ্টি সময়গুলোর কথা ভাবলেই তিতলির কান্না পায় আজকাল। কখন যে নিজের অজান্তে চোখ ভিজে ওঠে, সে বুঝতেই পারে না। যখন লোনা জল তার গাল বেয়ে ঠোঁট স্পর্শ করে তখন খেয়াল হয়, সে কাঁদছে। অস্থির লাগে আর নিজের চারপাশে আরো বেশি করে সায়ানকে হাতড়ে বেড়ায় সে।

এখন তো আর চাইলেই সায়ানকে হাতের কাছে পায় না যে রেগে গেলে দুই হাতে ওর ঝাঁকড়া চুল মুঠো করে ধরে ওর মাথা ঝাঁকিয়ে দিবে কিংবা কান মলে মলে লাল করে দিবে। সারাক্ষণ মনে মনে রেগে থাকে আর ভাবে, পাই তো তোকে একবার হাতের কাছে, খবর করে দিব বাঁদর ছেলে কোথাকার। আগে ঝগড়া হলেই সায়ানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো সে, নখ দিয়ে আঁচড়ে, পিঠে কিল মেরে সায়ানকে শুইয়ে ফেলতো। মুখে সায়ান লাগছে লাগছে বললেও আসলে মজা পেতো, হাসতো। এমনিতে তো তিতলিকে কাছে টানা যায় না, হাতটা ধরলেই ঝট করে ছাড়িয়ে নিবে, আমায় ধরবি না বলে। কিন্তু মারামারির সময় তার হুঁশ থাকতো না। এলোচুলের খোঁপা খুলে পড়ছে, কি গা থেকে ওড়না খসে পড়ছে, কিংবা সায়ানের মুখের কতো কাছে তিতলির মুখ তখন সেদিকে তার নজর নেই। মারামারিতে হাঁপাতে হাঁপাতে তিতলির বুকের দ্রুত ওঠানামা আর রাগে নাকের পাটা কাঁপানো দেখতে সায়ানের ভীষণ ভালো লাগতো। সে তখন আলতো করে তিতলিকে জড়িয়ে নিতো, ঠোঁট চেপে আদর দিয়ে রাগ কমিয়ে দিতো। আচমকা এ আদরে তিতলি লজ্জা পেয়ে তখনের মতো মারামারি থামিয়ে দিতো। সায়ান সারাবেলা সেই শান্ত তিতলির হাত নিজের মুঠোয় ধরে থাকতো। ঘেমে যেতো তিতলির হাত তার মুঠোর উত্তাপে কিন্তু তারপরও কখনো ছাড়িয়ে নিতো না।

পড়াশুনা, চাকরি আর নিজের রান্নাবান্নাসহ সমস্ত কাজের চাপে জেরবার সায়ানের কাছে মাঝে মাঝে তিতলির এই অবুঝপনা বেদনাদায়ক লাগে। সারাটাদিন কিসের মধ্যে দিয়ে ও যায় মেয়েটা কি একবারও বোঝার চেষ্টা করে! এই কি সেই তিতলি যে তার ঘুম খাওয়া নিয়ে অস্থির হয়ে যেতো? কি বদলে যাচ্ছে মেয়েটা। মেসেঞ্জারে আসতে দেরি হলে, মেইল করতে ভুলে গেলে কিংবা এসএমএস বা ফোনের সময় একটু এদিক সেদিক হলে বেহুঁশের মতো রাগারাগি করে, কেঁদে কেটে সীন করে ফেলবে। অনেক সময় ফোনের লাইন পাওয়া যায় না, সব কি সায়ানের ইচ্ছে আর হাতে থাকে? আজকাল আর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন বাতিক যোগ হয়েছে, সন্দেহ। সায়ানের কি কোনো বিদেশিনীর সাথে ভাব হয়েছে কি না এই এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সে ক্লান্ত। মেসেঞ্জারে কথা হলেই সেটা এক-না-একভাবে ঝগড়ায় যেয়ে পৌঁছাবে আর কথা না-হলে মনে হয় আজ দিনটা কাটছে না। খেয়ে শুয়ে বসে কিছুতেই সে শান্তি পায় না। চরম ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে তার জান। এতো মায়া হয় মেয়েটার জন্য তার। মেয়েটা দিনরাত তাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না, এই সত্যিটা জানে সে। বাইরে থেকে দেখাবে অনেক শক্ত, ভেতর ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে গেলেও মুখে কখনো স্বীকার করবে না, একা একা নিজে কষ্ট পাবে। কিন্তু তার কাছে তো তিতলির আর কিছু লুকানো নেই, সে তো জানে ওপরে যতো শক্ত ভাবই দেখাক, ভিতরটা পুরো হাওয়াই মিঠাই। তার স্পর্শ পাওয়া মাত্র গলে গলে পড়ে।

এ সমস্ত ঝগড়ার মূলে যে শুধুমাত্র তাকে হারিয়ে ফেলার ভয় কাজ করে সেটা আজকাল বেশ বুঝতে পারছে সায়ান। তিতলিকে তার ওপর, তিতলির নিজের ওপর আস্থা আর বিশ্বাস রাখতে হবে। এজন্য তিতলিকে তাকে হেল্প করতে হবে। মেয়েটাকে শক্ত করে তৈরি করতে হবে নইলে অসুস্থ হবে, পাগল হবে মেয়েটা তার জন্য। অনেকদিন ভেবে ভেবে একদিন ভাবল অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগে এটা বলা দরকার। সায়ান তিতলিকে ফোন দিল, আস্তে ধীরে তিতলির মুড বুঝে অনেক গল্প করলো। তিতলির মনের মেঘ যখন দূর হয়ে সে একটু স্বতঃস্ফূর্ত হলো, সহজভাবে ওর সাথে স্বভাবসুলভ চপলতায় কথা বলছিলো আর দুষ্টুমি করছিলো, সায়ানের পৃথিবী আবার দুলছিলো হারানো তিতলিকে কাছে পেয়ে। কিন্তু তাকে নরম হলে চলবে না। আস্তে আস্তে বললো সায়ান, শোন জান, তোর সাথে একটা কথা আছে, আর কথাটা তোকে মানতেই হবে। সায়ানের গলায় একটা কিছু ছিল যা তিতলিকে অকারণ ভয় পাইয়ে দিল। ভীত হরিণীর গলায় বললো সে, আগে বল কি কথা। হেসে ফেললো সায়ান ঐপারের ত্রস্ততা টের পেয়ে। বললো, তোর জান তোকে যাই বলুক তুই সেটা রাখতে পারবি না, আগেই জানতে হবে কি কথা?

তিতলি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। নিজেকে সামলে নিয়ে মনে শক্তি জোগাড় করে বললো, বল পারবো রাখতে। সায়ান গভীর গলায় বললো, আজ থেকে রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পঁচিশবার বলবি, এ পৃথিবীতে আমার হারানোর কিছুই নেই, বরং যে আমাকে হারাবে সে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লুজার। আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলবি এটা। হঠাৎ একি বলছে সায়ান। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে সে। দমকে ওঠা কান্নাটাকে সে গলায় আটকে নিলো, মরে যাবে কিন্তু সায়ানকে তার ভিতরের যন্ত্রনা টের পেতে দিবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, কিছুতেই না। যতোটা সম্ভব গলাটা পরিষ্কার করে বললো, এ কথা কেনো বলছিস, জান কি হয়েছে? সায়ান বললো হাসতে হাসতে, আমার কিছু হয়নি রে, রোজ রোজ তোকে যে ভূতে তাড়া করে বেড়ায়, এটা তার চিকিৎসা। ওতো শক্ত হসনি, একটু ইজি হ গাধি। তিতলি এবার আর সামলাতে পারলো না। সায়ানের তিরস্কার যদিও-বা সহ্য করতে পারে কিন্তু আদরে সে গলে যাবেই। সায়ানের ভালোবাসার উত্তাপে তিতলি মোম হয়ে গলে সারাবেলা। কেঁদে কেঁদে বলে, সে ভাবনা আমি সারা পৃথিবীর জন্য রাখতে পারবো কিন্তু তোকে ছাড়া তো আমি বাঁচবো না। তুই জানিস না এ পৃথিবীর কে আমায় পেল আর কে না তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না কিন্তু তোর সমস্ত কথা, ভাবনায় আমার সারা পৃথিবী দুলতে থাকে। সায়ান এবার শক্ত গলায় বললো, তা হবে না তিতলি সোনা, তোকে মনে জোর আনতে হবে, ভাবতে হবে, এ পৃথিবীতে নোবডি ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান ইউ, নেভার। ইউ আর এ জেম, আর এ জেম যে লুজ করবে, হি ইজ এ লুজার। ইভেন ইফ ইট ইজ মি দ্যান আই এ্যাম এ লুজার টু।

তিতলি বললো, আমি তো তোর কথা ভাবছি না, আমি ভাবছি আমার কথা। তোর ভাবনায় আমার দিনরাত যায়, আমার জীবন তো তোকে ঘিরে শুরু হয় তোর কাছেই এসে শেষ হয়। আমি বাঁচবো কি করে তোকে ছাড়া। আমার স্বপ্নেও তুই আমার বাস্তবেও তুই। বিষণ্ন গলায় সায়ান বললো, এরকম করলে তুই তো মরে যাবি সোনা। কাউকে এতো ভালোবাসতে আছে নিজেকে ছাড়া। নিজেকে শক্ত কর, আমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। পড়াশোনা শেষ করতে হবে, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বাবা-মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকেও তো দেখতে হবে। তিতলি নরম গলায় বললো, আমাকে কি করতে বলছিস? আমি কি তোর বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি। সায়ান হেসে ফেললো, দূর বোকা তাই বললাম বুঝি। বললাম, এতো টেন্স থেকে নিজেকে অতো কষ্ট দিস না সোনা। ভালো করে পড়াশোনা আর খাওয়া দাওয়া কর। যে হারাবে সে হারবে, তুই না। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ বোকা মেয়ে।

যখন সায়ানের সাথে কথা হয়, গলার শব্দ পায় তখন তিতলির মনের ভেতরে রঙিন প্রজাপতি নাচে। এক ধরনের সজীবতা কাজ করে, অনেক নরম থাকে সে, একদম কাদামাটি। তাতে যা আঁকতে চায় তাই আঁকা যায়। কিন্তু ফোনের লাইন কেটে যাওয়া মাত্রই মনে হয় হারিয়ে ফেললো সে আবার তাকে। ফোন ডিসকানেক্ট হওয়া মাত্রই আবার আস্তে আস্তে তিতলির কেমন যেন লাগতে শুরু করে। পৃথিবীটা উলটে পালটে যেতে শুরু করে। সবচাইতে প্রিয় মানুষটিকে প্রচণ্ড মিস করতে শুরু করে, হারিয়ে ফেলার ভয় তাড়া করে বেড়ায়। কথা হওয়ার পর ঘণ্টা দুই তিনেক মনটা ফুরফুরে থাকে। আবার শুরু হয় পরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারের অপেক্ষা। অসহ্য লম্বা সেই দুঃসহ প্রতীক্ষা। সায়ানকে ছুঁয়ে দিতে না-পারার এই অক্ষমতা, এই দূরত্বে তার মাথা গরম হতে শুরু করে, উলটা পালটা লজিক কাজ করে। ইনসিকিউরিটি আর বিরহ তাকে দিয়ে যা করতে চায় না তাই করিয়ে নেয়। সায়ানকে দুম করে উলটো পালটা একটা মেসেজ পাঠায় কিংবা মেইল করে। যা বলতে চায় তা বলতে পারে না, বলে ঠিক তার বিপরীতটা। আগে সায়ান এগুলোতে ভীষণ টেন্সড হয়ে যেতো কিন্তু আজকাল বেশ বুঝতে পারে। সে হাসে আর আদর করে আবার উলটো মেসেজ পাঠায়। ভালোবাসা যেখানে অসীম, ভুল বোঝাবুঝি আর রাগ তো সেখানে সামান্য সময়ের দমকা হাওয়া মাত্র। যতো দ্রুত ধেয়ে আসে তার চেয়ে দ্রুত উড়ে যায়।

৫

প্রবাস জীবনের ব্যস্ততায় আর তিতলির অবুঝপনায় ক্লান্ত হয়ে সায়ান আস্তে আস্তে তিতলির সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দিল। মেইল, ফোন সবকিছু সে নিজে কমিয়ে দিল, তিতলির ডাকে সাড়া দেয়াও কমিয়ে দিল। ওদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল, প্রতি ভোরে দুজন দুজনকে সুন্দর একটা দিনের শুভকামনা জানিয়ে উইশ করা, সেটা সায়ান বন্ধ করে দিল। শুধু যে তিতলির অবুঝপনা আর ঝগড়া এটার কারণ ঠিক তাও নয়। আজকাল সায়ান ভবিষ্যতের কথাও ভাবছিল। সামনের সুন্দর উজ্জ্বল ক্যারিয়ার আর ভবিষ্যৎ ফেলে সে সহসা দেশে ফিরতে চায় না। আর তিতলিও তার পরিবারের খুব ন্যাওটা। তাদের ছেড়ে সে এই দূরদেশে আসার কথা ভাবতে পারে না। তাহলে এ লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপের ভবিষ্যৎ কি? কি দরকার এ মূল্যবান সময় আর শক্তি বৃথা নষ্ট করে তার রাত জাগার? তারচেয়ে আশেপাশের স্বর্ণকেশীদের দিকে মন দিলে কেমন হয়, সে ভাবনাও তার মনে ভাসে। তাহলে কি, আউট অফ সাইট – আউট অফ মাইন্ড, ব্যাপারটাই আবারো সত্যি হতে যাচ্ছে? না, তাইবা কেন হবে? দেশে থাকতে কি সে অন্য মেয়েদের দিকে কখনো তাকাতো না কিংবা সুযোগে অন্য মেয়েদের সাথে ফ্লার্ট করতো না?

সায়ানের কোর্সমেট আছে একটি স্প্যানিশ বংশোদ্ভুত মেয়ে। মাঝারি গড়নের, বাদামি চুল আর চোখ, অসাধারণ দেখতে। মেয়েটি কখনো সখনো তার পাশে বসলে তার আজকাল অন্যরকম লাগতে থাকে। মন দিয়ে ক্লাশে লেকচার পর্যন্ত ফলো করতে পারে না। স্বর্ণকেশী কি টের পায় তার হৃদয়ের এই উত্তাপ? ক্লাশের বাইরেও আজকাল তার সাথে দেখা হয়, কথা হয়, ক্যাফেতে একসাথে কফি খেতে যায় ওরা। পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় বদলাতে থাকে দ্রুত, দুজনেই অনেকটা সময় একসাথে কাটায়। মেয়েটির বাংলাদেশী সংস্কৃতি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ আগ্রহ। আর অনেকটা আগ্রহ যে তাকে নিয়েও সায়ান তা বুঝতে পারে। এ আগ্রহ আজকাল তার মনেও রঙ ছড়াচ্ছে, সে সেটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। মনে মনে কিছু নির্দয় পরিকল্পনা করছে সে এই স্বর্ণকেশীকে ঘিরে। এমনিতে তিতলির মায়া কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। দিনরাত সে তিতলিতে অভ্যস্ত। মেইলে তিতলি, মোবাইলে তিতলি, ফোনে তিতলি। তিতলির মায়া তার চিরচেনা। তিতলির চুলের গন্ধ, ঠোঁটের স্বাদ, গলার ঘামের লবণাক্ততা তার অতি পরিচিত। কিন্তু এই স্বর্ণকেশীর মায়া দিয়ে তিতলির মায়াকে রিপ্লেস করতে সে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছে দিন দিন। দরকার কি তিতলির এতো ন্যাগ সহ্য করার। বাঙালি মেয়েগুলোতে যেমন মেয়েলিপনা ভর্তি তেমনি ন্যাগিং। তার এতো সময় নেই, জীবনে অনেক দূরে যেতে হবে।

মাঝখানে কিসের যেনো বন্ধ ছিল, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লং উইকএন্ডে সে আর স্বর্ণকেশী পাশের শহর থেকে ঘুরে এলো। একসাথে মাছ ধরলো লেকের পাড়ে বসে, সে মাছ ক্লীন করে সস দিয়ে মেরিনেটেড করে রেখে বারবিকিউ করে খেলো দুজনে। স্প্যানিশদের সাথে বাঙালিদের অনেক মিল। এরাও বেশ ভাত খায়, দুবেলা খায় আর সমুদ্রের পারের মানুষ বলে মাছ ওরাও খুব ভালোবাসে। যতোই দিন যাচ্ছে সায়ানকে ততোই স্বর্ণকেশীর সাথে তার জীবনযাত্রার মিল আবিষ্কারের নেশায় পেয়ে বসেছে। সায়ান নিজেও আজকাল অবাক হচ্ছে নিজের কর্মকাণ্ডে। নিজের আত্মবিশ্বাস তাকেই মুগ্ধ করে দিচ্ছে। যতোটা কষ্ট হবে ভেবেছিল তিতলি আসক্তি কাটাতে তার কিছুমাত্রই হয়নি। বরং দিনরাত যেন তার উড়ে চলছে। স্বর্ণকেশী তাকে অন্য জগতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে। আর এই ছুড়ে ফেলাতে সায়ান আনন্দের সাথে নিজেকে সমর্পণ করছে। শেষ বিকেলে নরম হয়ে আসা কমলা আলোর আভায় সে যখন বারবিকিউড ফিশ আর রেড ওয়াইন নিয়ে লেকের পাড়ে বসে পানির ওপর নাম না জানা সুন্দর সমস্ত পাখির উড়াউড়ি দেখছিলো তখন তার সেলে তিতলির ফোন এলো। ইশারায় স্বর্ণকেশীকে সে বললো, 'হোম'। হ্যালো বলতেই ঐপার থেকে তিতলির গলা। কি বিষণ্নতা মাখানো ছিল তিতলির গলাটায়। আগেরদিন হলে সায়ান ভেঙে যেতো সমুদ্রের ঢেউ হয়ে তিতলির তটে। সেদিন গলা শুনে এক মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছিলো সে।

সায়ানের এই এড়িয়ে যাওয়া তিতলি আজকাল বেশ টের পায়। সেই আকুলতা আর নেই, খুব দায়সারা ভাবে সারাদিন পর হয়তো তার অনেক কয়টা ম্যাসেজের জবাবে এক লাইন লিখবে, তুই খেয়েছিস কিংবা ব্যস্ত আছি, তুই কেমন আছিস টাইপ কিছু। সারাদিন ধরে মেসেজ চেক করে করে সে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন এমন দায়সারা কিছু তার অভিমানকে আরো উস্কে দেয়। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার কাছে কাঁদবে। সবচেয়ে আপনজন যখন অচেনা আচরণ করে তখন কার কাছে নালিশ করতে হয় তিতলির তো তা জানা নেই। তার সমস্ত অনুযোগ আর অভিযোগের ঠিকানাই তো ছিল সায়ান। তিতলি কোথায় যেনো পড়েছিল, ছেলেরা প্লেটোনিক লাভ ধরে রাখতে পারে না, তাদের জন্য চাই রক্তমাংসের কিছু। সায়ানের এই অবহেলা তীব্র হয়ে তাকে বেঁধে। নিরুপায় হয়ে নিজেকে সে শাস্তি দেয়। খায় না ঠিক করে, পড়াশোনায় মনোযোগ নেই, অকারণে বন্ধুদের সাথে কিংবা কখনো মায়ের সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে থাকে। বই ছিঁড়ে ফেলে, প্রিয় গানের সিডি ভেঙে ফেলে কিংবা বারান্দার টবে তার নিজের হাতে লাগানো প্রিয় জুঁই, বেলিকে ছিঁড়ে তার রাগ কমায়। তার এই কষ্ট এই যন্ত্রণা কিছুই কি সাগর পার করে ঐপারে পৌঁছায় না? না জানে না তিতলি পৌঁছায় কি না। মনে হয় পৌঁছে না, তাহলে কি কেউ এতো নির্দয় হতে পারতো তার প্রতি?

ছোটবেলায় অবুঝ হয়ে সে যে নির্দোষ দুষ্টুমি করেছে তার শাস্তি কি তাকে এখন ভগবান দিচ্ছেন? খেলতে যেয়ে পিঁপড়ের ডিম ভেঙেছে, কিংবা পাখির বাসা নষ্ট করেছে, তার প্রতিশোধ নিচ্ছে কি খোদা? সায়ানকেও কেন যেন আজকাল তার গডের সমার্থক মনে হয়, তার নির্ভেজাল অভিমান কিংবা অর্থহীন দুষ্টুমি করে বলে কথাগুলোকে সে ইলাস্টিকের মতো টেনে টেনে তা থেকে নানা রূপ বের করে যেভাবে তাকে বকে কিংবা ঝগড়া শুরু করে আর দিনের পর দিন তার সাথে কথা না বলে, তার চিঠির জবাব না দিয়ে তাকে শাস্তি দেয় তাতে অনেক কষ্টের সাথে হাসিও পায় তিতলির। সায়ানও খোদা হয়ে গেছে, সমস্ত ভুল আর অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিতে ভালোবাসে সে তিতলিকে। অথচ দুজনেরই প্রেম দেয়ার কথা, ভালোবাসা দেয়ার কথা। অনেক কিছুতেই সে টের পায় সায়ান দ্রুত তার সাথে অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তার দোষ ত্রুটিগুলো বড্ড বেশি চোখে পড়ছে সায়ানের। এতে সে আজকাল কুঁকড়ে যায়, আগের মতো তেড়ে উঠতে পারে না কেনো যেনো। তার সমস্ত অবুঝপনা নাক কামড়ে আদর করে দিয়ে ইগনোর কিংবা এনজয় করে যাওয়া সায়ান কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সায়ান এখন আর তিতলির অভিমান ভাঙানোর খেলায় মাতে না।

আস্তে আস্তে তিতলি চিঠি লেখা কমানোর চেষ্টা করছে। ঐপার থেকে কোনো জবাব না-পেয়ে হতাশায় তার দিনরাত ডুবে যাচ্ছে। অথচ সারা দিনরাত কতো কথাই-না জানাতে ইচ্ছে করে। সেদিন নীলক্ষেতে বই কিনতে গিয়ে একা একা বৃষ্টিতে ভিজে সে চুপসে গেলো, বৃষ্টি থামছে না, তাকে দাঁড়াতেই হলো এক দোকানের সামনে। পাশ থেকে দুটো ছেলে কি লোভী চোখেই না তার ভেজা শরীরের দিকে তাকাচ্ছিলো। সে সময় সে সায়ানের তার পাশে না-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকাটা কতো মিস করছিলো সে, সেটা জানাতে ইচ্ছে করে। নতুন আমড়া উঠেছে বাজারে, লবণ মরিচ দিয়ে আমড়া খাওয়ার সময়, দুজনের ভাগাভাগি করে একটা আমড়া খাওয়ার সেদিনগুলোর জন্য তার চোখে পানি আসে সেটা জানাতে ইচ্ছে করে। মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করতে গেলো, ছুরিতে পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে বুড়ো আঙুলটা এই এতোখানি কেটে গেল সেদিন। কি রক্তটাই না পড়লো। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিলো না, চোখে অন্ধকার দেখছিলো সে, কিন্তু সে অন্ধকারের মধ্যেও তার অবাধ্য দুচোখ সায়ানকে খুঁজছিলো সেটা জানাতে ইচ্ছে করে। মহাদেব সাহা আর হেলাল হাফিজের কবিতার বইদুটো নতুন কিনেছে সে, রেখে দিয়েছে একসাথে পড়বে বলে, সেটা আজ আর তিতলি কেমন করে সায়ানকে জানাবে? দোষ তিতলিরও অনেক সেটা নিজেও জানে। এমনিতে ফটফট আগডুম বাগডুম অনেক কথা বললেও, লজ্জা ভেঙে যে কথাটা সে সায়ানকে জানাতে চায়, তার মনের কথাটা সে কখনোই মুখে আনতে পারে না। বরং উল্টোটাই বলে সবসময়। এতোদিন আশা ছিল, সায়ান বুঝে নিবে তার না বলা কথাগুলো কিন্তু আজ জানে বুঝে নেয়ার সময় কারো আর নেই।

তিতলি আজকাল চিঠি লিখে বটে কিন্তু পাঠায় সে নিজেকে। এটাও একটা খেলা, সায়ান তো আসলে তার নিজেরই একটা অংশ, সে মানুক আর না মানুক তার মন জানে। তাই 'টু'তে তিতলি নিজের এ্যাড্রেস দেয়। তবে কি সে একটু একটু পাগল হয়ে যাচ্ছে? তাই-বা হবে কি করে? এ পৃথিবীতে আসলে কেউ তো কিছু অন্যের জন্যে করে না। সবাই সব করে নিজের জন্যে। এই যে তিতলি ভাবে সে সায়ানকে ভালোবাসে, আসলে সে নিজেকে ভালোবাসে। সায়ানকে না-পেলে তিতলির কষ্ট হয় তাই তো সে বার বার সায়ানের কাছে ফিরে ফিরে যায়। নিজের কষ্টে আকুল হয়ে কাঁদে। সায়ানের জন্য যে তা না সেটা বোকা তিতলিও জানে। সে ফিরে ফিরে সায়ানকে খোঁজে তার নিজের জন্যে। তিতলি সায়ানকে ছাড়া বেঁচে থাকা জানে না, সায়ানের ওপর তার বড্ডো মায়া পড়ে গেছে। আদতে যদি পুরো ব্যাপারটা তিতলি ভালো করে ভাবে, তাতে 'সায়ান' কোথাও নেই। পুরোটাই তিতলির ভালো লাগা, তার বেঁচে থাকা, তার কষ্ট, তার যন্ত্রণা, নিজেকে রক্ষা করা। নিজেকে ভালো রাখবার প্রেষণাই তিতলিকে সায়ানের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তবে সায়ানের দেয়া কষ্ট থেকে তিতলি একটা জিনিস শিখে নিয়েছে, কষ্ট হলে লোকে কষ্ট পায় কিন্তু মরে যায় না। আগে তিতলি ভাবতো সায়ান পাশে না-থাকলে সে মরে যাবে কিন্তু আজকাল দিব্যি দেখলো, সে এক রকম বেঁচেই আছে যদিও মরে যাওয়াটাই হয়তো বেটার সল্যুশন ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

'If you love something, set it free; if it comes backs it's yours, if it doesn't, it never was.' রিচার্ড বাক'এর এই উক্তিটিকে মন্ত্র করে তিতলি সারাক্ষণ মনে মনে আউড়াতে থাকে। নিজেকে শক্তি দিতে চেষ্টা করে। দশ বারের মধ্যে আট বার সে হেরে যায় নিজের কাছে আবার দুবার জিতেও যায়। সে অপেক্ষা করে থাকবে সায়ানের ফিরে আসার। সায়ান তো তার নিজের অংশ, পথ ভুলে যায় না লোকে? সায়ান পথ হারিয়ে ফেলেছে, পথ খুঁজে ফিরে এসে তার সায়ান তাকে খুঁজবে তিতলি জানে। তিতলি তার সমস্ত দরজা, জানালা, ঘুলঘুলি খুলে দিয়ে সায়ানের ফেরার অপেক্ষায় রইলো। কতদিন করবে অপেক্ষা? দশ বছর? বিশ বছর? পুরো জন্ম কিংবা জন্মান্তর? কিন্তু তাকে যে অপেক্ষা করতেই হবে। কোনো একদিন সায়ান যখন খুব ক্লান্ত হবে তিতলির কথা তার নিশ্চয়ই মনে পড়বে। তখন তিতলির দরজায় এসে যেনো দরজা বন্ধ না-পায় তার জন্যে সব খুলে রাখবে সে। ক্লান্ত সায়ানের মুখ মুছিয়ে দিবে নিজের ওড়না দিয়ে, চুলে হাত বুলিয়ে দিবে। মগ ভর্তি গরম কফি নিয়ে দুজনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না দেখবে আর সায়ানের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রিয় কবিতার প্রিয় লাইনগুলো গুন গুন করবে। হাত নেড়ে নেড়ে অনেক গল্প করবে সেদিন তিতলি সায়ানের সাথে, অর্থহীন সব গল্প, যার আসলে কোনো মানেই নেই। সায়ানের ভালো-না-লাগলেও সেসব শুনতে হবে। ওর কোনো চয়েস থাকবে না তখন তিতলির কাছে। এটাই হবে তার শাস্তি। চুপ কর, বক বক শুনে মাথা ব্যথা করছে বললেও তিতলি থামবে না। কাতুকুতু দিয়ে আরো খোঁচাবে সে সায়ানকে। সে অপেক্ষা করে আর স্বপ্নের জাল বুনে যায়, সায়ানের ফিরে আসা বা না-আসা হলো তার নিয়তি। আবার এটাও ভাবে তার কাছেই সায়ানের ফিরে আসাটা বড় কথা নয়। সায়ান যেখানেই থাকুক, যার কাছে থাকুক আনন্দে থাকুক আর ভালো থাকুক সেটা বড় কথা। সে শুধু তো সায়ানের সুখ চায়।

শেষের দিকে যখন কথা হতো, সায়ান তিতলির দোষ ছাড়া আর কিছুই বলতো না। আপন মনেই হাসে তিতলি। তার চারপাশের সবাই তাকে এতদিন ধরে সহ্য করছে, ছোটখাটো সমস্যা হলেও সেটা কখনো তার সাথে লোকে থাকতে পারবে না, সে পর্যায়ের নয়। কিন্তু যে তার একান্ত আপন, তার সবচেয়ে ভালোবাসার লোক পৃথিবীতে তার স্বভাব মেনে নিতে পারলো না। হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে তিতলি সায়ানকে ম্যাসেঞ্জারে গ্রীন দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না।

জিজ্ঞেস করে ফেললো, আমাকে কোন দোষে তুই ছেড়ে গেলি যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার বলতি!

সায়ান তার স্বভাবসুলভ ইগো নিয়ে বললো, তোর কোনো কিছুই আমার মনের মতো নারে। তুই কখনো ইনফ্যাক্ট আমার মনের মতো হতেও পারবি না।

কি লাভ? তাই... আসলে কি জানিস তুই কখনো আমার মনের মতো ছিলিও না।

তুই ছিলি আমার মনের এক সময়ের ঘোর লাগা বিভ্রান্তি মাত্র।

আপন মনে হাসে তিতলি, তার মন মজেছে অন্য জায়গায় কিন্তু সে দূরে গেল তিতলির দোষ দেখিয়ে। কেন সায়ান তাকে বলতে পারলো না, তার অন্য কাউকে চাই এখন? এটুকু সৎ সাহস দেখালে সে তিতলির কাছে ছোট হতো না। তিতলি কি টের পাচ্ছে না আসলে সায়ানের পৃথিবী কেনো দুলছে? সেদিনও দেখলো ফেসবুকে সায়ান অনেক ছবি আপলোড করেছে তার ডিপার্টমেন্ট এর আউটিং এর। এক ছবিতে মেরুন রঙের টপস পরা এক স্বর্ণকেশীর খুব কাছে সায়ান দাঁড়ানো, দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। সায়ানের এ হাসি যে তিতলির চিরচেনা। আগে এ হাসি শুধুমাত্র তার জন্যে হাসতো সায়ান। তিতলি অনুভব করতে পারে, অনেক দূর থেকে এতো কঠিন হওয়া আসলে সোজা। দুজন মানুষ যখন কাছে থাকে, একজনের দৃষ্টি অন্যজনকে ছুঁয়ে যায়, একজনের স্পর্শ আর অন্যজনের হৃদয় ভিজিয়ে দেয়। ঠোঁট ঠোঁটকে আবেশে চেপে ধরে তখন এতো কঠিন হওয়া যায় না একজনের প্রতি। তিতলিকে চাবুক দিয়ে কেউ আঘাত করলেও হয়তো সে এতোটা কষ্ট পেতো না। চোখের জল মুছে সে প্রতিজ্ঞা করলো, কারো মনের মতো হওয়ার চেষ্টা সে করবে না আর, যথেষ্ট করেছে। বরং যে তাকে পেতে চাইবে, তাকেই তিতলির মনের মতো হতে হবে। দুঃখকে সে আস্তে আস্তে শক্তিতে বদলে দিবে। একদিন অবাক হয়ে তিতলি লক্ষ্য করলো, সায়ানের মেসেঞ্জার-ফেসবুক যেসব জায়গায় তিতলির অবাধ বিচরণ ছিল, সায়ান তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে অবলীলায়। সে হতবাক হয়ে গেলো সায়ানের এই ক্ষুদ্রতায়, সে সায়ানের জান হয়তো নয় আর কিন্তু বন্ধুও কি নয়? আর দশটা সাধারণ বন্ধুর মতো সে কি সায়ান কেমন আছে এটুকু জানতে পারে না? সে অধিকারও কেড়ে নিতে হলো তার কাছ থেকে? কিন্তু পরে সে সায়ানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগলো এজন্যে। অতীতকে মুছে সামনে যাওয়া এখন তিতলির জন্যেও সহজ হবে। যদিও জানে তিতলি তার চুলের গন্ধ পেলে, তার চোখের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেলে, তার আঙুল সায়ানের ঠোঁট ছুঁয়ে দিলে এতো তাড়াতাড়ি সায়ান তাকে মুছতে পারতো না সবকিছু থেকে। তবুও তিতলি নিজেকে টেনে তুললো হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির ভঙ্গুর স্তূপ থেকে। ফিরে দাঁড়ালো কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে আজ থেকে গানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনায়, ছবি আঁকায় আর পড়াশোনায় নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিবে সে। হাঁটবে একা, বাঁচবে একা, হারিয়ে যাবে না কিছুতেই।

৭

একাগ্রচিত্তে তিতলি ডুবে গেলো নিজের মধ্যে। লাস্ট সেমিস্টারে নিজের রেজাল্ট দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলো। রেজাল্ট ভালো হওয়াতে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে গেলো। মন্দ লাগে না পড়াশোনা করতে বরং বেশ ভালো সময় কেটে যায় তার পড়ার মধ্যে ডুবে থেকে। মাঝে মাঝে এক মনে ইজেলে তুলি ঘষতে থাকে। নানা রঙ এক সাথে মিলিয়ে নিজে একটা আলাদা রঙ তৈরি করে। কল্পনা তার সীমাহীন বিস্তৃত। একদিন ভাবল আকাশটাকে লেমন ইয়েলো করে দিলে কেমন হয়? আকাশকে সবসময় আকাশি রঙের হতে হবে কেন? লেমন ইয়েলো আকাশ একে তার নিচে পিঠ ভর্তি খোলা চুলের ম্যাজেন্টা শাড়ি পরা এক মেয়ে আঁকলো। বড় বড় চোখের কাজল পরা সেই মেয়ে হাতে হালকা বেগুনী রঙের ছাতা ধরে রেখে ছাই রঙা বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। নিজের সৃষ্টির প্রতি নিজেই অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো। আর কি করবে? মোবাইল নিয়ে মুখে খই ফুটিয়ে যা মনে আসে তা বকার মতো এখন আর তার কেউ নেই। কখন আকাশে মেঘ ভাসে, কখন রিমঝিম রিমঝিম ছন্দ তুলে বৃষ্টি উথলে কেঁদে পড়ে মাটির খরতাপ শুষে নিয়ে যায় তিতলি জানে না আজকাল আর সেসব। জানলেও এক মুহূর্তের জন্য তার উদাস হতেই মনের বলগা চেপে ধরে। না কারো কথা ভাববে না, দুর্বল হওয়া চলবে না তার আর। পিছনে আর তাকাবে না সে, শুধু নিরন্তর তার আজ সামনে তাকানো।

বন্ধুদের সাথে প্রচুর হই হই করতে লাগলো। সিনেমা, পিৎজা, লাইব্রেরি, পিকনিক, আড্ডা সবকিছুতেই যায় আজকাল তিতলি। বরং একা হতেই তার ভয় লাগে। প্রথমে অনেকদিনের অনভ্যাসের আড়ষ্টতা থাকলেও একসময় তার এই হৈহুল্লোড় ভালোও লাগতে লাগল। মনে হতে লাগলো জীবনটা কোথাও আটকে গেছিল তার। তারচেয়ে এই বাঁধনহীনতাই ভালো। একবারে হালকা লাগে নিজেকে। মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে আকাশে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে। শিকল কেটে গেছে সে আনন্দে বিভোর হতে চায়। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছিল ধীরে ধীরে। নিজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বাড়ছিল। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে তিতলির ভালো লাগছিল। কিন্তু ঠিক তার পরের মুহূর্তেই জীবনের সব চাইতে প্রিয় জিনিসটা হারিয়ে ফেলার কষ্টে সে কাতর হয়ে পড়ে। সব কিছু তার শূন্য আর ফাঁকা মনে হতে লাগে। রাতে বিছানায় এপাশ ওপাশ করে, ঘুম আসে না তার চোখে, তখন কেঁদে কেঁদে মনের ভারটা একটু কমিয়ে নেয়। সবকিছু কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলেই কখনো হারায়? তাহলে কেন রোজ তিতলি ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে মোবাইলটা চেক করে? জানে কোনো মেসেজ কেউ পাঠাবে না তারপরেও অভ্যাসবশত প্রথমেই মোবাইল চেক দিয়ে তার দিন শুরু হয়। শুধু অভ্যাসে করে সেটাও সত্যি নয়। মনে একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দিয়ে যায় রোজ ভোরে, হয়তো তার সায়ান তার কাছে ফিরে এসেছে। কিন্তু এসএমএস না দেখে আগের মতো বুক ভাঙা কষ্ট তার আজকাল আর হয় না। রুটিনে ডুবিয়ে দেয় সে নিজেকে। কখনো চোখটা নরম হয়ে এলে হাতের উলটো পিঠে চোখটা মুছে নেয় সে। ভালোবাসা ভুলবে কেনো সে? ভালোবাসা ভোলা বা মোছা কোনোটাই যায় না। ভুলে গেছি ভাব করা যায়।

একদিন রাতে সে অবাক হয়ে দেখল মেসেঞ্জারে সায়ান সবুজ নক্ষত্র হয়ে জ্বলে আছে। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। চুপচাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো প্রিয় সে নামটির দিকে। তারপর কোনো ক্ষুদ্রতাকে মনে স্থান না দিয়ে সায়ানকে নক করলো সে নিজে থেকেই। কিরে কেমন আছিস? শুরু হলো টুকটুক করে কথা। বেশির ভাগই সায়ানের খোঁজ নিল। কতোদিন বাদে জানতে পারছে কেমন ছিল সায়ান আর কেমন আছে এখন। কে বলবে এর মাঝে পাঁচ মাস কেটে গেছে। মনে হচ্ছিল কোনোদিন কোনো বিচ্ছেদ বুঝি দুজনের মাঝে ছিল না। সায়ানের দুঃখে তার চোখে পানি এসে গেলো। ফেসবুকে দেখা সেই স্বর্ণকেশীর সাথে সায়ানের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। স্বর্ণকেশী নিজেই সায়ানকে ছেড়ে চলে গেছে। সে সায়ানের মধ্যে নাকি তার স্বপ্নপুরুষকে খুঁজে পায়নি। বলেছে, ইট ইজ গোয়িং বাট নট থ্রিলিং ইনাফ টু লিভ উইথ ইউ। স্বর্ণকেশীর মতে সায়ান অনেক বেশি গৃহী, ঠিক সেরকম রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষ নয় যাকে সে খুঁজছে। ও আরো বেশি ম্যানলি, এম্বিশ্যাস আরো দুর্ধর্ষ কাউকে চায়। প্রত্যাখ্যানের কষ্টে সায়ান এখন বেশ মনমরা। মায়া লাগতে লাগলো তিতলির, বুকটা মুচড়ে উঠলো তার প্রিয় বন্ধুর কষ্টে। সে সায়ানকে চিয়ারআপ করতে চাইলো নানাভাবে। একজন প্রকৃত বন্ধুর মতো হাত ধরে রইল তার। ভালোবাসে সে তো মিথ্যে নয়।

আজকাল প্রায়ই ওদের দুজনের কথা হয়। টুকটুক দুই জানালায় দুজনের ভাবের আদান প্রদান চলতে থাকে। অস্বীকার করবে না তিতলি মনের কোথাও একটা জ্বলুনি আছে তার। প্রত্যাখ্যানের কষ্ট, অবজ্ঞার জ্বালা তাকে পোড়ায়। তার ভালোবাসাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে গেছিল এই পুরুষ, তার সেই একা থাকার কষ্ট, সেই নিঃসঙ্গতা, সেকি ভোলার? কিন্তু তিতলি নিজের কষ্টের ওপর ছাই চাপা দিয়ে রাখলো। কিছুতেই সায়ানের কাছে নিজেকে ছোট করবে না সে। বন্ধুর দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ হবে না, দুর্দিনেই তো লোকের বন্ধুর দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে বেশি। আজকাল সায়ান আবার আগের মতো তিতলিকে মেইল করতে লাগলো। পরীক্ষার রুটিন, রেজাল্ট, কি রান্না করলো নতুন সব জানাতে লাগলো। মেইল বক্সে সায়ানের নাম দেখলেই চোখ নরম হয়ে যায়। কতো দিন রাত ঘণ্টা প্রহর কেটেছে তার এই মেইল বক্সের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। দুটো লাইনের জন্যে কতো তড়পেছে তার ভিতরটুকু।

সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে অবাক তিতলি। সারাদিন যেনো তিতলির ভালো যায় সেই উইশ রেখে এসএমএস করেছে সায়ান তাকে। কতোদিন পর!! চোখ পানিতে এভাবে ভরে গেলো মেসেজটাই ঠিক করে পড়তে পারছিল না সে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল বার বার সবকিছু। আজকাল মেসেঞ্জারে কথা হলেও সায়ান অন্যরকম করে কথা বলে। ফোনেও আবেগে ভরা থাকে সায়ানের গলা। কিন্তু আজ যখন তিতলি সায়ান নামক ঘাতক ব্যাধির আক্রমণ থেকে প্রায় সেরে উঠেছে তখন তার মনের দরজায় আবার কেনো এই কড়া নাড়া? যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে একবার গেছে সে, কোন কিছুর বিনিময়েই আর একবার সে কষ্ট পেতে চায় না। তিতলি এখন কি করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলাশ ফুটেছে শিমুল ফুটেছে

খুব ভোরবেলায় কি এক অজানা কারণে আজ ঘুম ভেঙে গেলো অপালার। এমন কাকডাকা শিশির ভেজা ভোরে অপালার তো ঘুম ভাঙার কথা নয়। এমনিতে খুব ঘুম কাতুরে বলে অপালার নাম আছে বাড়িতে, একবার বিছানা পেলে আর ছাড়তে চায় না অপালা। তার মধ্যে শীতের সকালে বিছানার ওম ফেলে উঠে পড়া অপালার সাধ্যে নেই। পাখির গানের শব্দ, দূর থেকে ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ আর দিদুর তেলাওয়াতের সুর মিলে একটা নাম না জানা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয় ভোরে অপালার বাড়িতে। শুয়ে শুয়ে অপালা আড়মোড়া ভাঙছে আর এলোমেলো ভাবছে। দিদু খুবই পরহেজগার মানুষ, তার উপর দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে তো দিদু শুধু নামাজ কোরান নিয়েই থাকেন। তারপরও এই ফেব্রুয়ারি মাসে দিদুর কোরান পড়ার সুরটাতে যেনো অনেক বেশি বিষাদ মাখানো থাকে। নাকি অপালার মনের ভুল, এটা ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরলো অপালা। এমনিতে অপালারা সবাই সব সময়ই দিদুকে খুব সমীহ করে থাকে, বিশেষ করে দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে তো দিদুর যত্নের যেনো কোনো ত্রুটি না হয়, দিদু যেনো কোনো ব্যাপারে মনে কোনো কষ্ট না পান সেই দিকে বাড়িসুদ্ধ সবাই সজাগ থাকে। কখনও যেনো দিদু একা না থাকেন, শত ব্যস্ততার মাঝেও সেদিকে লক্ষ্য রাখে বাড়ির সবাই। দিদুর ঔষধ, খাবার সব আলাদা গুরুত্বের সাথে তদারক করা হয়। তারপরও ফেব্রুয়ারি মাস এলে বাড়িটা যেনো আরও সতর্ক থাকে, আরো বিষাদ মাখানো গম্ভীর চুপচাপ হয়ে যায়। দিদুর মুখে যেনো কষ্টের যন্ত্রণার অন্য একটা নীল ছাপ থাকে আর তাদের বাড়িসুদ্ধ সবার চেষ্টা থাকে সেই ছাপটাকে যতদূর সম্ভব হালকা করে দাদুকে সহজ রাখা।

পলাশ ফোটানো শিমুল ফোটানোর এই ফাল্গুনে বহু বছর আগে ঘটে গেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা যার রেশ এখনও রয়ে গেছে অপালাদের সারা বাড়ি জুড়ে, কিংবা হয়তো সারা দেশ জুড়ে। বহু বহু দিন আগে, অপালার বাবারও জন্মের আগের সে ঘটনা। কিন্তু সব সময়ই যখন কোনো দেশ কাঁপানো ঘটনা ঘটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনই কাকাদাদুর ঘটনাটা সব্বাই আবার আলোচনা করে বলে মনে হয় যেনো সেদিনকার ঘটনা। আর আমাদের দেশে তো দেশ কাঁপানো ঘটনা হরদম ঘটতেই থাকে। ভয়ঙ্কর সব ঘটনায় সারা দেশ কেঁপে ওঠে। শুধু জাতির বিবেক কেনো যেনো কাঁপে না। এ তখনকার কথা যখন ঢাকা এতো ব্যস্ত মহানগরী হয়ে ওঠেনি। এত্তবড় ঢাকা শহর তখন অনেক ফাঁকা ফাঁকা। তখন অপালার দাদু-দিদুর ছোট্ট সংসার, দাদু-দিদু আর বড় চাচ্চুকে নিয়ে। দাদু সারাদিন অফিস সেরে, ওভারটাইম করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আটটা কি নটা, দিদুকে সারাদিন বাড়িতে একা থাকতে হয় বড় চাচ্চুকে নিয়ে। খুব বেশি পরিচিত কেউ নেই দাদু-দিদুর ঢাকাতে, দিদুর খুব মন খারাপ থাকে তখন। দিদু একটু ভয়ও পায়, মাঝে মাঝেই নাকি বাড়ির কাছে দিনে দুপুরে শেয়াল ডেকে উঠত। সেই সময় দাদুর সদ্য পাস দেয়া ভাই এলেন শহরে বড় ভাইয়ের কাছে থাকতে, পড়তে। দিদু কাকাদাদুকে পেয়ে যেনো আকাশের চাঁদ পেলেন হাতে। দিদুর কাছে অনেক গল্প শুনেছে অপালা। সাহেবদের মতো নাকি কাকুদাদুর গায়ের রং ছিল আর এই লম্বা সুঠাম স্বাস্থ্যের যুবক ছিলেন কাকুদাদু। অপালারা ভাইবোনরা দিদুকে অনেক ক্ষ্যাপাতো এই সাহেবদের মতো রঙের উপমার জন্যে। আজও কেনো জানি রূপের সৌন্দর্য্যের উপমার জন্য সাহেবদেরকেই পরিমাপের একক হিসেবে দেখেন এদেশের অনেকেই। অথচ বৈষ্ণব কাব্যের রাধা থেকে শুরু করে বাসবদত্তার রূপের বর্ণনা এই ভাষাতেই হয়েছে। কোকড়া চুল আর মায়াভরা চোখের কাকাদাদু গান গেয়ে, আবৃত্তি করে হইচই-এ বাড়ি সবসময় মাতিয়ে রাখতেন। কাকুদাদু আর দিদু সমবয়সী বলে বেশ বন্ধুত্বও ছিল দুজনের মধ্যে। সব কিছু ঠিক যাচ্ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে কাকুদাদুর বাড়ি ফিরতে দেরি হতে লাগল। কাকুদাদু আর দাদুর মধ্যে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে রাত পর্যন্ত অনেক কথা হতো, দাদু খুব ভয় পেতেন, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে, শাসক শ্রেণীর মনোভাব নিয়ে তার চেয়ে বেশি ভয় ছিল তার প্রাণপ্রতিম ছোট ভাইকে নিয়ে। দিদু অতশত বুঝতে চাইতেন না, কাকুদাদুর ফিরতে দেরি হলে রাগ করতেন, কিন্তু কাকুদাদু হেসে বোঝাতেন, কি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি। তিনি বললেন দিদুকে বাংলাদেশের সবার মায়ের ভাষা, সবার নাড়ির ভাষা, দুঃখ-সুখ প্রকাশের সেই চিরপরিচিত ভাষা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রের কথা। শাসক সমাজ হঠাৎ করে চাপিয়ে দিলো যে সবাইকে এখন থেকে বাংলাতে নয়, উর্দুতে কথা বলতে হবে। মাতৃভাষার দাবি নিয়ে তাই আজ ছাত্র সমাজ মাঠে নেমেছে, প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে সারা দেশের মানুষ, মিছিল মিটিং প্রতিবাদ চলছে সারা দেশ জুড়ে আর তার কেন্দ্র হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় তথা ছাত্রসমাজ।

মায়ের ভাষা কেড়ে নেয়া, বিদেশী ভাষায় সবাইকে কথা বলতে হুকুম দেয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রে উত্তাল তখন সারা দেশ। দাদু চাইছেন না কিছুতেই কাকুদাদু তখন বাড়ির বাইরে বেশি বের হন, কখন কোথায় কি ঘটে সেই দুশ্চিন্তায় অস্থির থাকেন দাদু সারাক্ষণ। সেদিনের কথা কি করে ভুলবে দিদু-দাদু বা অপালার বাড়ির কেউ কখনও? সবার কাছ থেকে অজস্র বার শুনতে শুনতে অপালা যেনো সেদিনটিকে নিজের কল্পনার মানসচোখে স্পষ্ট দেখতে পায়। ঝকঝকে রৌদ্রোজ্জ্বল সোনালি সকাল চারদিকে সোনাঝরা রোদ দিয়ে এ ধরণীকে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে। রাস্তার চারপাশ লাল হয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার আভায়। যেনো আগুন লেগেছে এ শহরে। একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় করে অফিসে গেলেন দাদু। দিদুকে বলে গেলেন কাকুদাদুকে গল্পের ছলে হোক আর যে করেই হোক যতটা বেশি সম্ভব ঘরে আটকে রাখতে, শহরের অবস্থা ভালো না, কখন কি হয়। কিন্তু দিদু তখন মহাব্যস্ত সদ্য জন্মানো মেজ চাচ্চুকে নিয়ে, সাথে নিত্যদিনের ঘরকন্নার রান্নাবান্না কাজকর্ম তো আছেই। কোন ফাঁকে কাকুদাদু বেরিয়ে গেলেন দিদু খেয়াল করতে পারলেন না। সারাদিন কাকুদাদুর কোনো খোঁজ নেই, দিদু অস্থির। দাদু ফিরলেন অফিস থেকে একরাশ টেনশন মাথায় নিয়ে, দাদু শুনে এসেছিলেন মিছিলে গুলি চলেছে, ছাত্রসহ বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছেন। বাড়ি ফিরে যখন শুনলেন কাকুদাদু সেই সক্কালে বেড়িয়েছে আর এখন অব্দি ফেরেননি তখন সাথে সাথে ছুটলেন আবার বাইরে, খোঁজ আর খোঁজ করে পেলেন প্রাণপ্রিয় ভাইয়ের মৃতদেহের খোঁজ। নিমেষে দাদুর পৃথিবী চুরচুর হয়ে ঝরে গেলো। দিদু হতবাক, সকালে যে তরতাজা হাসিখুশী উচ্ছল প্রাণটি ছটফট করে কথা বলল সে আর কোনোদিনও কথা বলবে না একি ভাবা যায়? দিদু তার ছোট ভাইয়ের মতো বন্ধুসম সাথী হারিয়ে পাথর। দাদু নির্বাক। কি জবাব দেবেন তার বাবা-মা কে? কিভাবে বলবেন মা তোমাকে 'মা' বলে ডাকবার দাবি নিয়ে মাঠে নামায় তোমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে হায়েনারা? শোকে সারা দেশ মূহ্যমান, পাথর।

গর্জে উঠল সারাদেশ পাকিস্তানি শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মানি না, মানব না শ্লোগানে। সেই সব মিছিল, মিটিং, আলোচনা আর পোস্টারে উত্তাল ঢাকাকে পাকিস্তানি শাসকরা রক্তাক্ত করল গুলি দিয়ে, মারা গেলেন সালাম, রফিক, বরকত সহ আরো অনেক নাম না জানা শিক্ষার্থী এবং সাধারণ লোক। কিন্তু আন্দোলন থামল না বন্দুকের ভয়ে। লেখা হোল অমর একুশে সঙ্গীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' আন্দোলনের মাধ্যমে ছিনিয়ে নিল বাংলার মানুষ তার জন্মের পরে প্রথম বোলের দাবি, মা বলার দাবি, মাতৃভাষা বাংলার দাবি। রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলো। সব আবার আগের মতোই সচল হলো, রাষ্ট্র ভাষাও বাংলা হলো কিন্তু শুধু আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপালাদের বাড়িটা আগের মতো হাসিগানে উচ্ছল হয়ে উঠল না কখনও। পাথর প্রতিমার মতো হয়ে গেলেন দিদু, নিজেকে দোষী ভাবতে লাগলেন অনেকটা কাকুদাদুর মৃত্যুর জন্য। হাজারোবার ভেবেছেন আর আক্ষেপ করেছেন দিদু যদি কাকুদাদুকে ঘরে ধরে রাখতেন সেদিন তবে হয়তো অকালে এভাবে দাদু ঝরে যেতেন না। অপালা জেনেছে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছে এই পৃথিবীতে তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়েছে জাতিসংঘ। ইউনিভার্সিটির পাশে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে শহীদ মিনার, ছাত্রদের রক্ত দিয়ে লাল হওয়া জায়গায় বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজোর প্রতিবাদের প্রতীক। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অপালা যখন শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে যায় তখন দুঃখের সাথে গর্বেও অপালার বুক ভরে ওঠে কাকুদাদুর কথা ভেবে।

সবাই বলে ভাষা আন্দোলন ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ, স্বাধীনতার প্রথম সূচনা। ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই অর্জিত হয়েছে আজকের স্বাধীনতা। একের পর এক পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ, আন্দোলনের পথ বেয়ে শুরু হয় অভ্যুত্থান আর তারপর মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু ভাবে অপালা এই কি সেই গর্ব ভরা অর্জন আমাদের, যার গল্প দিনরাত শোনে অপালা দিদু, বাবা-মা, কাকু-ফুপু সবার কাছে? আজকে বাড়ির বাইরে বেরোতে হলে সব্বাই মানা করে অপালা একা যেও না, বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত সবাই ভাবতে থাকে ঠিকমতো ফিরে আসবে তো? দিদুর বা মায়ের বড় কোনো অসুখ হলে সব্বাই ভাবতে থাকে দেশে সুচিকিৎসা হবে তো? নাকি পাশের দেশের শরণাপন্ন হতে হবে? আর দেশের চিকিৎসার ব্যয়ভার নিতে পারবে তো অপালার বাবা? দেশ তো স্বাধীন হয়েই গেছে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, শত্রুরা তো সব চলে গেছে তাহলে কেনো সারাক্ষণ এভাবে ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা? কাকে ভয়, কিসের ভয়? সন্ত্রাসের ভয়, চাঁদাবাজদের ভয়, পুলিশের ভয়, র‍্যাবের ভয়, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ভয়, অসুস্থ হলে সুচিকিৎসার ভয়, পাশ করলে চাকরি পাওয়া যাবে কিনা সেই ভয়। স্বাধীন দেশে কেন সর্বক্ষণ সব্বাইকে এভাবে মরার মতো বেঁচে থাকতে হবে? এইবার এইচএসসি পাশ করল অপালা যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট নিয়েই কিন্তু ভর্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই। একটি মাত্র সরকারি ইউনিভার্সিটি ঢাকাতে আর তাতেও থাকে রেজাল্ট আর মেধা ছাড়া অনেক ব্যাকিং-এর ব্যাপার। অপালার বাবা সাধারণ ছোট চাকুরি করেন তার পক্ষে মেয়েকে ব্যকিং দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করানো সম্ভব নয় যেমন সম্ভব নয় এতো পয়সা দিয়ে প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ানো। কি করবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপালা? ভেবে ভেবে অপালা রাতে ঘুমাতে পারে না, পাশবালিশটাকে জড়িয়ে ভাবছে এ কেমন স্বাধীনতা আনলো অপালার পূর্বপুরুষরা, যাতে কোনো কিছুর নিশ্চয়তা নেই। জনসংখ্যা বেড়ে চলছে অবিরত কিন্তু তাদের জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, স্বাধীনভাবে কথা বলার বা ভাবার সুযোগ। স্বাধীনতার মানে কি তাহলে মরে মরে বেঁচে থাকা নাকি, আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর জন্যে? জানে না অপালা।

কি মূল্য দিচ্ছি আমরা আমাদের স্বাধীনতার? পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা পূর্ব পাকিস্তানের টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানে মিল কারখানা গড়ছেন, তারা এই বাংলার জনগণের সাথে প্রতারণা করছেন তারা বাংলার জনগণের দিকে তাকাননি কিন্তু আজকের পরিস্থিতি কি সেই পরিস্থিতি থেকে খুব আলাদা কিছু? তখন পাকিস্তানি শাসকরা ভাবেননি সাধারণ লোকজনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, কিন্তু আজকেই কি দেশীয় শাসকরা ভাবছেন আলাদা করে কিছু? আজকেও স্বাধীন দেশে সংবাদ ছাপার উপর থাকে নিষেধাজ্ঞা, বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রশাসন, ছাত্র শিক্ষক অবিরাম রাজনীতির শিকার, নতুন নতুন ধরনের আইন রক্ষা বাহিনী তৈরি করা জনগণকে শায়েস্তা করার জন্য করতে। দেশের পড়াশোনার মান নিয়ে সংশয়, চাকুরির অনিশ্চয়তা শিক্ষিত সমাজকে করে তুলেছে বিদেশমুখী। বাংলা এখন গরীবের ভাষা, যাদের সামর্থ্য নেই তারাই আজ বাধ্য মনে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি ও পড়াশোনার মান সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোর ব্যবসায়ের। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়া তারপর ক্রেডিট ট্রানসফার করে বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাওয়া এবং ভবিষ্যতে সেখানে কর্মজীবনের সুযোগ, অর্থের মাধ্যমে অর্জন করা সুনিশ্চিত জীবন। মাতৃভাষা, জন্মভূমি আজ কোথায় নয় অবহেলিত? বিদেশী সংস্কৃতির দাপটে হারিয়ে গেছে লালন, বাউল, নকশি কাঁথার মাঠ, পালা গান, কবি গান, আবদুল আলীম আর আব্বাসউদ্দিন। নিজেদের ঐতিহ্য আজ তোলা আছে বিশেষ বিশেষ দিনগুলোর জন্য। পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসে একবার করে সবাই নিজেরা নিজেদেরকে বাঙালি ভাবে এবং সেটা পোশাক, গানে, পান্তায় ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টাও করে। স্বাধীনতার অর্জন কি তাহলে এটুকুই? সেজে-গুজে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া আর বইমেলাতে একটু ঘোরাঘুরি এইই কি শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো? সমস্ত অর্জন আজ প্রথাসর্বস্ব হয়ে গেছে। টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান দেখানো, পত্রিকা গুলোর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, একটু ছুটির দিনের আমেজ নিয়ে এদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদিক ঘুরে বেড়ানো পরিবারের সাথে, একটু ভালোমন্দ খাওয়া এর মধ্যেই আটকে গেছে দিবসের মাহাত্ম্য।

ভেবে চলে অপালা শেষ বিন্দু পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবো পূর্বপুরুষদের এই অর্জন ধরে রাখতে, হারবো না কিছুতেই। বেলা অনেকটাই গড়িয়ে গেছে, সুর্য্যি মামা এখন আস্তে আস্তে মাথার উপর চড়ছেন, জানালা দিয়ে অনেকখানি আলো অপালার বিছানায় এসে পড়েছে আর শুয়ে থাকলে নির্ঘাত মায়ের হাতে বকুনি বাধা একথা মনে পড়তেই ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল অপালা। শুরু হলো অপালার জন্য আরেকটি সংগ্রামী নতুন দিন অনেক আশা আর চেষ্টা নিয়ে।

সফল হোক অপালার চেষ্টা, সাফল্য পাক অপালারা-এই শুভ কামনা জানাচ্ছি দেশ জুড়ে থাকা সমস্ত অপালাদের।

২১.০২.০৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখি আমার নীড়ের পাখি

সকালের আলো উঠি উঠি করছে। ভালো করে তখন কাকেরই ঘুম ভাঙেনি-সেই কাকভোরে পাখি নাস্তা সারছে। 'মা আর চাইড্ডা পান্তা থাকলে দে না খাই, জব্বর খিদা লাগছে আজ' পাখি বলল তার মাকে।

'এই ল, এই চাইড্ডা ভাতই আছে। তুই খা, আমি মাতবর বাড়িত যাইয়া বাসি পান্তা কিছু খাইয়া লমুনে, মাতবরের বউ এর কাছ থেকে চাইয়া লমুনে দুগগা', বলল, পাখির মা পাখিকে। 'তয় থাক মা, তুই ই খা, কে জানে এই সাত সকালে মাতবরের বউ-এর মেজাজ জানি কেমন থাকবো, তরে কিছু দিবো কি না দিবো। আইজ আবার ধান হিদ্ধ আছে, কিছু না খাইলে তুই আবার গতরে বল পাইবি না'। এই সাত সকালে ক'টা পান্তা মুখে দিয়েই ছুটবে ন/দশ বছরের পাখি আর তার মা কাজে। গ্রামের মাতবরের বাড়িতে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবদি খাটে পাখি আর তার মা। পাখির মা মাতবরের বাড়ির গৃহস্থালীর কাজ করে আর পাখি সবার ফুট ফরমাশ খাটে। বিনিময়ে দু-বেলা খেতে পায় তারা দুজন আর বছরের কাপড়ের সাথে মাস গেলে নগদ সামান্য ক'টা টাকা। এ ছাড়া কলাটা, মুলাটা মনিব গিন্নির মেজাজ ভালো থাকলে মাঝে মধ্যেই জোটে। আর সুযোগ বুঝে পাখিও বাড়িতে আসা যাওয়ার ফাঁকে কিছু সব্জি, ফল এদিক-ওদিক করে নিয়ে যায় সবার চোখ বাঁচিয়ে। এই টাকায় আর এদিক-সেদিক করে যা জোটে তাতে সংসার চলে বাকি সব সৎ ভাইবোন আর সৎ বাবাকে নিয়ে পাখির আর তার মায়ের। ন-দশ বছরের লিকলিকে পাখি এমনিতে বয়স আর বাঙালি মেয়েদের গড়নের তুলনায় বেশ লম্বা কিন্তু অভাবের কারণে স্বাস্থ্য আর শ্রী নেই। কিন্তু তার মাঝেও গড়ন-গাড়ন বেশ ভালো। জন্মের পর বাবা মারা যাওয়াতে পাখির মা আবার বিয়ে করেন। সেই ঘরে গোটা পাঁচেক ভাইবোন নিয়ে পাখিদের সংসার।

বাবা একসময় কাজ করে তো বাকি সারা সময়ই বেকার ঘুরে, সংসার নিয়ে তার মাথাব্যথার চেয়ে নিজের মান সম্মান নিয়ে তার বেশি দুশ্চিন্তা। কোন কাজ করলে মান-সম্মান হারানোর সম্ভাবনা আছে সে উপদেশ দিয়ে বেড়ায় পাখি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মাকে। সংসারের চাপ তাই পাখি আর তার মায়ের উপর।

মাতবরের বাড়িতে ধান এসেছে, সকাল সকাল যেতে হবে। ধান এসেছে এত্তো, এখন দেরি করলে মাতবর গিন্নি আর আস্ত রাখবে না। তাড়াতাড়ি ছুটল পাখি মাকে নিয়ে, ধান আসার বাড়তি ঝামেলা ছাড়াও হাজার কাজ থাকে মাতবরের সংসারে। এই কুটনো কুটো তো এই পিঠা বানাও, নয় এখুনি আচার মাখো তো এই মুড়ি ভাজো। মাতবরের বাড়ির শত কাজের ভিড়েও পাখির দুচোখ অনেক স্বপ্ন দেখতো। সব শেষে রাতে যখন পাখি একটু ঘুমানোর সময় পেতো তখন হয়তো নামত ঝমঝম বৃষ্টি, কিন্তু তখনও শত ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়া চালার দিকে চেয়ে পাখি অনেক স্বপ্ন বুনত নিজের জীবন আর সংসারের ছবি পালটে ফেলার। অনেক অনেক কাজ করবে সে, অনেক টাকা উপার্জন করবে যা দিয়ে সে পালটে ফেলবে জীবন নদীর গতিপথ। নিজেদের ছোট একটি ঘর থাকবে, যার চালা থাকবে নিশ্চিদ্র, বৃষ্টির পানি পড়ে এভাবে সবাইকে আর কাকভেজা হতে হবে না, গাই থাকবে, হাঁস-মুরগী থাকবে, নিজেদের ছোট সব্জি বাগান থাকবে, তাকে আর মাকে রোজ রোজ পরের বাড়ি দাসীগিরি করতে ছুটতে হবে না, এগুলো দেখাশোনা করেই আরামে আহ্লাদে কেটে যাবে বাকি জীবন। মাতবরের বাড়ির উঠতে বসতে লাঞ্ছনার জীবন আর সে মেনে নিতে পারছে না। আধপেটা খেয়ে না খেয়ে পাখিকে কাপড় ধোয়া, থাল বাসন মাজা-কি না করতে হয় সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি। আর মাকে তো ধান, ধান সিদ্ধ, ঘর সবই করতে হয়। তার উপরে থাকে মাতবর গিন্নি ও তার ছেলে-মেয়েদের গালমন্দসহ নানা অত্যাচার। কিন্তু এভাবে আর নয়।

সবসময় পাখি ভাবতো আর সুযোগ খুঁজতো কি করে একটু সামনে এগোনো যায়। গ্রামের একে তাকে জিজ্ঞেস করতো কোথায় হাতের কাজ শেখা যাবে? কোথায় শ্রমিক কল আছে যেখানে কাজ পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই পাখির এই বড় হওয়ার বাসনাকে নিয়ে মজা করতো। তাছাড়া বরিশালের এই অজপাড়াগ্রামে বসে একটি অভাবী, অশিক্ষিত মেয়ের পক্ষে আত্মউন্নতির কোনো দিক খুঁজে পাওয়া কলম্বাসের আমেরিকা খুঁজে পাওয়ার চেয়ে অনেক দুরূহ কাজ। কিন্তু 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়'–আর পাখিরও তাই হলো। হঠাৎ একদিন পাখির ঢাকা শহরে চাকুরি করা খালা তিন বছর পর ছুটিতে বরিশালে নিজের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এলো চকচকে কাপড় জুতো পরে। খালাকে দেখতে অনেকটা মাতবর বাড়ির বউদের মতো লাগছে। খালার চেহারাতেও বেশ চেকনাই খেলা করছে আর কথায় কেমন যেনো বিদেশী টান, যা মাতবর বাড়ির বউদের কথায়ও নেই। ওখানে তো সবাই কথা বলে বরিশালের নিজস্ব ভাষায়। পাড়া পড়শী সবাই ভেঙে এলো খালাকে দেখতে, দেখে গেলো সবাই কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈর্ষিত চোখে যেনো। পাখি জানতো তার খালা ঢাকায় থাকে আর তার স্বামী সদরঘাট না কোথায় যেনো রিকশা চালায়। কিন্তু এতো অনেক অন্য ব্যাপার। পাখি খালাকে ধরে পড়ল এই উন্নতির উৎস কোথায় বলতে। নাছোড়বান্দা পাখির জেদের চোটে খালা বললেন আলো ঝলমল ঢাকা শহরের কথা যেখানে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, টেলিফোন আছে।

ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলে, পাখা ঘোরে, বাসন মাজতে পুকুর ঘাটে যেতে হয় না, ঘরে সিঙ্ক আছে, আছে আরো বিভিন্ন আরাম আয়েশ ও অজস্র সুখ। আরো কতো কতো দুধ, মালাই, বরফ আইসক্রিমের গল্প। পাখির খালা এক বাসায় কাজ করে। সেখানের বিবি সাহেবের দেয়া এ সমস্ত কাপড়-চোপড় আর জুতো, ফিতে। এ সমস্ত মনোলোভা গল্প শুনে উচ্চাকাঙ্ক্ষি পাখি খালাকে ধরে পড়ল তাকে ঢাকা শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একটা খালার মতো এরকম বাসা খুঁজে দেয়ার জন্য। খালা একটু প্রথমে দোমনা করছিল কিন্তু পাখির আগ্রহ দেখে খালা রাজি হলো। পাখির একথা শুনে পাখির মা, ছোট ভাইবোনেরা কাঁদতে বসল কি করে তারা পাখিকে অজানা দেশে দিয়ে থাকবে, সারাদিন পাখির কাটে ভাইবোনদের দেখাশোনায়, মাতবর বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে পাখি সব ভাইবোনদের উপর নজর রাখে, অসুখ বিসুখে যত্ন সবই তো পাখির হাতে, পাখি ছাড়া দিন কি করে কাটবে? পাখি সব্বাইকে বোঝালো সে তো চিরজীবনের জন্য যাচ্ছে না, সবার ভালো থাকার ব্যবস্থা হলেই পাখি চলে আসবে আবার নিজগ্রামে।

অনাগত সুখের-স্বপ্নের মায়া সবাইকেই খানিকটা দ্রবীভূত করল, সামনে খালার জলজ্যান্ত উদাহরণ তো আছেই তারপরও মন মানতে চায় না। কিন্তু পাখির জেদ দেখে অবশেষে সবাই রাজি হলো।

ছায়াঢাকা-পাখিডাকা, ছোটগ্রাম-স্নেহমাখা এর মায়া ত্যাগ করে খালার সাথে স্টিমারে উঠে চলল পাখি সোনার হরিণের পিছনে। দুচোখ ভর্তি স্বপ্ন আর জীবনের প্রতি প্রচণ্ড মায়া নিয়ে মনের ডানায় ভর দিয়ে পাখি যেনো ভেসে চলল। পিছনে ছেড়ে গেলো অজস্র মায়াভরা অশ্রুসিক্ত চোখ।

স্টিমারে অনেকেই ঘুমালো, অনেকটা পথ। দুদিনের যাত্রা, কিন্তু অনাগত সুন্দর ভবিষ্যৎ আর সবাইকে ছেড়ে আসার ব্যথা পাখিকে দুচোখের পাতা এক করতে দিল না মুহূর্তের জন্য। উত্তেজনায় টান টান পাখিকে দেখে বিধাতা অলক্ষ্যে কি হাসি হেসে ছিল তিনিই জানেন।

অবশেষে স্টিমার এসে থামল পাখির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ঢাকা শহরে। খালা পাখিকে বগলদাবা করে নিয়ে ছুটলেন নিজের কাজের ঠিকানায় সেখানে যেয়ে খালার বিবিসাহেবকে খালা সব কথা খুলে বলতেই তিনি ফোন করলেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট বোনের বাসায়। কদিন আগেই খালার বিবিসাহেবের ছোটবোনের বাচ্চা হয়েছে তিনি তার বাচ্চা রাখার জন্য এমনি একজন ছোট মেয়ে চাইছিলেন। আর কি, সোনায় সোহাগা! সাথে সাথে খালার বিবিসাহেবের ছোটবোন এসে পাখিকে গাড়ীতে করে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো পাখির স্বপ্নের জায়গায়। প্রথমে পাখিকে ঢাকার উপযোগী বানিয়ে তোলার জন্য আগে থেকে ঢাকায় থাকা তুলনামূলক স্মার্ট কাজের লোকদের কাছে ট্রেনিং এ পাঠানো হলো। তারা পাখির নোংরা জামাকাপড় সব ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জামা কাপড় পরতে দিলো, মাথার জঙ্গল কেটে সাফ করল উকুনের দোহাই দিয়ে, পাখিকে ডেটল পানি দিয়ে মেজে মেজে গোসল দিল, নইলে এই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের জীবন্ত বাসা ছোট বাবুর জন্য আবার নতুন কি রোগ সৃষ্টি করবে কে জানে? এই বাড়ির নতুন বাবু কি সুন্দর তুলতুল ফুলফুল। ফর্সা ছোট ছোট ফোলা ফোলা হাত-পা নেড়ে হামাগুড়ি দেয়, সব বিদেশী সাবান, শ্যাম্পু, তেল দিয়ে হয় তার পরিচর্যা। তাকে তো আর এমনি এমনি কারো হাতে তুলে দেয়া যায় না। পাখির ড্রেস রিহার্সেলের সাথে চলল অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশিক্ষণ। যেমন লাইটের সুইচ অন অফ করা, ফ্রিজ খোলা বন্ধ করা, বাচ্চার প্যাম চালানো, ঢাকার ভাষায় কথা বলা ইত্যাদি ইত্যাদি। পাখি তার মালিকের এতবড় বাড়ির সাজানো গোছানো আধুনিক পরিবেশ দেখে বাকহারা হয়ে গেলো। মসজিদের হুজুরের কাছে সে পরকালের বেহেস্ত দোজখের গল্প শুনেছে, এই বেহেস্তের মতো বাড়িতে ঠাণ্ডা-গরম, আলো-অন্ধকার করার সব ব্যবস্থা আছে মানুষের নিজের হাতে। ইচ্ছে হলে ঠাণ্ডা বাতাস খাও, যতক্ষণ ইচ্ছে আলো জ্বালাও, ঠাণ্ডা পানি খাও। তাদের মতো আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না ঠাণ্ডা-গরম কিংবা অন্যান্য আরামের জন্য। পাখির এই বিস্ময় দেখে অন্যান্য সহকর্মীরা হাসে আর বলে, 'হবায়তো ঢাকা শহর আইলি থাক, আরো কত কি দেখবি'। তারপরও এই প্রাচুর্য ভরা বাড়িতে কখনও কখনও পাখির বেশ মন খারাপ হতো, মনে পড়ত গ্রামের খোলা আকাশ, শান্ত পরিবেশ, মাতবর বাড়ির কোলাহল, পাখির ডাক আর মায়ের শান্ত কোমল কোল। অনেক অনেক বিস্ময় আর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসা পাখি ওর অন্যান্য সহকর্মীদের মতো ওই বাড়িতে আস্তে আস্তে স্থায়ী হয়ে গেলো। ওর মুখ্য কাজ হলো পুতুল পুতুল বাচ্চাটার পেছন পেছন থাকা, ওর সাথে খেলা করা, ওর জামা কাপড় গুছিয়ে রাখা আর সাথে বাড়ির কারো দুএকটা টুকটাক ফরমাশ খাটা। পাখি মনের আনন্দ নিয়েই কাজ করতে থাকে মনিবের বাড়ি। মাঝে মাঝে খালার সাথে দেখা হয়, ফোনে কথা হয়। গ্রাম থেকে পাখির চিঠি আসে, পাখির মা মাতবর বাড়ির ছেলেমেয়েদের দিয়ে চিঠি লিখিয়ে পাঠায়, শোনে পড়ায়, যদিও মাতবর বাড়ির লোকজন পাখির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে আসাটাকে মোটেও ভালো চোখে নেয়নি কিন্তু তারপরও পাখির মায়ের কান্নাকাটিতে ছেলেমেয়েরা এতটুকু করে। পাখিও তার মনিবের বাসার লোক দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিজের খবর দেয়। বাচ্চাটাকে রোজ দিন যত্ন করতে করতে এক সময় পাখি লক্ষ্য করল যে বাচ্চাটাকে পাখি নিজের ভাইবোনদের মতোই ভালোবাসতে শুরু করেছে সে। বাচ্চাটা ব্যথা পেলে পাখি কাঁদতে থাকে, বাচ্চাটাকে কেউ বকলে পাখির কষ্ট হতে থাকে। আস্তে আস্তে পাখি যেনো অনেকটা এ বাড়ির সদস্যদের মতোই হয়ে গেলো, বাড়ির জন্য মন কেমন করাও কমে এলো। বাচ্চাটাও পাখি আপু ছাড়া থাকতে চাইতো না, নিজের মায়ের পরে সবচেয়ে বেশি পাখি আপুকেই চাইতো ও নিজের কাছে।

আস্তে আস্তে সময় যেতে থাকলো, বছর ঘুরে এলো, পাখি বাড়ি যাওয়ার জন্য উতলা হয়। বেতনের টাকা আর বকশিশ মিলে অনেক জমা হয়েছে। এবার পাখির ঘর বানানোর পালা। পাখি তার মনিবকে তার সংকল্পের কথা জানালে পাখির মনিব তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রায় দুবছর পর পাখি চললো নিজের বাড়িতে তার খালার সাথে। সাথে অনেক বড় সুটকেস, তাতে ভর্তি উপহার, মনিব গিন্নি থেকে ছোট ভাইবোনদের জন্য পাওয়া কাপড়-চোপড় মনিব গিন্নি থেকে ছোট ভাইবোনদের জন্য পাওয়া, তার সাথে আছে পুরোনো খেলনা, বাসন-কোসন, বিছানার চাদর ইত্যাদি ইত্যাদি। যা মনিবের বাড়িতে পুরোনো বা বাতিল হতো তাই পাখি অন্যান্য চাকরদের সাথে নিজেও নিজের ভাগ নিত। কখনও-বা খালাম্মার (মনিব গিন্নির) কাছে নিজেই অগ্রিম আবেদন জানিয়ে রাখতো, এই শাড়ীটা বা খেলনাটা পুরোন হলে কিন্তু আমাকে দিবেন। খুশীতে আত্মহারা পাখি ডানায় ভর দিয়ে যেতে লাগলো। স্টিমার যখন ঘাটে পৌঁছোলো তখন পাখি যেনো দৌড়ে বাকি পথ পেরুবে। ঘাট থেকে বাড়ি যেতে যেতে পথের দুধারে ঘটে যাওয়া এদুবছরে কিছু পরিবর্তন পাখি দেখলই না, কারণ পাখির মন তো পরে রয়েছে নিজের ভিটেতে। তবে হালকা মনে এটুকু ভাবল ইট পাথরে ঘেরা ধনী ঢাকা থেকে নির্মল দরিদ্র গা অনেক সুন্দর আর নিবিড়। বাতাসের বেগ নিয়ে বাড়ি পৌঁছে পাখি প্রথমে সবার সাথে কুশল বিনিময় করল। কিন্তু যে পাখি ঢাকা গিয়েছিল আর যে পাখি দু-বছর পর ফেরত এলো তাতে বিস্তর তফাৎ। পাখি দেখতে একদম পরীর মতো সুন্দর হয়ে গেছে, মাতবর বাড়ির মেয়েদের চেয়েও ফর্সা, সুন্দর, গোলগাল স্বাস্থ্য। কথা বলে সুন্দর করে, কাপড় পরে অন্যরকম করে, সারা গায়ের লোক পাখিকে দেখতে এলো আর পাখি চাকরি করে পরিবারের সবার জন্য এতো নাম না জানা বিদেশী জিনিস নিয়ে এসেছে যে সবাই দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল। পাখি বলল এবার তার বাবা-মাকে ঘরের চাল ছাওয়ার কথা। যে কথা সেই কাজ, দুদিন পর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিদের ঘর ছাওয়ার কাজ আরম্ভ হোল। প্রায় দশদিন ধরে ঘর ছাওয়া ও মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে, পাখির আনন্দ যেনো আর বাঁধ মানে না। অনেক দিনের স্বপ্ন এখন বাস্তবের রূপ নিয়েছে, পাখি বাড়ির চারপাশে ঘুরে আর চেয়ে থাকে, চেয়ে চেয়ে যেনো তবু পাখির আশ মিটে না। সময় বয়ে যায়, এখন পাখির আস্তে আস্তে ফেরার পালা। পাখির ছোট ভাইবোন এখন একটু বড় হয়েছে, পাখির ইচ্ছে অনুসারে ওদেরকে স্কুলে দেয়া হলো, গ্রামের পাশের বাজারে পোস্ট অফিস আছে, তাতে এ্যাকাউন্ট খোলা হলো যাতে পাখির বেতনের টাকা মাস মাস বাড়িতে মানি অর্ডার করে পাঠানো যায়। আর পাখি মাকে বলে এখন থেকে পাখিই টাকা পাঠাবে, পাখির মা যেনো আর মাতবর বাড়ি কাজে না যায়। গ্রামের অনেকেই পাখির উন্নতি দেখে ভাগ্য ফেরানোর জন্য পাখির সাথে ঢাকা আসতে চায়, পাখি তার মনিব গিন্নির কথা অনুসারে দুজন নিজের আত্মীয় বাছাই করল নিজের সাথে নিয়ে আসার জন্য। আবার পাখি ঢাকা রওয়ানা হলো খালাম্মার জন্য পিঠা, তেঁতুল, আচার সাথে নিয়ে। এবার আর আগের মতো এতো কান্নাকাটি হলো না, পাখিও স্টিমারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এলো মনে অনেকটা প্রশান্তি নিয়ে। ঢাকায় এসে আবার সেই বাঁধা নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন। এখন বাচ্চা একটু বড় হয়েছে, পাখিরও কাজ কমে এসেছে। তাই বাচ্চা রাখার সাথে সাথে পাখি ঘরের অন্যান্য কাজও শিখতে থাকে, করতে থাকে। পাখির বেতন প্রতি দু-তিন মাস অন্তর পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাখির পরিবারের কাছে পৌছে যায়। এভাবেই দিন যাচ্ছিলো। হঠাৎ পাখির মা বরিশাল থেকে পাখির ছোটবোনকে নিয়ে ঢাকা এসে উপস্থিত হলেন চিঠির ঠিকানা ধরে। পাখি তো আনন্দে আত্মহারা, আর পাখির মালিকপক্ষও খুশি তাহলে তো পাখির আর বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজনও তেমন নেই। পাখির মা-ই এসে পাখিকে দেখে যাবেন।

মালিকের বাসায় তারা বেশ কদিন বেড়ালেন, ঢাকা শহর দেখলেন, ডাক্তার দেখালেন, একটু বাজার সদাই করলেন, তারপর বাড়ি ফেরার পালা। বাড়ি ফেরার সময় দেখা গেলো পাখির বোন আর ফিরে যেতে চায় না বরিশাল, ও ঢাকায় থাকবে আর কাজ করবে পাখির মতো। পড়াশোনা করবে না। পাখির শত অনুনয়-বিনয়ও ছোটবোনের মন গলাতে পারল না। এ ঘটনা থেকে বেরিয়ে এলো পাখির অজানা অনেক তথ্য যা পাখির মনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলো। পাখি ভাইবোনকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছিল আর স্বপ্ন বুনছিল ভাইবোনকে অন্যভাবে গড়ে তোলার, পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করার সেইজন্য কষ্টার্জিত আয় সব বাড়ি পাঠাচ্ছিল কিন্তু ভাইবোনরা কদিন স্কুলে যেয়েই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল। পড়াশোনা তাদের ভালো লাগে না, পাখির টাকায় এদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদিক ঘুরে বেড়ানো, ভালো জামা-কাপড় পরা, মেলা দেখা, ভালো খাবার খাওয়া ইত্যাদি চলছিল। স্বপ্নভঙ্গের কষ্টে আকুল হয়ে পাখি কাঁদতে লাগল, নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগল। তারপর রাগ করে বাড়ির সাথে যোগাযোগ বন্ধের কথাও বলল। পাখির ছোটবোন মনিবের অন্য আত্মীয়ের বাসায় কাজ নিয়ে ঢাকাতেই থেকে গেলো আর পাখির মা চোখ মুছতে মুছতে বিদায় নিল। পাখি রাগ করে বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলেও পাখির মা তার বোন আর দুই মেয়েকে দেখতে প্রায়ই ঢাকা আসা-যাওয়া করতে লাগলেন আর অসুখ-বিসুখের কথা বলে প্রায়ই দু'মেয়ের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিতে লাগলেন। আগে যারা বছরে পাঁচশো টাকা চোখে দেখতেন না তাদের এখন প্রায় প্রতি দুমাস তিনমাস অন্তরই এতটাকার বিশেষ দরকার পড়তে লাগল।

এভাবেই পরিবারের সাথে নানা ঝগড়া, অশান্তির মধ্যে দিয়ে পাখির সময় কাটতে লাগল। লম্বা, চওড়া পাখি খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে বড় হয়ে উঠলে পাখির মা মনিব পক্ষকে আবদার করলেন দেখেশুনে তারাই যেনো পাখির একটা বিয়ে দিয়ে দেন, পাখি তো তাদের মেয়েরই মতো। বাবাহীনা, পরিশ্রমী মিষ্টভাষী পাখির প্রতি তার মালিকপক্ষ খুব সন্তুষ্টই ছিলেন। তারা সানন্দেই রাজি হলেন। বিয়ের কথায় যেকোনো মেয়ের বুকেই গুড়গুড় করে ওঠে, মুখে অকারণ লাল ছোপ পড়ে, পাখিও তার ব্যতিক্রম নয়। পাখি যেনো নতুন জীবনের স্বপ্নে, নতুন সুখের আশ্বাসে হাওয়ায় ভেসে চলছিল। মালিকপক্ষ তাদের কোম্পানিতে কর্মরত একজন নির্ভেজাল, পিতৃ-মাতৃহীন তরুণের সাথে পাখির মা-খালা এবং পাখির সম্মতিক্রমে বিয়ে ঠিক করলেন এবং বেশ ধুমধাম করেই লোকজন ডেকে সোনা গয়না দিয়ে পাখির বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর পাখি পুরনো সব দুঃখ ভুলে নিজের নতুন জীবন গড়ার জন্য আবার পুরো উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাবা-মায়ের সংসার টেনে তুলতে পারেনি তাতে কি হয়েছে, এ তার নিজের সংসার, নিজের জীবন এতে লাগিয়ে দিয়ে টেনে তুলবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাখি নিজে বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করতে লাগল, হাতের কাজ করতে লাগল, স্বামী চাকুরি করছিল বেশ ভালোই চলছিল। মাঝে মাঝে পাখি সেজেগুজে মনিবের বাড়ি বেড়াতে আসত, হাত নেড়ে-মুখ নেড়ে নতুন জীবনের, নতুন সুখের বর্ণনা দিতো, মালিকপক্ষও আশ্বস্ত হতো শুনে যাক তাদের আদরের পাখি তাহলে ভালোই আছে। পাখি এক ফুটফুটে পুত্রসন্তানের মা হলো এবং বেশ আনন্দেই জীবন অতিবাহিত করতে লাগল। সুধী পাঠক, এখানেই শেষ হতে পারত আমাদের পাখির এই গল্প, সিনেমা কিংবা উপন্যাস কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। নিয়তি অনেক কিছুই অন্যভাবে লিখে রাখে, যা হওয়ার নয়, তাই হয় আর যা হওয়ার তা হয় না। পাখির স্বামীর মন মেজাজের আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকল। তার আর চাকরিতে মন নেই, সে কাজে দেদার ফাঁকি দিতে লাগল। কেউ কিচ্ছু বললে সে সহকর্মীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে লাগল অত্যন্ত উচ্চস্বরে, সে মালিকপক্ষের নিজের লোক বলে কথা। কথায় কথায় সে এই কথা বলেই অন্যদের শাসাতে লাগল। প্রথম প্রথম মালিকপক্ষ এগুলোকে আমল দিতে চাইলেন না কিন্তু সব কর্মচারী যখন দলবেঁধে মালিকের কাছে এলো তখন মালিককে বাধ্য হয়েই ব্যবস্থা নিতে হলো। কিন্তু পাখির মুখের দিকে চেয়ে আর ছেলেটার প্রথম ভুল ভেবে মালিকপক্ষ তাকে অন্য জায়গায় চাকরির ব্যবস্থা করে দিল। নতুন জায়গাতেও পাখির স্বামীর স্বভাব বদলালোনা। বারবার পাখির স্বামীর একই ভুল মালিকপক্ষকে অতিষ্ঠ করে তুলল। তারা আর পাখির স্বামীর কাজের কোনো সুপারিশ বা ব্যবস্থা করলেন না। আয় রোজগার ছাড়া এই এতো বড় কি করে শহরে ছেলে নিয়ে পাখির সংসার চলে? কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কি করা যায় পাখি ভাবতে লাগল। কিন্তু অভাবের দিন তো আর ফুরায় না।

অনেক ভেবে স্বামীর গ্রামের বাড়ি চলে গেলো, স্বামীর ভিটেতে স্বামীসহ নতুন করে আবার সংসার পাতলো সংগ্রামী পাখি। চতুর্দিকে নির্মল নীল আকাশ, কুলকুল রবে বয়ে যাওয়া শান্ত নীরব নদী, আর দিগন্ত খোলা সবুজ মাঠ পেয়ে পাখি যেনো অনেকদিন পর আবার নিজের শৈশবকেই ফিরে পেলো।

নিজের সামান্য জমি সম্বল করে তার সাথে অন্যদের জমি ভাগে নিয়ে চাষাবাদ শুরু করল পাখির স্বামী। আর পাখি নিজে শুরু করল বাড়িতে হাঁস, মুরগীর চাষ, সাথে বাড়ির ভিটেতে সব্জি। চেষ্টার আর খাটুনির অন্ত ছিল না পাখির। এবার সুখের আর নিশ্চয়তার মুখ দেখবেই পাখি। শত হোক, শ্বশুরের ভিটে আর সামান্য জমি তো আছেই। পরিশ্রম আর বুদ্ধি দিয়ে এটাকেই দ্বিগুণ করে ফেলবে। খুশির আবেগে কোনো কাজকেই পাখির কাজ মনে হতো না, তিনজনের কাজ সে একজনে করে ফেলত। পাখিকে দেখে বিধাতা অলক্ষ্যে বুঝি হাসে। দেখা গেলো এবার বন্যা তো, সেবার খরা। ফসল আসে না ঠিক মতো, তার উপর সাথের ভাগী চাষীদের সাথে ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। এই সামান্য জমি থেকে যা আসে, তাতে সারা বছরের ভাতের ব্যবস্থাও হয় না আর জমানো বা অন্য খরচ তো দুরের কথা। বাকি ছয় মাস কি খাবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে থাকতে হয় পাখিকে। সাথে যোগ হয় আরো অন্য কষ্ট, পাখির স্বামী এতো দিনের শহরে থাকা বাবু আর গ্রামে থাকার কষ্ট নিতে চায় না। একদিন কাজে যায় তো দশদিন, এ বাহানা ও বাহানা করে ঘরে শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। তার কাজকর্মের ব্যবস্থা দেখার চেয়ে বাবুগিরি, ফুটানি আর গ্রামের লোকদেরকে বড় বড় গল্প বলাতে সময় যায় বেশি। পাখি এ নিয়ে অভিযোগ করলে পাখিকে তেড়ে মারতে আসতো, বলত, 'ফকিরনীর মাইয়া, ছিলি তো বাসার কাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেমড়ি তুই বুঝবি কি এসব আমাদের বড় মানুষদের ব্যাপার?' সেটাও ঠিক, পকেটে যার পয়সা নেই কাল কিভাবে কাটবে তার কোনো স্থিরতা নেই সে লোকের এসব বড়মানুষী আড্ডা, সিনেমা দেখা, তামাক খাওয়া পাখি বোঝে না, বোঝে পরিবার নিয়ে দুবেলা ভাতের নিশ্চয়তা, মাথার উপর নিজের একটা আপন ছাউনি, ছেলেটার একটু পড়াশোনার ব্যবস্থা, অসুখে একটু ঔষধ পাওয়ার নিশ্চয়তা। আর কতো স্রোতের উলটোদিকে পাখি নৌকা বেয়ে যাবে? প্রতিদিনের অভাব, স্বামীর সাথে ঝগড়া আর স্বামীর কটুকথা আস্তে আস্তে পাখির মনের জোর ভেঙে দেয় অনেকখানি। যে স্বপ্ন নিয়ে পাখি শ্বশুরের ভিটাতে পা রেখেছিল তা আজ শত টুকরো হয়ে গেছে। পাখি দিশেহারা। জন্মের পর থেকে একার একটানা সংগ্রাম পাখিকে করেছে কিছুটা বিষণ্ন। কিন্তু তারপরও পাখি ভবিষ্যতের কথা ভাবে। পাখির নিজের জীবন যেভাবেই কেটেছে সে যাকগে, কিন্তু পাখি তার ছেলেকে সেভাবে হারিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই।

পাখি ভাবলো বাঁচতে হবে সে যে ভাবেই হোক, নিজের জন্য নয়, ছেলের জন্য। ছেলেকে পড়শোনা শেখাতে হবে, মানুষের মতো মানুষ করতে হবে।

আবার ঢাকা এলো পাখি একা ছেলেকে নিয়ে। আবার বেহুলা ভাসাল ভেলা একা গহীন গাঙে, লক্ষীন্দর আজও মৃত। যে পুরুষ স্ত্রী সন্তানের দায়িত্ব নিতে অক্ষম সে তো মৃতই। গার্মেন্টসের কথা অনেক শুনেছে পাখি। ভাবলো গার্মেন্টসে তো অনেক পয়সা, এখান থেকেই ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে হবে, ছেলেকে পড়াশোনা করাতে হবে। আবার এসে ছেলে নিয়ে উঠল মনিবের বাসায়। কথা হলো দ্রুত গার্মেন্টসে চাকুরি জোগাড় করে পাখি নিজের আস্তানা ঠিক করে ছেলে নিয়ে চলে যাবে নিজের আস্তানায়। ঢাকা শহরে সবারই জায়গার সমস্যা তার উপর কে আবার অন্যের ঝামেলা মাথায় নিতে চায়। আর পাখি তো এ বাসায় কাজ করার জন্যও আসেনি, উলটো আরো ঘরের কাজের লোকদের গার্মেন্টসের নামে নষ্ট করার ধান্দায় এসেছে। পাখি তার কথা রাখল। অতি দ্রুত তার ছোটবোন আর খালার নেটওয়ার্কের সাহায্যে একটা গার্মেন্টসে চাকুরি জোগাড় করে ফেলল। বস্তিতে ঘরও ভাড়া করল। মনিববাড়ির সাহায্যে ছেলেকে একটা সরকারি স্কুলেও ভর্তি করে দিলো। পাখি সারাদিন গার্মেন্টসে, ছেলে স্কুল থেকে এসে মনিববাড়িতে রোজ ঘুরঘুর করে, যাবার জায়গা নেই। আট ঘণ্টার কাজের কথা থাকলেও রোজই প্রায় ওভারটাইম থাকে পাখির, আর ওভারটাইম মোটামুটি বাধ্যতামুলক। দশ ঘণ্টা, বারো ঘণ্টা কাজের পর আবার নিজের বাজার, রান্না, খাওয়া-পাখি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দেশ থেকে পাখির মাকে আনালো ছেলের দেখাশোনা আর রান্না খাওয়ার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বস্তিতে ঘর ভাড়া, নিজেদের খাওয়া পরা, ছেলের স্কুলের খরচ সব তো পাখির এই চাকুরিতে কুলায় না, তার উপর বড়মানুষ স্বামী যখন তখন চাকুরিয়া বউ-এর কাছে এসে পয়সার জন্য হামলা চালায়। আবার পাখি অসুস্থ থাকলে বেতন কেটে রাখে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ। পাখি মরিয়া হয়ে উঠল এবার। আশেপাশে সব জায়গায় একটা ভালো কাজের সন্ধান করতে লাগল পাগলের মতো। সন্ধানে কি না মিলে? পাখিরও মিলল সেই সোনার হরিণের খোঁজ।

একজন খোঁজ এনে দিল কোথায় যেনো বিদেশে কাজের লোক নেয়া হবে। বেতন বেশ ভালো, আর থাকা খাওয়া তো ফ্রী। বিদেশের ভালো খাওয়া-দাওয়া আর অনেক অনেক ভালো থাকার সুযোগ। পাখির জীবন-ই অন্যরকম হয়ে যাবে। যে জীবনের স্বপ্ন পাখি জীবনভর দেখে এসেছে। পাখি পাগলের মতো ছুটল সেখানে। ইন্টারভিউ দিল এবং সিলেক্টও হলো। আরম্ভ হলো পাখির জীবন সংগ্রামের আর একটি অধ্যায়।

স্বামী সন্তান সবাই অনেক খুশি, মা অন্তত সুখ এনে দিতে সাগর পাড়ি দিচ্ছে, তাদের আর কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না, তারাও বড়লোক হবে আর আরাম আয়েসের দিন কাটাবে। পাগলের মতো পুরনো মনিবের হাতে পায়ে ধরে, স্বামীর ভিটে বন্ধক রেখে পাখি যাওয়ার টাকা জোগাড় করল কোনো রকমে। তারপর পাখি ছেলেকে স্বামীর কাছে রেখে অনেক আশা নিয়ে উড়ল আকাশে। সাত সমুদ্র না হোক তবুও সমুদ্র পেরিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে হলো পাখির যাত্রা। সোনার হরিণকে কয়েদ করবে বলে।

দুবাইতে পাখির জীবন কাটল মোটামুটি নির্বিঘ্নেই। পাখি মন দিয়ে তার মনিব পরিবারের সেবা করল, একটু একটু আরবী পাখিকে দুবাই যাওয়ার আগেই শিখতে হয়েছিল, ট্রেনিং-এর সময়। সেখানে যেয়ে আরো ভালো করে ভাষাটা রপ্ত করল। নিজের ছোটবোনকে দুবাই নেয়ার ব্যবস্থাও করল এরমধ্যে। মাঝে মাঝেই মনিব বাড়িতে ফোন করে স্বামী ছেলের সাথে কথা বলত। স্বামী ভিটে, জমি ছাড়িয়ে নিল মহাজন থেকে। মনিবের ঋণও দেয়া শেষ। পাখি যত টাকা পাঠাতো শুধু স্বামীকে বলত তুমি দেশে এক টুকরা জমি কিনো, গরু কিনো, গাভী আর হাস-মুরগী কিনো। আর বাকি টাকা ব্যাংক-এ রাখো। ছেলেকে বলত, তুই মন দিয়ে পড় বাবা। তোকে অনেক বড় হতে হবে। স্বামী আর ছেলে পাখিকে সান্ত্বনা দিতো এই বলে যে পাখির কথামতোই সব কাজ হচ্ছে। পাখিকে কিচ্ছুই ভাবতে হবে না। কেউ বাংলাদেশে এলে গেলে পাখি তাদের হাতে পায়ে ধরে স্বামী ছেলের জন্য এটা সেটা পাঠায়। ছেলেও নানান সৌখিন জিনিসের আবদার করত মায়ের কাছে মা একটা ক্যামেরা পাঠাও কিংবা একটা দামি পারফিউম বা সানগ্লাস। সে সমস্ত আবদার পাখি রক্ষা করতো এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবে যে আহারে মা কাছে নেই ছেলেটা এমনিতেই না জানি কতো কষ্ট পাচ্ছে। পাখি দুবাইতে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করলেও রাতের বেলায় ঘুমাতে পারত না, সারারাত পাখির দুচোখ জুড়ে থাকত বাড়ি ফেরার স্বপ্ন। নিজের একটা ছোট্ট সংসারের স্বপ্ন।

একটানা সাত বছর দুবাই এ পারিচারিকার কাজ করে, মনের মতো জিনিসপত্র, উপহার নিয়ে পাখি উড়ল এবার দেশের পানে। এবার আর বাধা নেই। জমি আছে, গরু আছে, হাঁস-মুরগী আছে। এবার মনের আশ মিটিয়ে সত্যি সংসার করবে। অজানা সুখের কথা ভেবে সারা শরীরে শিহরণ জাগে পাখির। কতোদিন পর স্বামী পুত্রকে কাছে পাবে সে। আবার একসাথে থাকবে তারা। যে জীবনের স্বপ্ন ছোটবেলা দেখে এসেছে এতদিনে তা হাতের মুঠোয় ধরা দেবে। স্বপ্নমাখা চোখ নিয়ে পাখি এসে নামল। পাখির পরিবারের লোকদের মধ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেলো, পাখিকে কাছে পেয়ে। অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল এই হতে পারত শেষটা কিন্তু কখনও কি শেষ হয় পাখিদের সংগ্রাম? যেখানে পদে পদে সবাই ঠকানোর জন্য তৈরি, সেখানে সরলা পাখিদের সারা জীবন দুঃখের অকুল দরিয়ায় ভাসা ছাড়া উপায় কি?

বাড়ি ফিরল পাখি, প্রথম কদিন বেড়ানো, সবার সাথে দেখা করা, উপহার দেয়া, কুশল বিনিময় করার হুড়োহুড়িতেই গেলো। এর মাঝেও পাখি কয়েকবার ছেলেকে তার পড়ার কথা জিজ্ঞেস করল, কতদূর পাশ দিলো আর কতদিন লাগবে? ছেলে একথায় ওকথায় এ বাহানায় ওবাহানায় সব প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতো। এরপর পাখি স্বামীকে বারবার তাগাদা দিতে লাগল দেশে যাবে, জমি দেখবে। পাখিরা এতোদিন ঢাকাতে আছে দেশের জমির, গরুর, হাঁস-মুরগীর কি হাল? স্বামীও বলত হবে, সব হবে।

মাত্র তো এলে এতোদিন খাটাখাটুনির পর, কদিন বিশ্রাম নাও। তারপরও পাখির মন মানতো না। ঢাকাতে এ কার বাসা? স্বামী তো দেশে থাকে আর ছেলেতো কোথাও মেসে থেকে পড়ে। এ বাসায় তার পাঠানো টুইন ওয়ান, ক্যামেরা আছে কিন্তু সাথে আছে রঙিন টিভি, ছোট ফ্রিজ। এগুলো কার? রোজ এতো বাজার করে আনে তার স্বামী। ছেলে এতো অন্যান্য খরচা করে, এতো টাকা কি আয় হয় ওদের রোজ? পাখির কেমন যেনো দ্বন্দ্ব লাগলো। পাখি রোজ স্বামীকে পাঠানো টাকার হিসাব দিতে বলতে লাগল। জমির, গরুর কথা, ঢাকার বাসা এবং বাসার খরচের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। স্বামী, ছেলে পাখিকে এড়াতে শুরু করল। পাশের বাসা থেকে পাখি জানতে পেলো এ বাসা পাখির স্বামীরই। ঘরের এই মালামাল পাখির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির স্বামী ছেলে কখনই গ্রামে যায় না, সারাদিন টিভি দেখে খেয়ে ঘুরে কাটায়। ছেলের পড়াশোনার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, মা যাওয়ার দু-এক বছরের মধ্যেই সে সম্পর্কের ইতি ঘটেছে। পাখির মাথায় বজ্রপাত হলো। পাখি অন্যসব বাদ দিয়ে তার রক্তমাংস দিয়ে আয় করা টাকার জন্য মরিয়া হয়ে ছেলে আর স্বামীর পিছনে লাগল কিন্তু তারা কোনো হিসাব দিতে পারছে না। এদিকে রোজ রোজকার হিসাবের তাগাদায় আর জেরায় পাখির স্বামী আর ছেলেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে হাতাহাতিও হয়ে যেতো পাখির তার স্বামীর সাথে এটা নিয়ে। পাখি কবে আবার দুবাই ফেরত যাবে সেখবর জানতে তৎপর হয় পাখির স্বামী আর ছেলে। যখন জানতে পেলো পাখি পাকাপাকি ভাবে চলে এসেছে, আর দুবাই যাবে না তখন বাপ-বেটা রেগে আগুন। কি করে সম্ভব এটা? সোনার ডিম দেয়া হাঁস আর ডিম দেবে না?

পাখিকে নানাভাবে দুবাই ফিরে যাওয়ার জন্য বোঝানো হলো কিন্তু এবার পাখি অনড়। অতিষ্ঠ হয়ে গেলো পাখির স্বামী ছেলে। পাখির নিয়ে আসা টাকা ফুরিয়ে গেছে, হাতও খালি, টাকা জোগাড় করে দেয়ার তো নাম নেইই তার উপর আবার সারাক্ষণ পুরোনো হিসেব চায়। বাপ-বেটা মিলে পাখিকে বেদম মার দিলো, ধরার তো কেউ ছিলো না, মাথা ফাটা রক্তাক্ত পাখিকে হাসপাতাল ফেলে দিয়ে তারা উধাও হয়ে গেলো।

কৈ মাছের জান পাখির, শরীরের সব ব্যথা সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। কিন্তু মনের কষ্টের খবর কে রাখে? সে কষ্ট কি কোনোদিনও সেরে উঠার? এ কদিনে কেউ যায়নি হাসপাতাল পাখিকে একটি বারের জন্য দেখতে বা খোঁজ নিতে। হয়ত পুলিশের ভয় পেয়েছিল বা অন্যকিছু কে জানে? সুস্থ হয়ে পাখি মনিব বাড়িতে আসল নিজের দুঃখের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করল পাখির খালাম্মাকে (মনিব গিন্নিকে)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি করবি তুই পাখি? পাখির তখন সংসারের প্রতি অসীম বিতৃষ্ণা, মনে বিরাজ করছে অসীম বৈরাগ্য। বলল, খালাম্মা যেদিক দুচোখ যায় চলে যাব, একটাই পেট আমার, আমি এখন নিজের জন্য কিংবা কারো জন্যই ভাবি না। মনিবগিন্নি পাখিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তখনকার মতো ঠাণ্ডা করলেন। কিন্তু পাখি কিছুতেই মনিবগিন্নির বাসায় থাকতে রাজি হলো না, পাখি জানে তার স্বামী সন্তান যদি কখনও তাকে খুঁজতে আসে তো প্রথম কোথায় আসবে। পাখি কিছুতেই আর তার স্বামী সন্তানের মুখ দেখতে রাজি না। কোথায় যাবে, কি করবে– দিনরাত পাগলের মতো ভাবতো একা বসে। পাখির মনিবগিন্নি পাখির অবস্থা দেখে বলল তুই আবার দুবাই চলে যা পাখি, টাকার ব্যবস্থা আমি করে দিব।

পাখি বলল আর কি জন্য দুবাই যাবো খালাম্মা? তাছাড়া ওরা বড্ড খাটায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদণ্ড বসতে দেয় না। পাখি আর কিছুতেই ঢাকায় থাকবে না, এমন অজানায় হারাবে যাতে স্বামী-সন্তান আর কোনোদিন খুঁজে না পায়। একদিন পাখি সত্যি সত্যি অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। এখন পাখি আছে বাংলাদেশের কোনো এক কোনায় নিজেকে লুকিয়ে, নিজের ব্যথা লুকাতে নিজেই লুকিয়ে পড়ল পাখি। এক চাকুরি করা মেমসাহেবের বাচ্চার দেখাশোনার ভার নিয়েছে পাখি নিজের উপর। হতাশ মনের পাখি যে নিজের প্রদীপকে আলো দেখাতে পারেনি সে আজ অন্যের প্রদীপকে আলো দেখাতে প্রাণপাত করছে।

মাঝে মাঝে পাখি ফোন করে খালাম্মার কাছে, এমনি সবাই কেমন আছে জানতে। পাখির ধারণা সঠিক ছিলো, সোনার ডিম দেয়া হাঁস কোথায় লুকালো সে খোঁজ নিতে স্বামী সন্তান এসেছিলো পাখির মনিবের বাড়ি। কোনো খোঁজ না পেয়ে পাখির স্বামী অনেক রাগারাগিও করেছে মনিব গিন্নির সাথে, পাখির স্বামীও জানেন খালাম্মা খোঁজ জানবেন না তা হতেই পারে না। কিন্তু কি করে মনিব গিন্নি কাউকে পাখির খোঁজ দিবেন? পাখি যে তাকে কসম দিয়ে বলে গেছে আমি মরে গেলে আমার লাশ শুধু আপনি পাবেন খালাম্মা আর কেউ না, পাখির এতো বড় বিশ্বাস উনি ভাঙেন কি করে? দুঃখে যে বনবাসিনী হয়েছে তাকে আজ কেনো আর বিরক্ত করা? সে তো চাওয়া পাওয়ার হিসাবের খাতা বন্ধ করে দিয়েই চলে গেছে। এতটুকু নিশ্চয়তার সোনার হরিনের খোঁজ তাকে সারা পৃথিবী তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ালো কিন্তু ধরা দিল না কখনও।

অনেকে গল্প বা উপন্যাসের শেষে উপসংহার দেয়াকে গল্প বা উপন্যাসের দুর্বলতা বলে ধরেন, ধরুন, তাতে আমার আপত্তি নেই, কারণ এটি কোনো গল্প বা উপন্যাস নয়, এটি সংগ্রামী পাখির সত্য জীবনালেখ্য। আর আমি এটাও লিখলাম না, এ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা মাত্র কারো জীবনের সাথে মিল পাওয়া নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার কারণ পাখির পক্ষে কম্পিউটার অন করে নিজের জীবনকথা পড়া একটি কল্পনীয় দৃশ্যমাত্র আর এ কল্পনীয় দৃশ্য যদি কোনোদিন বাস্তবও হয় পাখি হয়তো তার জীবন কথা লিখার ও ছাপার অপরাধ থেকে তার বড় আপাকে মুক্তি দিবে।

০৮.০৩.০৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী দিবসের ব্যস্ততা

আজ সকাল থেকেই রেহানা সুলতানা খুব ব্যস্ত। আজকে ৮ মার্চ, বিশ্ব নারী দিবস। সে উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, তাদের সংগঠন 'নারীকেন্দ্র'ও এই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সেমিনার ও বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। নারীকেন্দ্রের আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'মেয়েদের অধিকার, আইন ও তার বাস্তবায়ন'। সেমিনারের প্রধান বক্তা আবার রেহানা সুলতানা নিজেই। তো ব্যস্ত থাকবেন না তিনি? নিজের পেপার রেডি করা, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি, তাদের নিজে যেয়ে আমন্ত্রণ শোভাযাত্রার থিম ঠিক করেছেন, সবকিছু একদম নিখুঁত হওয়া চাই, সবার থেকে আলাদা তো হবেই আর নতুনও হতে হবে। পুরনো আইডিয়া আবার তার পছন্দ না। সবকিছু এ্যারেঞ্জ করা এগুলো কি কম ঝক্কির ব্যাপার? এমনিতেও নারীকেন্দ্রের সহপরিচালিকা হিসেবে তাকে মোটামুটি সবসময় ব্যস্তই থাকতে হয়।

সেমিনার, মিটিং তো হরদম লেগেই থাকে, অনেক সময়তো দেখা যায় পরপর কদিন অফিসেই যেতে পারেন না। ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা পুরোটা তিনি প্রাইভেট টিউটরদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, আজকাল আর সময় পান না তেমন, মাঝে মাঝে তো রাতে খাবার টেবিল ছাড়া ওদের সাথে দেখাই হয় না। নিজেও তখন এতো ক্লান্ত থাকেন যে কোনো রকমে খেয়ে, রাতের প্রসাধনটা সেরেই এসি ছেড়ে শুয়ে পড়েন। টিভিতে হিন্দী সিরিয়াল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন। নিজের কাজ নিয়েই তাকে এতো ব্যস্ত থাকতে হয় যে সংসারের অন্যদিক দেখা আর সম্ভব হয় না। শাশুড়ির হাতেই মোটামুটি সংসারের নিত্যদিনের দায়িত্ব দেয়া আছে যদিও মূল চাবিকাঠি তার নিজের কাছে। রোজের বাজার, খুচরো কাজ, কাজের লোকের দায়িত্ব শাশুড়ির কাছে দেয়া আছে, এসবের জন্য এর চেয়ে বিশ্বস্ত কাজের লোক এ বাজারে আর কোথায় মিলবে। সেজন্যই শাশুড়িকে বাসায় রাখা নইলে কবে দূর দূর করে গ্রামে রেখে আসতেন। গ্রাম্য স্বভাবের পান চিবানো এই ভদ্রমহিলাকে আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই তিনি পছন্দ করেন না, কারণে অকারণে যেখানে সেখানে নাক গলিয়ে তার গ্রাম্য ভাষায় যত রকমের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়া কথা। তবে কথার পরিমাণ রেহানা সুলতানা আগের থেকে আজকাল অনেকটাই কমিয়ে এনেছেন, কাজের কথা ছাড়া কথা একদম বন্ধ প্রায় বললেই হয়। স্বামীকেও টু-শব্দ করার সুযোগ দেন না তিনি ঘরের ব্যাপারে, তিনি যা বলবেন সেটাই তার সংসারে শেষ কথা। তার স্বামী অবশ্য তাকে ঘাঁটাতে সাহসও করেন না। সালাম সাহেব তার অফিস, রাতের পার্টি নিয়ে তার মতো ভালো আছেন। তবে রেহানা সুলতানার কোন কাজ থাকলে তিনি খুব যত্ন নিয়ে তা করে দেন বিরাট সরকারি চাকুরি করেন সালাম সাহেব, প্রায় সব বিভাগেই তার প্রভাব আছে, লোকজন তার কথা ফেলতে পারেন না। রেহানা সুলতানার এটা বিরাট সুবিধা, তার 'নারীকেন্দ্র' অনেক কাজই প্রায় বিনা সমস্যায় সালাম সাহেবের সুবাদে হয়ে যায়, সেজন্যই তিনি সহপরিচালিকার মর্যাদা পান যদিও তিনি স্বামীকে তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেন না, নিজের দাপট সবসময়ই বজায় রাখেন। সংসারে আর কার্যক্ষেত্রে সব জায়গায় তার দাপটে সবাই প্রায় তটস্থ থাকে। সবকিছুকে কি করে নিজের অধীনে রাখতে হয় সেটা রেহানা সুলতানা ভালোই জানেন।

এমনিতে রেহানা সুলতানার সংসার ও জীবন মোটামুটি বেশ গোছানোই ছিল কিন্তু গোল বাধায় তার বেয়াড়া মেয়েটা। শাশুড়ির সাথে কথা বলার সময় এসে টকাস টকাস করে চারখানা কথা হয়তো তাকেই শুনিয়ে গেলো, মজা করার ছলে তাকেই খুচিয়ে গেলো হয়তো। এমনিতে দাদির সাথে ভাবও বেশ। দাদির পাশে শুয়ে শুয়ে ওই পান চিবানো মুখের গ্রাম্য গল্প দেখা যায় খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে আবার মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

আবার দাদির সাথে খুনসুটিও হয়, দাদির আশকারাতেই কি মায়ের সাথে এধরনের বেয়াদবি হয় কিনা বুঝতে পারেন না রেহানা সুলতানা। শাশুড়ি তো তাকে আজকাল বেশ সমঝেই চলেন তাহলে টিয়ানা এতো সাহস পায় কোথায়? নিজের আত্মজা না হলে কি অবস্থা করতেন রেহানা সুলতানা নিজেও জানেন না কিন্তু হাত উঠাতে যেয়েও মাঝে মাঝে থেমে যান তিনি, এরপর কি করবে এই মেয়ে সেই কথা ভেবে। মেয়ে তো নয়, যেনো গোখরো সাপ। আজকাল টিয়ানা দেরি করে বাড়ি ফেরে, রোজ বাইরে যায়। শাশুড়ি সেদিন বলছিলেন, ভীষন উগ্র হয়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কেনো? যা চাইছে তাই তো দিচ্ছেন তিনি, তাহলে ওর সমস্যাটা কোথায়? টিয়ানার সাথে কথা বলবেন, ভাবছেন অনেকদিন ধরে, বোঝাতে হবে ওকে, কিন্তু সময়ই মেলাতে পারছেন না। এই তো সেদিনই দেখলেন জীনস আর শর্ট টপস পরা টিয়ানা কতোগুলো অদ্ভুত বেশভুষার ছেলের সাথে ফাস্ট ফুডের শপ থেকে বের হলো, একটি ছেলে আবার কায়দা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিয়ানার কোমরে হাত রেখেছে। দেখামাত্র মাথায় আগুন জ্বলে গেলো রেহানা সুলতানার কিন্তু তিনি তখন একটি জরুরি মিটিংএ যাচ্ছিলেন। তাছাড়া রাস্তায় সীনক্রিয়েট করার সাহসও হলো না, নিজের মেয়েই তো বশে নেই। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে টিয়ানাকে ওই ছেলের কথা জিজ্ঞেস করা মাত্র ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া টিয়ানা ঘাড় ত্যাড়া করে পুরো সাহেবী কায়দায় তাকে বললো, 'হোয়াটস ইউর প্রব মম', হোয়াই ডু ইউ বদার'? ইচ্ছে করছিলো ওই ঘাড়ে ঝোলানো পনিটেল টেনে নিচে শুইয়ে ফেলে কিন্তু টিয়ানার চোখ দেখে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেলো।

টিয়ানার সাথে তার বাদানুবাদের প্রায় প্রত্যেক সময়ই গলার রগ ফুলিয়ে বলে সে, 'মম, বাপি আর গ্র্যানীর কাছে যা পারো আমার সাথে সে চেষ্টাও করো না।' আজকাল মাঝে সাঝে দেখেন চোখ-মুখ কেমন যেনো টিয়ানার, ঘুমের কোনো ঠিক নেই, খাবারে কোনো রুচি নেই, না খেয়েই মেয়ে উঠে যাচ্ছে। ঘুমুচ্ছে তো পড়ে পড়ে সারাবেলা হয়তো ঘুমাচ্ছেই। অনেক সম্ভাবনার কথাই মাথায় আসে মাঝে মাঝে, গভীর ভাবে ভাবলে তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে, ওইসব ট্যাবলেট, ড্রাগস তো আজকাল হাতের কাছেই পাওয়া যায় অনেক দোকানে। কি করছে তার মেয়ে, কাদের সাথে মিশছে, কেনো? কি পায়নি তার মেয়ে নাকি সবকিছু হাতের কাছে পেয়ে যাওয়াই তাকে অবাধ্য করে তুলছে। মম-বাপি কিংবা ছোট ভাইয়ের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। সারাক্ষণ সে ব্যস্ত তার পার্টি, ডিসকো, পিকনিক আর হইচই নিয়ে। ভীষণ ডোন্ট কেয়ার মনোভাব তার আজকাল। এক সময় রিনিরিনে মিষ্টি গলায় কথা বলা টিয়ানা আজকাল কর্কশ গলা ছাড়া কথাই বলে না, এক সময় ক্লাশে ফার্স্ট হওয়া টিয়ানা আজ শুধু কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে ক্লাশ ডিঙাচ্ছে। কি চায় টিয়ানা রেহানা সুলতানা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কেনো বখে যাচ্ছে মেয়েটা?

রেহানা সুলতানার আজ সকালে বেরোনোর ভীষণ তাড়া ছিল কিন্তু ড্রাইভার জলিলের কোনো দেখাই নেই আজকে। এমনিতে সব সময় ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত থাকে জলিল কিন্তু বেছে বেছে আজকের এই শত কাজের দিনটিতেই তার দেরি। বারবার ইন্টারকমে ফ্ল্যাটের সিকিউরিটির কাছ থেকে খবর নিচ্ছেন জলিল এসে পৌঁছলো কি না। খুব অস্থির হয়ে তিনি ঘর আর বারান্দা করছেন। বাড়ির পাশেই ছোট বাচ্চাদের একটা স্কুল আছে, তাদের হল্লাগোল্লায় কান পাতা যাচ্ছে না, বিরক্তিটা চরমে উঠছে। অস্থিরতা কমাতে তিনি বুয়াকে বললেন এক কাপ চা দিতে। চা নিয়ে বসেছেন বটে কিন্তু আরো অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। ধানমন্ডির এদিকটাতে আজকাল এতো ভিড় আর জ্যাম যে আগে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়েও সময়মতো কোথাও পৌঁছানো যায় না আর আজ তো দেরিই হচ্ছে, কখন যে পৌঁছবেন তিনি। তিনি না পৌঁছলে অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হবে, তার অফিসের সবাই হয়তো তার রাস্তা চেয়ে বসে আছে, একটু পর হয়তো মোবাইল বাজতে থাকবে। কি করবেন কি করবেন স্থির করতে পারছেন না। সিকিউরিটি থেকে কাউকে পাঠানো যায় অবশ্য একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে কিন্তু আজ তিনিই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি, তিনি যাবেন ট্যাক্সিতে, তাও আবার বাসায় দু-দুটো গাড়ি রেখে। বিশ বছরের পুরনো বিশ্বস্ত ড্রাইভার জলিল যে কোনোদিন কাজে ফাঁকি দেয়নি, দেরি করেনি, আজকে হঠাৎ তার দেরি কেনো তিনি সে কথা ভাবছেন না, যে জলিল অসুখ নিয়েও কাজে চলে আসে, সে কোনো খবর না দিয়ে কেনো এতো দেরি করছে সে ভাবনা ছাপিয়ে তার বিরক্তিই প্রধান হয়ে উঠছে। আজকাল পুরনো কাজের লোকের উপরও আর আস্থা রাখা যায় না। কাউকে যে পাঠাবেন খোঁজ নিতে সে উপায়ও নেই। এমনিতে জানেন পান্থপথের কাছে কোথাও বস্তিতে ঘর ভাড়া করে জলিল থাকে কিন্তু কোথায় সে খোঁজতো জানেন না। তাছাড়া উনি কাজের লোককে বেশি লাই দিতে চান না, লাই পেলেই ওরা মাথায় উঠবে, আজ এই সমস্যা, কাল ওই সমস্যা নিয়ে আসবে তাই দূরত্ব বজায় রাখেন আর কাজের লোকদেরও নিজেদের মধ্যে মেশামেশি করতে দেন না, তাহলেই এরা দল পাকাবে আর ঝামেলা শুরু হবে। মুখে বিরক্তির রেখা নিয়েই অবশেষে ভাবলেন সালাম সাহেবকেই ফোন করবেন, অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়ার জন্য, দেরি যখন হয়েই গেছে তখন আর কি করা। সালাম সাহেবকে ফোন করতে করতে ভাবলেন আজ আসুক জলিল, তার একদিন কি ওর একদিন। কাল বলে দেয়া হয়েছে আজ যেনো ঠিক সময়মতো আসে সে। চেষ্টা করছেন না বিরক্ত হতে, মুখে বিরক্তির রেখা বসে গেলে ফটোটা হয়ত ততো ভালো আসবে না। আজকের দিনটাকে উপলক্ষ্য করে কি কম দৌড়াদৌড়ি হয়েছে রেহানা সুলতানার? শত ব্যস্ততার মাঝে গত রাতে পার্লারে গিয়ে ফেসিয়াল, ফেস পলিশ, ব্লীচ, সব করিয়ে এসেছেন, চুলের ডাইও ঠিক করে এসেছেন। আজকাল এতো মিডিয়ার প্রসার হয়েছে, টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, ক্যামেরায় ক্যামেরায় সয়লাব। ভালো না-দেখালে আবার মেয়ে রাগ করবে, আজকালকার মেয়েদের মুখও হয়েছে এতো আলগা, ফস করে যা মুখে আসবে বলে বসবে, গাল ফুলিয়ে থাকবে বন্ধুদের সামনে প্রেস্টিজ পাংচার বলে।

অবশ্য রেহানা সুলতানার নিজের বন্ধুরাও বলবে, তাছাড়া নিজেরও খারাপ লাগবে। কাজ কি, মাসে মাসে তো যেতেই হয় পার্লারে। তো এবার না হয় একটু তাড়াতাড়িই গেলেন। আজকাল তো শিফন আর জর্জেটই পরেন, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী দিবসের সেমিনারকে কেন্দ্র করে বেলী রোডের বুটিক ঘুরে ঘুরে ভালো দেখে নিজের উজ্জ্বল গায়ের রঙের সাথে মিলিয়ে কালো জমিতে কমলা পাড় আর বুটির তাঁতের শাড়ি কিনেছেন, এইসব দিবসে টিবসে এ ধরনের শাড়ির ইমপ্যাক্টই বেশি হয়। জিমে যেয়ে যেয়ে ফিগারটাও রেখেছেন দারুণ। বয়সের ছাপ পড়তে দেননি চোখে-মুখে, শরীরের কোথাও। ফিগার দেখলে কে বলবে উনি চল্লিশের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে আছেন?

তিরিশের মাঝেই অবস্থান ধরে রেখেছেন, অন্তত তিনি তো তাই ভাবেন। খাওয়া-দাওয়াও দারুণ কন্ট্রোল করেন, সব্জিই খাবার মেনুতে বেশি থাকে, তেল-ঘি কম দিয়ে। রান্নার লোককে ভালো করে বলেও দেয়া আছে সে কথা। শিফন আর জর্জেটে যতো ফিগার খোলে তাতের শাড়িতে তো আর তা না। কিন্তু কি লাভ হলো?

কালকের সেই আয়োজন তো জলিলের ফাঁকির কারণে প্রায় বৃথাই যাচ্ছে।

রেহানা সুলতানা নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সালাম সাহেবের অফিসের সরকারি গাড়িতে সভাস্থালে পৌঁছলেন। মোটামুটি তিনি সময় মতো সব জায়গায় যান তাই আজকে তার দেরি দেখে অনেকেই অবাক চোখে তাকালেন, মুখে ভদ্রতা করে বেশি কিছু বললেন না। যদিও রেহানা বেগম আগেই তার অফিসে ইনফর্ম করেছেন যে তার বেআক্কেল ড্রাইভারের জন্য তার এই দেরি। সভা আরম্ভ হওয়ার পর তার বক্তৃতার সময় তার এই অনভিপ্রেত দেরির জন্য তিনি অবশ্য সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন। সভা চলছে খুব জোরেশোরে। মুহূর্মুহূ হাততালি, গরম বক্তৃতা, আমন্ত্রিত অতিথিরাও খুব ভালো বলছেন মেয়েদের অধিকারের উপর। শুধু আইন করলে আর অধিকারের কথা বললেইতো চলবে না তার বাস্তবায়নও হতে হবে আজকের সমাজে, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। রেহানা সুলতানা তো ডাটাই দিয়ে দিলেন সারাদেশে গত বছর কতো মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে, কতোজন আইনী সাহায্য পেয়েছে। এর মধ্যে নারীকেন্দ্র কতোজনকে সাহায্য দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। শাড়ির খসখস, চুড়ির টুংটাং, মৃদু হাসির শব্দ, টুকটাক খোশগল্প বেশ এক উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করেছে সভাকক্ষে। দুপুরে আমন্ত্রিত অতিথি আর নারীকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের জন্য ছিল ঢাকা ক্লাবের স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানী আর বোরহানী, কর্মচারীদের সাধারণ লাঞ্চ প্যাকেট। সবাই রেহানা সুলতানার আয়োজনের প্রশংসা করতে লাগলেন। দুপুরে দারুণ উপভোগ্য এই সময়ের মাঝে টিয়ানার ফোন এলো মোবাইলে, জলিল এসেছে খবর দিতে। কাল রাতে জলিলের ষোলো বছরের মেয়ে রফেজা আত্মহত্যা করেছে।

টিয়ানা ফোনে রীতিমতো কাঁদছে আর বলছে রেহানা সুলতানাকে। রেহানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানা এসব আবেগে প্রচণ্ড বিরক্ত হন, জলিলের মেয়ের মৃত্যু নিয়ে এতো কাঁদার কি আছে টিয়ানার? সবসময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে কাজগুলো তিনি অপছন্দ করেন টিয়ানা বেছে বেছে সেই কাজগুলোই করে। সারাক্ষণ দাদির সাথে গুজগুজ, ফুসফুস, কাজের লোকদের ঘরের খোঁজ নেয়া, যত্তোসব। রেহানা সুলতানা ধমক দিয়ে বললেন, জলিলকে কিছু টাকা দাও, হয়তো ওর দরকার হতে পারে আর কান্না থামাও, এসব নিয়ে এতো কান্নার কি হলো? ওকে দু-এক দিনের ছুটি দিয়ে বিদায় করে দাও। হঠাৎ কান্না থামিয়ে টিয়ানা কঠিন গলায় বললো, মা, তুমি কি পারতে না রফেজার জন্য কিছু করতে? এজন্যই আমি তোমাকে এতো অপছন্দ করি মা, শুধু এজন্যই। টিয়ানার গলার কাঠিন্যতে কিছুটা থমকে গেলেন রেহানা সুলতানা। হঠাৎ মনে পড়ল হ্যাঁ টিয়ানা বলেছিল বটে জলিলের মেয়ের একটা সমস্যার কথা, কিন্তু এসব চাকর বাকরদের ব্যাপার নিয়ে বসে থাকলে তো আর তার চলে না। মেয়েকে দিয়ে তার কাছে সুপারিশ পাঠানোতে রেহানা সুলতানা বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন আর জলিলকে ডেকে রীতিমতো ধমকেই দিয়েছিলেন সেজন্য। এখন এতো ব্যস্ততার মাঝে টিয়ানার সাথে বচসা করার সময় তার নেই তাই তিনি ফোন কেটে দিলেন।

টিয়ানা ওদিকে পাথর হয়ে ভাবছিল এতো কঠিন কি ছিল মায়ের জন্য রফেজার পাশে দাঁড়ানো? মা রফেজার পাশে যাননি কারণ রফেজা খবরের কাগজের শিরোনাম হয়নি, যেখানে ক্যামেরা নেই, প্রেস নেই সেখানে মা সময় নষ্ট আর করেন না আজকাল। মাঝে মাঝেই স্কুলে যাওয়ার পথে জলিল ড্রাইভারের সাথে কথা হতো টিয়ানার। টিয়ানা ঘরের লোকদের খোঁজ খবর নিতো। তিন মেয়ে, দুই ছেলে, মা আর বউ নিয়ে জলিল ড্রাইভারের সংসার। একদিন জলিল ড্রাইভারকে বেশ বিষণ্ন মনে হচ্ছিল টিয়ানার, জিজ্ঞেস করেছিলো শরীর খারাপ করেছে কিনা? বাড়িতে কিছু হয়েছে কিনা? এমনিতে জলিল ড্রাইভার চুপচাপই থাকে কিন্তু সেদিন কেমন যেনো লাগছিলো টিয়ানার। জিজ্ঞেস করে জানলো বড় মেয়ে স্কুলে যায় পড়তে, পড়াশোনায় মোটামুটি সে খারাপ না। বিকেলে নিজের পড়ার ফাকে ফাকে টিউশনীও করে পাড়ার মধ্যে। বেশ অনেকদিন ধরেই পাড়ায় কিছু বখাটে তার মেয়েকে বিরক্ত করছিলো কিন্তু সেটা ছিল সহ্যসীমার মধ্যে। রফেজা মাথা নিচু করে চলে যেতো বলে সমস্যা আর বেশি দূর আগাতে পারেনি। এবার পৌরসভা নির্বাচনের জন্য কমিশনার পদপ্রার্থী ভদ্রলোক সেই বখাটেদেরকে তার পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন মোটা পয়সার বিনিময়ে।

নির্বাচনের সময় বখাটেদের সন্ত্রাস ও মাস্তানীতে সেই ভদ্রলোক জয়ী হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিশনার হয়ে গেলেন তার ওয়ার্ডের। ব্যস বখাটেদেরকে আর পায় কে? কমিশনারের পোষা কুকুর হয়ে তারা কমিশনারের সবধরনের কাজে তাকে সাহায্য করে। বিনিময়ে আইনের প্রশ্রয় আর মোটা টাকা। কমিশনারের খাস লোক হওয়াতে তাদের এখন এলাকা জুড়ে রাজত্ব, কে আটকায় তাদের। পুলিশও তাদের সমঝে চলে। হাতে কাঁচা টাকা থাকাতে দিনে দুপুরেই রাস্তায় মাতলামি করে, বেলেল্লাপনা করে, বস্তির লোকজন তাদের চাঁদাবাজি আর অন্যান্য কাজে অতিষ্ঠ হলেও কোমরে গোঁজা ওই যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে অসহায় চোখে চুপ করে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকে। এতোদিন মেয়েদেরকে শিস দেয়া কিংবা নোংরা মন্তব্য আর ইঙ্গিত দেয়ার মধ্যেই বখাটেরা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু কমিশনারের অবিরাম আশকারা তাদেরকে আরো বেপোরোয়া করে তুলল। সেদিন বিকেলে রফেজা যখন বাচ্চাদের পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল দুজন বখাটে তার হাত ধরে টানলে সে অতি কষ্টে তাদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে বাড়ি পালিয়ে এসেছে। যখন জলিল বাড়ি ফিরেছে রাতে বাবা বলে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে মেয়ে তার বুকে ছুটে এসেছে। বার বার কাঁদতে কাঁদতে বলছিলো, বাবা আমাকে বাঁচাও। জলিলও দিশেহারা হয়ে ভাবছিলো কি করা যায়? এতো বড় সংসার নিয়ে কোথায় যাবে?

গ্রামের বাড়িতে তো তেমন কিছু নেই উঠবেই-বা কোথায় আর খাবেই-বা কি? অন্য বাচ্চারা মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলে যায় তাদেরই বা সে কি করবে? আইনের রাস্তাতো রুদ্ধ। অনেক ভেবে ঠিক করলো মেয়ের টিউশনীর দরকার নেই, স্কুলেরও দরকার নেই। বাসায় বসে বসে পড়বে আর প্রাইভেটে এস.এস.সি দিবে। প্রাইভেটে দিলেও মেয়ে পাশ করবে। মোট কথা মেয়ের বাড়ির বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। রাতে রফেজার মায়ের সাথে একান্তে বুদ্ধি করলেন এরমধ্যে দেখে শুনে একটা ভালো পাত্র দেখে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে এই এলাকা থেকে সরিয়ে দিবেন। আপাতত এভাবেই চলুক। কিন্তু মন থেকে দুশ্চিন্তা তো আর দূর করতে পারলেন না। টিয়ানা শুনে বলেছিলো আপনি কিছু ভাববেন না ড্রাইভার সাহেব, মাকে আমি বলবো, মা সব ঠিক করে দিবে। মায়ের কতো চেনা জানা।

টিয়ানা রাতে মা বাড়ি ফিরতেই জলিল ড্রাইভারের মেয়ে রফেজার কথা বলতে লাগল, মা সব শুনে প্রচণ্ড ধমক দিলেন আর বললেন ড্রাইভারের মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে নিজের পড়ায় মন দিতে। এসব ফালতু ব্যাপার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে। টিয়ানার জিদের কাছে পরাস্ত হয়ে শেষে বলেছিলেন কমিশনারের সাথে কিংবা থানার সাথে কথা বলে দেখবেন। রেহানা সুলতানা এসব ঘটনাকে যেহেতু বেশি গুরুত্ব দেন না, যথারীতি তিনি ভুলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন আর নিজের কাজেই ব্যস্ত হয়ে গেলেন। সময় তো থেমে থাকে না। রফেজা গৃহবন্দী হয়ে ঘরের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইল। স্কুলের বন্ধু, পড়া, স্কুলের জীবন সবই ভুলে গিয়ে এই ছোট্ট ঘর, মায়ের কাজে সাহায্য, ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনাতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইল।

কদিন থেকেই ছোট ভাইয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সরকারি ডাক্তার ঔষধ দিয়েছেন কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন হচ্ছিল না। আজ সকালে মা কাজে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই ভাইয়ের শরীরটা অনেক খারাপ হতে লাগল, ভয় পেয়ে ভাইকে কোলে নিয়ে দৌড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ভাইকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছিলো, পথে রফেজা পড়ল সেই বখাটেদের কবলে। বখাটেরা বীর বিক্রমে এবার রফেজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাত ধরে টানাটানি, ওড়না ধরে টানাটানি, ছোট ভাই আর রফেজার ভয়ার্ত চিৎকারে পথের চারদিকে লোক জমে গেলো। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে রফেজার অপমানের কাহিনী কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসল না। ভয়ে সিটিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখল শুধু। বখাটেদের সাথে ধস্তাধস্তিতে কাপড় জামা ছিঁড়ে, রক্তাক্ত দেহে টলতে টলতে ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরল রফেজা। ভাইকে ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দিল খুব শান্ত ভঙ্গিতে। তারপর সারাদিন ঘরের সব কাজ সারল চুপচাপ, কারো সাথে কোনো কথা না বলে। আশে পাশের বাড়ি থেকে করুণা চোখে নিয়ে দু চারজন অবশ্য উঁকি দেয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রফেজাকে আজ যেনো কিছুই আর স্পর্শ করছে না। অপমানে সে যেনো আজ পাথর। দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে ছোট বেলা থেকে বড় হচ্ছে রফেজা। পড়াশোনা করবে, পরিবারের হাল ধরবে, ছোট ভাই বোনদের মানুষ করবে, সমাজে আর দশ জনের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচবে। এই বস্তি থেকে দূরে কোথাও ছোট্ট একটা বাড়ি হবে তাদের যার চারপাশ থাকবে সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা, বাবা-মা, দাদি আর বোনেরা মিলে বৃষ্টির রাতে টিনের চালে ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ শুনবে। বস্তির এই নোংরা পরিবেশ থেকে অনেক দূরে থাকবে তারা, মুক্তি দিবে সে তার পরিবারকে এই পরিবেশ থেকে। অনেক অনেক অনেক আপোষ করেছিল রফেজা তার স্বপ্নের সাথে। বাড়ি থেকে বেরোন নিষেধ, পড়াশুনা মোটামুটি বন্ধ, টিউশনী করে সংসারের জন্য যা আনতো সে রাস্তাও বন্ধ কিন্তু তারপরও উদ্যম হারায়নি রফেজা। কিন্তু আজকের এই গ্লানি সে নিতে পারছিল না। এতো বড় কলঙ্ক মাথায় করে তাকে বাঁচতে হবে, সাথে তার পরিবারকেও? রাতে বাবা যখন বাড়ি ফিরল, সব শুনল, বাবা-মেয়ে জড়াজড়ি করে খুব কাঁদল, তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হলো, এক সময় অনেক রাতে সবাই শুয়ে পড়ল। ঘরের সবাই বুঝতে পারছিল কেউ ঘুমায়নি কিন্তু সবাই ঘুমের ভান করে পড়েছিল। ভোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের দিকে সবাই বোধ হয় একটু তন্দ্রাতে জড়িয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল প্রতিবেশীদের চিৎকারে। ঘরের পাশের পেয়ারা গাছে নিজের গলার ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে আছে রফেজা। মাথা নীচু করে বাঁচার অপমান থেকে নিজেকে আর নিজের পরিবারকে চিরমুক্তি দিয়ে গেলো সে। মায়াবী চেহারার ষোড়শী রফেজা কি কুৎসিত ভঙ্গিতেই না এখন ঝুলে আছে।

জলিল জানতো আজ বেগম সাহেবার জরুরি দরকার হবে তাকে কিন্তু মেয়েকে অন্তিম শয্যায় ফেলে সে কি করে আসে! মেয়ে বেঁচে থাকতে তাকেতো ছায়া দিতে পারেনি, আজ মৃত্যুশয্যায় তাকে ছায়া দিয়ে রাখবে সারা বুক দিয়ে। যে পুলিশের কাছে জলিল নিজে কোনদিনও সাহস করে যেয়ে নালিশ জানাতে পারেনি, তারাই বাড়ি বয়ে এসেছে আজ রফেজার খোঁজ খবর নিতে, তার সাথে কথা বলতে। ওয়ার্ড কমিশনার সাহেবও এসেছেন তাকে সান্ত্বনা দিতে, জোর গলায় বললেন অপরাধীদের শাস্তি পেতেই হবে, এ মৃত্যু বৃথা যাবে না। সুরতাহাল করে মেয়েকে পুলিশ নিয়ে গেলো ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশকে জানতে হবে আজ এই মৃত্যুর রহস্য।

রফেজার মা আর দাদি অনেক কান্নাকাটি করলেন, মাথা খুঁড়লেন পুলিশের কাছে রফেজাকে কাটাকাটি না করার দোহাই দিলেন, কিন্তু আজ পুলিশ কর্তব্যে অনড়। মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার পর জলিল বাড়ি থেকে বেরোলেন। তার পরিচিত আর কেউ বেগম সাহেবার বাড়ি চিনে না যে এসে খবরটা দিয়ে যাবে, তাই জলিল দুপুরে বেরিয়েছে বেগম সাহেবাকে তার অপারগতার খবর জানাতে। আসার সময় দেখল পাড়াটা কি অদ্ভুত শান্ত আজকে, যেখানে বেঞ্চিতে বসে সেই ছেলেগুলো আড্ডা দিতো সে বেঞ্চিটা আজ বড় বেমানান ভাবে খালি পড়ে আছে, আর চায়ের দোকানেও যেনো লোক কম। যারা আছে তারা কেউ তার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না, কেমন যেনো চোরা চোখে তাকে দেখছে। জলিল সাহেব আছেন ভাবলেশহীন। হয়তো ভিতরে ভিতরে সারাক্ষণ ভেবে যাচ্ছিলেন বাবা হয়ে সন্তানকে সামান্য একটু নিরাপত্তাও যে দিতে পারলেন না, এই অপরাধ তার মেয়ে ক্ষমা করবেতো? শান্ত ধীর স্থির পদক্ষেপে তিনি যাচ্ছিলেন তার বেগম সাহেবার বাড়ির দিকে। বেগম সাহেবাও জানুক জলিলের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, কারো সুপারিশের আজ আর প্রয়োজন নেই।

নারী দিবসের সফল সেমিনারের আবেশ তখনও মনে গুনগুন করছে রেহানা সুলতানার, তাই রফেজার মতো নিতান্ত অবহেলিত কারোর এই করুণ মৃত্যুর খবর মনে কোনো রেখাপাত করল না। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন একজন প্রতিমন্ত্রী, তিনি অনুষ্ঠান শেষে বলে গেলেন তার স্পিচ খুবই চমৎকার হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে তার স্থান নিশ্চিত। একথা শোনার পর থেকে মনটা সে আমেজেই অনেকটা চাঙ্গা। তাছাড়া হাতে অনেক কাজ আরো বাড়ল বৈকি। মন্ত্রী মহোদয় হয়তো ভুলেই যাবেন তার কথা শত কাজের ভিড়ে, তাকে মনে করিয়ে রেখে রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাওয়ার পয়গাম নিশ্চিত করার হ্যাপাই বা কম কিসে? এই সুযোগটার জন্য কি রেহানা সুলতানা কম চেষ্টা করে চলেছেন আজ কবছর ধরে? কম কাঠখড় পোড়াচ্ছেন? অবশেষে সেই সোনার হরিণের নাগাল মিললো বলে মনে হচ্ছে। সোসাইটিতে খবরটা চাউর হওয়ার থ্রীলই হবে আলাদা। স্বপ্নে বিভোর হয়ে বারান্দার রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন কালকের নিউজ পেপারে তার স্পিচটা কি ঢং এ আসবে সেই কল্পনায়।

০৭.০৩.০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপালার ঘরে ফেরা

কদিন ধরেই অপালার মনটা বেশ বিষণ্ন, কিছুই যেনো ভালো লাগছে না। ঘর পালানো সুর আবার বেজে যাচ্ছে মনের মাঝে। অথচ মাত্র সামারেই দেশ থেকে ঘুরে এলো অপালা সপরিবারে, কিন্তু দুমাস না যেতেই এখনি আবার মনটা পালাই পালাই করছে।

অপালা কাজ করে না সে ঠিক আছে কিন্তু অপালার বরের তো চাকুরি রয়েছে। বেশ বড় পদে কাজ করেন অপালার স্বামী। হুটহাট ছুটি নেয়া তার পক্ষে কখনই সম্ভব না। এই এক বড় অসুবিধা অপালার, সারাক্ষণ বাড়ির জন্য, দেশের জন্য- প্রিয় বাংলাদেশের জন্য মন কেমন যেনো হু হু করতে থাকে। এমনিতে এক রকম এদিক-ওদিক বেড়ানো, পার্টি, হুল্লোড় করে আর দেশের সবার কথা ভাবতে ভাবতে প্রবাসের দিনগুলো কেটে যায় কিন্তু শীত এলেই আর যেনো সময় কাটতে চায় না এই স্ক্যান্ডেনেভিয়ান এলাকায়, কঠিন ভয়াবহ আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত যে জায়গা পৃথিবী জুড়ে। অন্ধকারের মাঝেই দিনের শুরু আর অন্ধকারের মাঝেই দিবা অবসান। মাঝে হয়তো একটু আলোর ঝলক এলো কি এলো না।

তাও এক রকম চলে যেতো বাধ সাধে সারাক্ষণ অপয়া বৃষ্টিটা, সারাক্ষণ ঝিরঝির ঝরেই যাচ্ছে, তার সাথে চলে সারাক্ষণ ঝড়ো হাওয়া, এতো তীব্র সে হাওয়ার গতি যে হাতের ছাতা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সে উড়িয়ে নিয়ে চলে। এভাবে চার মাস বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে ভাবলেই অপালার অস্থির লাগতে থাকে। ঠিক সেই সময়েই অপালার চোখে ভাসতে থাকে মায়ের হাতের তৈরি গরম গরম ভাপা পিঠার ছবি, ঠাণ্ডা খেজুরের সুরভিত রস, টি.এস.সির গরম সিঙ্গারা আর বাতাসে নাম না জানা ফুলের সুবাস নিয়ে আসা রোদ ঝলমলে দিন। নানা রঙের ফুল ফুটে আরো মায়াবিনী করে তোলে অপালার চিরচেনা ঢাকাকে।

অপালা নিজেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টাও করে, দেশে ঘুরতে যাওয়া তো আর সবসময় মুখের কথা নয় অনেক খরচেরও ব্যাপার। তাছাড়া অপালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীকে একা রেখে যাবে কি করে, তার দেখাশোনাটাই-বা কে করবে। কিন্তু তবুও মন ছুটে চলে সেই 'সবুজবেশের ঘুমের দেশে'। মনতো সবসময় যুক্তি দিয়ে চলে না। যুক্তির বসবাসতো মাথায় আর হৃদয়ের বসবাস বুকের গহীনে। তারপর একদিন ভিরু হৃদয় নিয়ে অপালা শীতে মেয়েকে নিয়ে দেশে ঘুরে আসার কথাটা স্বামীকে বলেই ফেলে।

প্রথমে অপালার স্বামী আপত্তি করলেও নাছোড়বান্দা অপালার কাছে হার মানতেই হয়। অনেক যুক্তি দেয় অপালা স্বামীকে মেয়েটা সেখানে শীতে ভালো থাকবে আর কবছর বাদে মেয়েকে স্কুলে দিতে হবে তখন তো এমন সুযোগ হবে না ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্বামীর 'হ্যাঁ' যখন মিললো তখন অপালার খুশি যেনো আর আটে না। অপালা পাখায় ভর দিয়ে উড়তে লাগল। দ্রুত দেশের সকলের জন্য কেনাকাটা সেরে স্যুটকেস গোছাতে বসল অপালা। অপালার যেন দিন কাটে তো রাত কাটে না।

সারাক্ষণ ভেবে চলছে কোথায় কোথায় ঘুরবে অপালা। টি.এস.সি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, বেইলী রোডে নাটক দেখা, ধিক্কিনিকে ঢাকার বাইরে কোথাও ঘুরে আসা, বাণিজ্য মেলা, নতুন হওয়া হেরিটেজ পার্কে যাওয়া আরো অনেক অনেক পরিকল্পনা বুনে চলছে অপালার উড়ে চলা মন।

শীতের ঢাকা যেনো টগবগে তরুণ যুবক, তারুণ্যের রূপছায়া অঙ্গে নিয়ে সবাইকে ডেকে যাচ্ছে। লালকৃষ্ণ-চূড়ার ছায়ায় ঢাকা 'ঢাকা' তখন আরো আকর্ষণীয় সর্ব রঙ্গে ও ঢঙ্গে। তারপর একদিন সেই লোভনীয় দিনটি এলো, উড়ল অপালা পাখি হয়ে নীল আকাশে মাতৃভূমির টানে। অনেক অনেক স্বপ্ন চোখে নিয়ে, অনেক ভালোবাসা বুকে নিয়ে নিজের জায়গায়। বেশ কাটছিল অপালার দিনগুলো শপিং, আড্ডা, ঘুরে-বেড়ানো, মা-বাবার স্নেহ নিয়ে। একদিন অপালা মহানন্দে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ অপালার ভাইয়ের ফোন এলো অপালার মোবাইলে, উদ্বিগ্ন অপালার ভাই বলল অপালা যেন এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যায়, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। ভীরু অপালা দ্রুত মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরল ভাবতে ভাবতে এই তো সব ঠিক ছিল, কি এমন ভয়ানক ঘটলো? বাড়ি ফিরে অপালা দেখতে পেলো সবার আতংকিত চেহারা টিভির পর্দার উপর। টিভিতে খবর আবারো বোমা হামলা, সবাই স্তম্ভিত। আবারো! আবারো!!! পর পর ঘটে চললো এই মর্মান্তিক ঘটনা। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল এক নাম না জানা আতংক। কোথায় যেনো ঘটে যায় কোন মুহূর্তে আবার অঘটন। সবার মাঝে কাজ করছে অবিশ্বাস। সবাই সবাইকে দেখছে সন্দেহের চোখে। যুদ্ধ কখনও অপালা দেখেনি কিন্তু যুদ্ধের গল্প শুনেছে, সেখানের শত্রুদের তো তবু চেনা যায় কিন্তু এরা যে একই দেশের, একই ভাষার, একই বর্ণের-গোত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক, এদের চিনবে কি করে লোকে? আগের দিনের যুদ্ধের তবু একটা যেনো তেনো কারণ দাঁড় করানো যেতো, অন্য ধর্ম বা রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্ত ারের জন্য, কিন্তু দেশের ভাইদের উপর স্বদেশীয়দের কি সেই আক্রোশ বা উন্মাদনা যা ভাই ভাইকে হত্যা করতে উদ্ধত করে তোলে? কোন সে ধর্ম যা মানুষকে মানুষ মারতে শেখায়?

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ ধর্মের নামে বলি হয়েছে, মানুষের জন্য ধর্ম না হয়ে কেমন করে যেনো ধর্মের জন্য মানুষ হয়ে যায়। বিষণ্নতায় ভরে গেলো এই ফুলে ফুলে সাজানো ধরনী শুধু অপালার নয়, সকলেরই। নাম না জানা আতঙ্ক স্থান করে নিলো নীল আকাশের উজ্জ্বলতা আর অবুঝ শিশুর বাবার জন্য ব্যাকুল কান্না ফিকে করে দিলো উতাল করা ফুলের সৌরভ।

অপালা ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি কিছুই বোঝে না, শুধু বুঝে নিরাপদে-নিশ্চিন্ত পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা। একি খুব বেশি চাওয়া এ পৃথিবীতে? কেনো অপালার মতো সাধারণ লোকেরা যাদের চাহিদা খুব সামান্য এভাবে অকালে প্রাণ দিবে? যারা আজ অকাতরে প্রাণ দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশেরই জীবন তো অনেক সহজ সরল স্বপ্ন আশাকে ঘিরে আবর্তিত। সাধারণভাবে জীবন যাপন করার জন্য, পরিবারের সকলের জন্য অন্ন যুগিয়ে মুখে হাসি ফোটানোই যাদের একমাত্র ধর্ম তারা কেনো অন্যের লোভের জন্য ঝরে যাবেন? ইহকালেই যারা চিরবঞ্চিত তাদেরকে মেরে 'পরকালেও' অনন্ত সুখের সন্ধান করছে কিছু লোভী মানব সন্তান, হায় সেলুকাস কি বিচিত্র এই পৃথিবী! লোভের যে আর নেই পরিসীমা। যেখানে আজ টেকনোলজির যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো মহাযুদ্ধে লিপ্ত সে জায়গায় পাঁচশ বছর পিছিয়ে থাকা মাতৃভূমিকে হাজার বছর পিছনে টানার চেষ্টা চলছে। অপালা ভাবে কত অর্থ তারা ব্যয় করছেন বোমা বানাতে, তারা কি পারেন না সেই অর্থ ঢেলে দিতে মানুষের খাদ্য যোগাতে? এই দেশেতেই তো মঙ্গায় না খেয়ে, শীতে কষ্ট পেয়ে কত লোক প্রাণ দিচ্ছেন। তাদের মুখে হাসি ফোটালে তাতে কি ধর্ম রক্ষা হবে না? মানুষের প্রাণ রক্ষার চেয়ে আর কি ধর্ম আছে বড় অপালা তা জানে না। এই ঐশ্বর্যের পাহাড় প্রাণ ধ্বংসকারী বোমা না বানিয়ে প্রাণ রক্ষাকারী খাদ্য, ওষুধের পিছনে উজাড় করে দিলে কি ধর্ম পালন হয় না? কিসের অভাব নেই এই আমাদের চিররুগ্ন, চিরদরিদ্র ভঙ্গুর দেশটিতে? সর্ব জায়গায় পরাজিত চিরঅপমানিত আমাদের এই মাতৃভূমি। তারপরও নির্লজ্জ আমরা দেশভক্তির গান গাই।

অপালাকে দেখে অনেকেই অবাক হন এ অসময়ে অপালা দেশে কি করছে? যারা এক সময় অপালার একা বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকা নিয়ে অনুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন, স্নেহমাখা কণ্ঠে মাথায় হাত রেখে বলতেন দুমুঠো ভাত তো যোগাড় হয়েই যাবে তবে অপালা কেনো সব্বাইকে ফেলে একা দূরদেশে পড়ে থাকবে? যত যাই হোক অপালার নিজের দেশেই ফিরে আসা উচিৎ, তারাই আজ অপালাকে মেয়ে নিয়ে শিগগির ফিরে যেতে বলছে নিরাপদ কোথাও। শুধু তাই নয় যেকোনো উপায়ে অপালা সাথে যদি আর কাউকে নিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাও যেনো করে। মাতৃভূমি আজ তার সন্তানদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। তাই দূরে কোথাও নিরাপত্তার সন্ধান করতে হবে-সে বাসন মেজেই হোক কিংবা ট্যাক্সি চালিয়েই হোক তবু বেঁচে তো থাকবে। মাঝে মাঝে অপালা মনে মনে একা ভাবে আর হেসে ফেলে 'কোথায় সেই কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা আজ এ বিশাল পৃথিবীতে?' অ্যামেরিকা, ইংল্যান্ড, স্পেনের মতো দেশেও তো ঘটে যাচ্ছে নারকীয় কাণ্ড কিন্তু তারপরও অপালা নিজের মনেই স্বীকার করতে বাধ্য হয় তবুও দেশের সাথে কোথায় যেনো একটা বিরাট পার্থক্য থেকে যায়। কোথাও বোধহয় আততায়ীরা চিহ্নিত হয়ে মজাসে বসে সাধারণ জনগণের দুর্দশা দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। এ যেনো হরর ফিল্মের ভ্যাম্পায়ার, আনন্দ উপভোগ করার জন্য চতুর্দিকে ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে মজা দেখছে। সেই কাণ্ডই যেনো চতুর্দিকে ঘটে চলছে।

আবারো বন্দী অপালা কিন্তু এবার প্রিয় মাতৃভূমিতে। এখানে নেই শীতের প্রচণ্ড কম্পন, নেই অবিরাম বরফ পড়ার সাথে ঝোড়ো হাওয়ার তান্ডব, নেই অবিরাম ঘড়ির কাঁটায় তাল মিলিয়ে ছুটে চলা ব্যস্ত জীবন কিন্তু তবু এখানে সবাই বন্দী অদৃশ্য কোনো শক্তির তাণ্ডবের কাছে। মধ্যদুপুরে সবুজ মাঠের ওপার হতে ভেসে আসে কোন রাখাল বালকের বাঁশিতে ঘর পালানো উদাসী সুর, কৃষ্ণচূড়ার লালের সাথে নদীর কলতান মিশে তৈরি করে বুকের মাঝে নাম না জানা এক কষ্টের, ইচ্ছে করে ছুটে যাই বাইরে দেখি আজ প্রকৃতি কিরূপ সেজেছে, আকাশ কেমন নীল কিন্তু কোথাও যেতে চাইলে হাজারো বারণ ছুটে আসে চতুর্দিক থেকে, 'যাস না, যাস না, কোথায় কখন কি হয় তার ঠিক নেই'।

এভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা মাথায় নিয়ে সারাক্ষণ কি করে লোকে বেঁচে থাকে? কোথাও দূরে শব্দ হলে সবাই চমকে চমকে উঠে আবার কি হলো? ছায়াঢাকা-মায়াঘেরা মাতৃভূমিতে সবাই আজ হাঁসফাঁস করছে দুদণ্ড স্বস্তির জন্য। অপালার স্বামীও খুবই উদ্বিগ্ন, তিনি ঘন ঘন ফোন করছেন অপালাকে ফিরে যাওয়ার জন্য। স্ত্রী-মেয়ের নিরাপত্তা তাকে ভাবাচ্ছে। আর কটা দিন পেরোলেই শুরু হবে নতুন বছর, বিশ্ব সংসারে আরম্ভ হবে নতুন হিসেব। সবাই ব্যস্ত নতুনকে আমন্ত্রণ জানাতে। অপালাও মনে মনে সারাক্ষণ প্রার্থনা করছে ' অনাগত নতুন দিন যেনো সবার জন্য নিরাপত্তা নিয়ে আসে।' দরিদ্র দেশের এই জনগন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতটুকু আনন্দের ছোঁয়াই বা পায়? তবুওতো তারা অসীম সাহসের সাথে জীবন নিয়ে যুদ্ধ করছে না পাওয়ার ব্যথা বুকে নিয়েই। নিরাপরাধ মানুষগুলোর বেঁচে থাকার অধিকারটুকু যেনো থাকে। অশ্রুসজল চোখ নিয়ে সবাইকে পেছনে রেখে অপালাকে আবার উড়তে হলো এই পাখির কূজন, সোনাঝরা আলো,শ্যামলিমার মায়া ছাড়িয়ে নিরাপত্তা নামক সোনার হরিনের সন্ধানে।

০৩.১২.২০০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড় আর নদীর গল্প

টিক টিক টিক শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনো শব্দ নেই এই মুহূর্তে। সারা বাড়িটাকে একটা মৃত্যু শীতল নীরবতা ছুঁয়ে আছে। এ বাড়িতে এখনো কিছু বেঁচে আছে, প্রাণপণে সেটা জানান দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছে হাবা এই ঘড়িটি। কোথায় কি হচ্ছে, বাড়িতে কার মনের কি অবস্থা, কিছুই বুঝতে পারে না, বোকার মতো কাঁটা ঘুরিয়েই যায় সারাবেলা। ভর দুপুর হলেও এঘরটাতে এখন সন্ধ্যা নেমে আছে যেনো আলোছায়ার খেলা। এই বসার ঘরটার সামনের জানালায় বসলে বাইরের রাস্তাটা সরাসরি দেখা যায়। আর জানালাটার ঠিক পাশেই গোলাপী বোগেনভিলার ঝাড়। ঝাড়টা বড় হয়ে গেলেই ঝুঁকে এসে জানালাটার অনেকটা ঢেকে দেয়। তখন বসার ঘরটা অনেকটা অন্ধকার দেখায়। এতে একটা সুবিধে হয়। রাস্তা থেকে ঘরটাকে আর সরাসরি দেখা যায় না, যদিও ঘর থেকে রাস্তাটাকে ভালোই দেখা যায়। জানালার উপর আছে গাঢ় মেরুন রঙের ভেলভেটের পর্দা। সকালটা যখন পেকে উঠেছিলো, তখন চোখে অনেক আলো লাগছিলো বলে পর্দাগুলো আধা আধা টেনে দেয়া হয়েছিলো। রিয়ার অবশ্য উজ্জ্বল আলো, অনেক রোদ খুব ভালো লাগে। অরণ্য আপত্তি করলেও রিয়া প্রায়ই লোক ডাকিয়ে বোগেনভিলার ঝাড় কাটিয়ে দেয়। অনেকদিন হয়ে গেলো বাড়িঘরের সাজসজ্জার দিকে তাকানোর কথাই মনে পড়েনি রিয়ার। অন্য একটা জগতে ছিলো যেনো সে। যা আগে একসময় সারাক্ষণ তার চোখে পড়তো কিংবা চোখে বিঁধতো, সেগুলো তার মনেই পড়েনি। সোফার পাশে একটা ইজি চেয়ার রাখা আছে, তাতে বসে বই পড়তে পড়তে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে অন্য জগতে হারিয়ে যাওয়া ছিলো এক সময় রিয়ার প্রিয় কাজগুলোর একটি। আনমনে রাস্তার লোকজনের ব্যস্ত হাঁটাচলা দেখতে কতো কি ভাবত সে। কিন্তু মাঝখানের দিনগুলো যেনো অন্যরকম ছিলো। ক্লান্ত হয়ে পড়া রিয়ার আজ কেনো যেনো হঠাৎ আলোর চেয়ে ছায়াটাকেই অনেক বেশি আপন লাগছে।

সাজগোজ, হাঁটাচলা বলায় সারাক্ষণ ভীষণ সতর্ক থাকা রিয়া এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলুথালুভাবে সোফার এককোণে চোখ বুজে পড়ে আছে। লম্বা চুলগুলো আজ আর কোনো বিশেষ ভঙ্গিমায় বাঁধা নেই, কোনো রকমে জমিয়ে একসাথে হাত খোঁপায় বন্দী। এক এক সময় মনে হচ্ছে ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে হয়তো কিছুটা আরাম হতো কিন্তু কান্নাও পাচ্ছে না। শুধু বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে ব্যথায়, মাঝে মাঝে এমন ব্যথা হচ্ছে যে ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছে না রিয়া। গলা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে আছে। এসময় স্বপ্নটাও কাছে আসছে না। কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে? বাচ্চা হলেও ঠিক টের পেয়েছে আজকের দিনটা, অন্যসব দিনের মতো আলো ঝলমলে দেখালেও কোথাও কিছু ঠিক প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিক নয়। আজ ছন্দহীন, সুরহীন একটা দিন। কাছে থাকলে স্বপ্নকে বলতো রিয়া, একগ্লাস পানি এনে দিতে। ছোট হলেও এসব খুঁটিনাটি কাজ স্বপ্ন ভালোই পারে। আর মা তাকে কোনো কাজের কথা বললে, সে খুব খুশি হয়, মা তাকে বড় ভাবছে, কাজের ভাবছে। সত্যিই বড় হচ্ছে সে। অথচ এই বড় হওয়ার জন্যই মা-বাবা যতো সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলুক-না-কেনো, যতো নিজেদেরকে স্বপ্নের সামনে চেপে রাখুক-না-কেনো, স্বপ্ন ঠিক টের পেয়ে যায়, কখন তাদের কাছে থাকতে হবে আর কখন নিজের ঘরে কার্টুন চালিয়ে, ছবি আঁকতে হবে। কখন মা ভাত দিলে চুপ করে গিলে গিলে খেয়ে নিতে হয় আর কখন মায়ের কোমর জড়িয়ে লাজানিয়ার বায়না করতে হয়।

কলেজের ডাকসাইটে সুন্দরী রিয়া, পড়াশোনায় ফার্স্ট-সেকেন্ড নাহলেও ভালো ছাত্রদের কাতারেই পড়ে। ভালো গান করে, কলেজের ছেলেরা তো বটেই, তরুণ শিক্ষকরাও রিয়াকে দেখে মনে মনে অনেক কল্পনার জাল বোনেন। গোলাপের পাপড়ির মতো ফিকে রঙের মসৃণ ত্বক, ছিপছিপে গড়নের, বাঙালি মেয়েদের চেয়ে বেশ অনেকটা লম্বা রিয়া এই তাকে করা বিশেষ খাতিরটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে যদিও মুখে কখনো কিছু বলে না। ঘন কালো চোখের তারায় সব সময় একটা হাসির ঝিলিক লেগেই থাকে। সে সুন্দরী, লোকে তাকে সুন্দরী বলে এটা নতুন কি? তারুণ্যের আনন্দে ভরপুর তার প্রতিটি মুহূর্ত। বাবা-মা অবশ্য অনেক দিন থেকেই একটা ভালো ছেলের সন্ধানে ছিলেন। রিয়ার মতো মেয়ের জন্য তো আর সুপাত্রের অভাব নেই তবুও বাবা মা যতোটুকু সম্ভব জেনে বুঝে আগাতে চান। পরে যেনো আফসোস করতে না হয়, আর একটু দেখে কিংবা দেরি করে দিলেই ভালো হতো। একদিন এক আত্মীয়র মাধ্যমে প্রবাসী পাত্র অরণ্যের জন্যে প্রস্তাব এলো, মেধাবী অরণ্য যে শুধু ভালো চাকুরিই করছে তাই নয়, দেখতেও দারুণ ভালো। মেধা, উজ্জ্বল পৌরুষদৃপ্ত চেহারা, পারিবারিক আভিজাত্য সব মিলিয়ে অরণ্যের মধ্যে অন্য একটা দ্যুতি খেলে সারাক্ষণ। অরণ্যের সাথে দেখা হতে শুধু বাবা-মাই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিয়াও মনে মনে বুঝতে পারলো এই সেই, যার জন্য দিনরাত তার এতো সাজসজ্জা, এতো ধ্যান।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক শুভক্ষণে দুই পরিবারের সবার আশীর্বাদ নিয়ে বিয়ে হয়ে গেলো রিয়া আর অরণ্যের। পাড়া প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়-স্বজন সবাই চোখ ট্যারা করে দোয়া করলেন আর ঘটা করে আয়োজন করা বিয়ের ভালো ভালো খাবার দাবারও পেট ভরে খেলেন। কেউ মুখে না-বললেও মনে মনে স্বীকার করলেন, জুটি হয়েছে বটে একটা, যাকে বলে রাজযোটক। যেমন বর তেমনি কনে। রূপকথার গল্পের মতো। সত্যিই তাই ছিল। কোথা দিয়ে সময় উড়তে লাগল অরণ্য আর রিয়া বুঝতেও পারল না। আজকে এখানে ঘুরতে যাচ্ছে তো কালকে ওখানে। শ্বশুর-শাশুড়ি, গুরুজন কেউ কাছে নেই, নেই কোনো বাধা নিষেধ, উদ্দাম আনন্দে কাটছে দিন। দুজন দুজনকে আবিষ্কারের নেশায় ব্যস্ত। প্রথম শারীরিক ভালোবাসার স্বাদে উন্মাতাল দুজনেই। রিয়া যা রান্না করছে তাই অরণ্যের মনে হচ্ছে, এমন ভালো রান্না সে আগে আর কখনো খায়নি। অরণ্য অফিস থেকে এসে রিয়াকে জড়িয়ে ধরলেই রিয়ার মনে হয়, এমন ভালো রিয়াকে কেউ আর এ জীবনে বাসেনি। জীবন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এর মধ্যেই দুরন্তপনা গড়িয়ে গিয়ে স্বপ্ন এলো রিয়ার কোল জুড়ে। নতুন আনন্দে ভরপুর রিয়া বসে গেলো ছেলে নিয়ে আলাদা পৃথিবী সাজাতে। ছেলে কি খাবে, কখন ঘুমাবে, তাকে গোসল দেয়া, ঘুম পাড়ানো এই করে এখন রিয়ার বেশির ভাগ সময় কাটে।

অতি মাত্রায় ক্যারিয়ার সচেতেন অরণ্য জানে অনেকদিন এক জায়গায় কাজ করাটা, তার ক্যারিয়ারের জন্যে ততোটা সুবিধাজনক নয়। চাকরি বদলে নতুন কোম্পনি আর সাথে নতুন শহরে চলে এলো সবাইকে নিয়ে। নতুন শহরে অরণ্য এবার বাড়ি কিনে নিলো। পরে আবার শিফট করলে বেঁচে দিবে এই ভেবে। আগে অফিসের ফার্নিশড ফ্ল্যাটে থেকেছে। আর এ হলো রিয়ার নিজের সংসার। সংসার পাওয়ার আনন্দে আর অন্য দশটি মেয়ের মতো সেও আজ মাতোয়ারা। কোন পর্দার সাথে কোন কালারের ফার্নিচার ম্যাচ করবে, বাগানে কোন কোন রঙের ফুলের গাছ লাগাবে সব নিয়েই সে রীতিমতো দিনরাত ছবি এঁকে যাচ্ছে। অফিসের বাইরের অনেকটা সময়ই অরণ্যকে আজকাল পড়াশোনার পেছনে দিতে হয়। চাকুরিতে উন্নতি করতে হলে, অধস্তনদের উপর অধিকার ফলাতে হলে, অনেক পড়াশোনা করতে হয় আজকাল। ঘন ঘন ট্যুর থাকে। রিয়ার অবশ্য তা নিয়ে তেমন অভিযোগ নেই, সবই তো অরণ্য তার আর স্বপ্নের জন্যে করছে। নতুন শহরে নতুন নতুন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে সময় কাটতে লাগলো রিয়ার। বাড়িটাও খুব সুন্দর। মনের মাধুরী ঢেলে প্রতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন্টিমিটার সাজাচ্ছে, সযতনে। অরণ্য খরচে কোনো বাধা দেয় না। বরং রিয়ার এই নিপুণতায় মুগ্ধ সে।

অরণ্যকে ঠকানোর কষ্টটা আজকাল রিয়ার মনে খুব বাজে। বিবেকের এই চাপ সে আর সহ্য করতে পারছে না। অনেক ভেবে সে ঠিক করল যাই হয় হোক, এভাবে আর না। সে সব অরণ্যকে খুলে বলবে, তারপর অরণ্য যে শাস্তিই দিক, তাই মেনে নিবে। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর অরণ্য স্বভাবমতো তার স্টাডিতে গিয়ে বসলো সেদিনও। রিয়া স্বপ্নকে শুইয়ে দিয়ে এসে অরণ্যের চেয়ারের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। পুরো বাড়িটা নিস্তব্ধ। রিয়া এ ঘরে আসার সময় হলের বাতিটাও নিভিয়ে দিয়ে এসেছে, আলো-পাগল রিয়া এখন যতোটা সম্ভব অন্ধকার চায়। মুখ লুকিয়ে আজ অরণ্যের কাছে তাকে আসতে হবে। আলোতে, অরণ্যের চোখে চোখ রেখে একথা কিছুতেই রিয়া তাকে বলতে পারবে না। এভাবে পায়ের কাছে নতজানু হয়ে রিয়ার বসে পড়া অরণ্যকে হতভম্ব করে তোলে। কি হয়েছে রিয়া? বলে রিয়ার মুখে হাত রাখতেই দেখতে পায় অঝোরে রিয়ার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছে। দ্রুত রিয়াকে তুলে পাশের সোফায় বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, টাকায় কথা হয়েছিল আজকে? রিয়া মাথা নিচু করেই ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়। আবার অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করলো, সব খবর ভালো সেখানে? রিয়া আবারো মাথা কাত করলে, অরণ্য বুঝতে পারে না তাহলে কেনো রিয়া এতো কেঁদে যাচ্ছে। আর কি হতে পারে। কি হয়েছে রিয়ার? শরীরে খারাপ কিছু বাসা বাধেনি তো কিংবা স্বপ্নের কি কিছু হয়েছে? অস্থির হয়ে অরণ্য ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। নিশ্চয়ই স্বপ্নকে নিয়ে কিছু। সংসারের কোনো খবরই তো সে রাখে না। সব বেচারী রিয়া একা সামলায়। সংসারে সময় দেয় না বলে এখন তার নিজের ওপর রাগ লাগতে লাগলো। সাথে সাথে অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে রীতিমতো ঘামতে লাগলো।

অনেকক্ষণ কেঁদে আর বার বার অরণ্যের অস্থির প্রশ্নের মধ্যে রিয়া এক সময় বলে ফেললো, 'I'm in love with someone else'. প্রথমে কিছুক্ষণ অরণ্য বুঝতেই পারলো না রিয়া আসলে কি বলছে। এতোই অপ্রত্যাশিত এই কথাটি তার জন্য যে কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো তার বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। কিন্তু কথাটি বলে ফেলতে পেরে রিয়ার বেশ হালকা লাগছে। চুপচাপ চারধার, একই ঘরে বসা দুটো প্রাণী নিজেদেরকে পরবর্তী পর্বের গুছিয়ে নিয়ে তৈরি হচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর এবার অরণ্য সরাসরি রিয়ার দিকে চোখ রেখে প্রশ্নের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো। রিয়া চোখ না-তুলেই বুঝতে পারলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরণ্যে অপেক্ষা করছে তার বক্তব্যের। মুখ নিচু করেই রিয়া কথা বলে গেলো। একটি প্রশ্নও করেনি অরণ্য তাকে একটিবারের জন্য, একবার থামায়নি কথা বলার সময়। হঠাৎ রিয়ার মনে হলো, সব শুনছে তো অরণ্য? মুখ তুলতেই রিয়া ভয় পেলো, অরণ্যের মুখ পুরোই ছাই রঙের, বুকে হাত চেপে দাঁড়িয়ে আছে সে। রিয়া দৌড়ে এসে ধরতেই ধপাস করে অরণ্য সামনের সোফায় বসে পড়েন অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল পানিই, পা-নি-ই। দৌড়ে রিয়া পানি আনতেই অরণ্য ঢকঢক করে সেটা এক নিশ্বাসে খেয়ে নিলো। একটুক্ষণ চুপ থেকে কথা বলার শক্তি অর্জন করে রিয়াকে বললো, তুমি শুতে যাও। রিয়া আস্তে জিজ্ঞেস করলো, তুমি শোবে না। অরণ্য, হুম। বিছানায় শুয়ে রিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো কিন্তু অরণ্য এলো না শুতে। অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো রিয়া। সকালে এ্যার্লামের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে অভ্যস্ত হাত অরণ্যকে খুঁজলো। না পেয়ে উঠে বসতেই মনে পড়লো কাল রাতের কথা।

পায়ে পায়ে নিচে স্টাডিতে যেয়ে দেখে অরণ্য ঠায় বসে আছে সেই সোফাটায়। আজ পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে তাদের, অরণ্য বাড়ি থাকলে কোনোদিনও তারা আলাদা শোয়নি কোনো কারণেই নয়। বিয়ের পরে আজ প্রথম এভাবে তাদের রাত কাটল। অরণ্য খুব নিয়ম মেনে চলতে ভালোবাসে। যতো ইন্টারেস্টিং বইই হোক না কেনো কিংবা ডিস্কোভারীতে নতুন কিছু রাত দশটার মধ্যে সে বিছানায় চলে যাবেই। আজ নির্ঘুম রাত পার করে দিলো সে। রিয়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে অরণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপর রোজকার মতো ফ্রেশ হয়ে অফিসে চলে গেলো। একটু পরেই সুজনের ফোন এলো রিয়ার মোবাইলে। অরণ্য বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে জানে। সেভাবেই মর্নিং কল দেয় সুজন রিয়াকে। সমস্ত ঝড় একা মোকাবেলা করে পর্যুদস্ত রিয়া সুজনের গলা পেতেই ডুকরে কেঁদে উঠলো। হড়বড় করে বলে দিলো, সে অরণ্যকে সব বলেছে। সুজন বেশ রেগেই গেলো এটা শুনে। কয়দিন ধরেই রিয়া যখন পাপ-পুণ্য, নৈতিকতা-অনৈতিকতা নিয়ে কথা বলছিলো, সুজন তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে এগুলো আসলে কথার কথা। দুজন মানুষ দুজন মানুষকে ভালোবাসলে এরমধ্যে পাপ কিছুই নেই। রিয়াকে আরো ঘনিষ্ঠ করে তার কাছে টেনে নিয়ে বলেছে, মানুষকে ভালোবাসা কখনো পাপ না। ভালোবাসার কোনো সময়-অসময় নেই, যেকোনো পরিস্থিতিতেই মানুষ যে কারো প্রেমে পড়তে পারে। নিজের স্ত্রী-পরস্ত্রী এগুলো সবই মানুষের সৃষ্টি করা ভুল ধারণা মাত্র। এ নিয়ে অপরাধ প্রবণতায় ভোগারও কিছু নেই আর অরণ্যকে জানানোরও কিছু নেই। ভয়ে ভয়ে তখন রিয়া জিজ্ঞেস করেছে, তাদের দুজনকে তো বাইরে অনেকেই দেখেছে। কেউ যদি বলে দেয়, অরণ্য রিয়াকে জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে তখন কি হবে? রিয়ার চোখে মুখে ঠোঁটে আদর করে আঙুল ছুঁইয়ে দিতে দিতে বলেছে, অস্বীকার করবে, স্রেফ অস্বীকার করে যাবে। রিয়া বুঝতে পারে না, দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ নিজেদের ইচ্ছায় নিজেদের ভালোবাসছে, তাহলে কেনো সব্বাইকে মিথ্যে বলে ঠকাতে হবে? কেনো সত্যি সত্যি বলা যাবে না।

এতো নিষেধের পরেও রিয়া অরণ্যকে সব বলে দেয়াতে সুজন রেগে ফোন কেটে দিলো। রিয়া বুঝতে পারলো না, কি হলো ব্যাপারটা। ভাবলো লাইন কেটে গেছে হয়তো। রিয়া পাগলের মতো সুজনকে ফোন করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই সুজন ফোন তুলছে না। মিটিং, জরুরি কিছু? মেইল করল তাড়াতাড়ি, লিখল মিস ইউ বেবি, কল মি ব্যাক, এজ আরলি এজ পসিবল। সারাদিন একটু পর পর মেইল চেক করলো কিন্তু সুজনের কোনো পাত্তা নেই সারাদিন। এভাবেই কিছুটা সুস্থতায় কিছুটা অসুস্থতায় দিন কাটলো রিয়ার। বিকেলে অরণ্য এলো অফিস থেকে। সবাই একসাথে ডিনার করলো যেন সবকিছু এ বাড়িতে চরম স্বাভাবিক। অরণ্য টুকটাক সংসারের কেজো কথার বাইরে কোনো কথা রিয়ার সাথে বললো না। স্বপ্নের সাথে সে স্বাভাবিক রইলো। রাতে সে স্টাডিতে ঘুমালো। এভাবে তিনদিন গেলো। মৃত্যুযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রিয়া সুজনের ব্যবহারে হতভম্ব। সে কি মরে গেলো না বেঁচে আছে সে খোঁজও কি করবে না সুজন? দিনের মধ্যে পাঁচবার রিয়ার গলা না-শুনলে সুজন চার্জ্জ হতো না, কোনো কাজের এনার্জি পেতো না। বলতো থাকা সে একদম নিপাত্তা। এদিকে অরণ্যের কাছ থেকে কঠিন শাস্তি কিংবা কটু কথা কিছুই আসছে না, যেনো বরফ শীতল এক মানুষ। শনিবারে আর সহ্য হলো না, অরণ্যের কাছে আবার গেল রিয়া।

জিজ্ঞেস করলো, কি করবো অরণ্য?

অরণ্য জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে শান্ত গলায় বলল, কি করবে তুমি, তোমার সেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়ইতো আমি আছি রিয়া। তুমি জানাও তুমি কি চাও।

আমি জানি না অরণ্য, আমি জানি না। আমার মন আমার বশে নেই। আমি কি করবো? কেঁদে কেঁদে রিয়া বলতে লাগল, আমি তোমাকেও শ্রদ্ধা করি, স্বপ্নকে ছাড়া আমি আমার জীবন কল্পনা করতে পারি না কিন্তু তবুও আমার মনকে আমি বেঁধে রাখতে পারছি না

রিয়ার কান্নাতে অবিচল থেকে অরণ্য বলে উঠলো, চলে যাও তুমি, দু-নৌকায় পা দিয়ে চলবে না রিয়া। মন আর শরীরকে একসাথে করে যাও। একজনকে শরীর আর একজনকে মন, ছিঃ রিয়া।

এবার রিয়া স্বামীর ভালোমানুষীতে কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো, তার সাথে আমার শরীর-মন সবকিছুরই মিলন হয়েছে অরণ্য। আমি শুধুই আর তোমার রিয়া নেই গো...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতবিহ্বল অরণ্য উঠে এসে রিয়ার হাতদুটো ধরে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কেন রিয়া কেন? কি কমতি ছিল আমার মধ্যে? কি সেটা তুমি অন্যের মাঝে পেলে যা আমার মাঝে ছিল না? তোমাকে অদেয়া কি ছিল আমার রিয়া?

মাথা নিচু করে হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে রিয়া বলে গেল স্বগতোক্তির মতো তোমার কোনো দোষে এটি হয়নি অরণ্য, হয়েছে আমার জন্যেই। আমিই পারিনি নিজেকে সামলে রাখতে।

কিন্তু কেন? আমাদের মাঝে তো ভালোবাসার কোনো ফাঁক ছিল না? কোনো উষ্ণতা কমে গেল, কিভাবে আমি টেরই পেলাম না? কি করে রিয়া? কি করে? অরণ্য সমানে রিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে গেল।

কি করে সেটা বলবে কোন্ মুখে রিয়া? অগাধ বিশ্বাস রিয়ার ওপরে অরণ্যের। রিয়া যখন ইচ্ছে যেখানে যাচ্ছে, পার্টিতে, ডিস্কোতে। কোনো বাধা নেই, কোনো টোকা নেই, রোখা নেই। সুন্দরী অরক্ষিত রিয়ার সাথে তখন অরণ্যের আড়ালে একটু আধটু অনেকেই ফ্লার্ট করছে। এদিক সেদিক অনুষ্ঠানে রিয়া গান গাইছে। প্রচণ্ড সুনাম সমাজে তখন তাদের। সুন্দরী গুণী বউ আর প্রতিষ্ঠিত স্বামী। সেরকম এক গানের অনুষ্ঠানে সুজনের সাথে দেখা। তারপর প্রায় ঘন ঘন এদিকে সেদিকে দেখা হতে লাগল। সুজন নানা জায়গায় অনুষ্ঠানে ছুতো করে রিয়ার সঙ্গী হতে লাগলো। বিশেষ দৃষ্টিতে সে রিয়ার দিকে তাকাত। রিয়ার গান, সাজ, রান্না, ঘর সাজানো ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করত। রিয়া যে সুজনের মনের ভাব বুঝতে পারতো না একেবারে তা নয়। প্রথম দিকে সেটা সে উপভোগ করত। ভাবত নির্দোষ এই আকর্ষণে আর কিইবা ক্ষতি হতে পারে? তার আর অরণ্যের মাঝে কোনো ফাঁক নেই যা গলিয়ে তৃতীয় কেউ তাদের মাঝে আসতে পারে। কিন্তু সেই আকর্ষণ এক জায়গায় থেমে থাকেনি। অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ার বাইরে আস্তে আস্তে মোবাইলে কথা, গল্প, মেসেঞ্জারে চ্যাট। একসময় রিয়া অনুভব করলো পুরোটা ব্যাপার আর একতরফা নেই। আর সমস্ত কথা নিছক বন্ধুতেই আবদ্ধ নেই। রিয়া তবুও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে অটুট। মনকে প্রবোধ দিতে লাগলো, বন্ধু কেউ থাকতেই পারে, নিছক বন্ধুত্ব নিয়ে সে বেশি ভাবছে।

মাঝে মাঝে নানা কারণে সুজন খুব ক্যাজুয়ালি রিয়ার হাত ধরতে লাগল। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিত, নাক টিপে দিত। প্রথম দিকে রিয়ার একটু কেমন গায়ে শিরশিরানি হলেও সে স্বাভাবিক ভাব করারই চেষ্টা করত। কিন্তু যেদিন ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো, ধরেই রাখলো যতোক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ না-হয়ে আসলো, তখন রিয়া অনুভব করল ভাসতে ভাসতে সে অনেক দূর চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে। এ জবরদস্তি রিয়ার খারাপ তো লাগেইনি বরং বেশ ভালোই লাগল, মনে হল সে যেন আজীবনের তৃষ্ণা নিয়ে এ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রথমে কদিন সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া চলছিল। চোখে, কপালে, নাকে, ঘাড়ে, গলায়, গালে। কিন্তু রিয়ার সারা শরীর উন্মুখ হয়ে থাকতো আর কিছুর জন্যে। মনে মনে অধীর অপেক্ষায় সে প্রহর গুনতো যদিও সুজনকে সামনাসামনি সে কপট রাগ দেখাত। এ অনুভূতি যেমন সত্যি আবার সুজন পাশে না-থাকলে এক গভীর অপরাধবোধের বিষণ্নতায় আক্রান্ত হতো সে। সেটাও সমান সত্যি। কিন্তু সুজনের আকর্ষণকে সে উপেক্ষা করতে পারত না। চেষ্টা যে করেনি তা নয়। ফোন বাজলে ধরবে না ভেবে রেখেও ধরে ফেলে, মেইলের উত্তর দিবে না দিবে না করেও দিয়ে ফেলে। নিষিদ্ধ এই আকর্ষণকে উপেক্ষা করার চেষ্টায় নিজেকে ফালা ফালা করে কিন্তু সুজন সামনে এসে দাঁড়ালেই সব চেষ্টার গোড়ায় জল।

সেরকমই মেঘ-রৌদ্রের আলোছায়ার দিনে সুজনের সাথে ছল কপটের খেলায় আর নিজেকে সে ধরে রাখতে পারেনি। নিজেকে উজাড় করে সুজনের কাছে সমর্পণ করল। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল অব্দি রিয়ার শরীরের প্রতিটি লোমকূপে সুজন অত্যন্ত যত্নের সাথে নিজের ভালোবাসার মোহর এঁকে দিল। রিয়ার ব্যাকুল তৃষ্ণায় সুজন তার এক কলসি জল ঢেলেও কুলোতে পারছিল না। রিয়া আরো ব্যাকুল, আরো কামার্ত আরো হিংস্র। রিয়ার বুকে, নাভিতে, কোমরে, পেটে সুজন মুখ ঘষেই যেতো। শিহরণে গলিত রিয়া আশ্লেষে সুজনের কান কামড়ে ধরতো, ঘাড়ে নাক ঘষতে থাকতো। ভালোবাসার নিরন্তর এ খেলায় রিয়া কিংবা সুজনের কোনো ক্লান্তি ছিল না। সুজন কাছে এলে চলত তার পাগলামি, চলে গেলেই শুরু হতো অনুতাপ। কিন্তু কোনো মুখে বলবে সেসব অরণ্যের কাছে। রিয়া নিজের অন্তরে জানে তার প্রতি ভালোবাসা, যত্নে অরণ্যের কোনো ফাঁক ছিল না। যতো দুর্বলতা, পাপ সব রিয়ার মাঝে। কিসের অভাব ছিল তার, কি বলবে অরণ্যকে সে? না, কোনো অভাবে নয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই আগুন সুজনের কাছে রিয়া মোম হয়ে গলে গলে পড়েছে। সুজনের পাগলামির মত্ততায় সে শুধু ভেসে গেছে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে অরণ্য বললো রিয়াকে, চলে যাও রিয়া তুমি চলে যাও তোমার ভালোবাসার কাছে। স্বপ্নকে নিয়ে ভেবো না। আমি ওকে ঠিক সামলে নিব। যখন চাইবে স্বপ্নকে তুমি দেখতে পাবে। কিন্তু এভাবে আমি তোমাকে চাই না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার আনন্দই আমার সুখ রিয়া। বুকে যতো কষ্টই থাকুক অরণ্যের, সে নিজের কষ্টের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রিয়াকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি দিল।

রিয়া অল্পক্ষণ চুপ থেকে সুজনকে মেইল আর এসএমএস পাঠাল, সুজন আমি স্যুটকেস গুছিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। এসো তুমি তোমার রিয়াকে নিয়ে যাও আজ। যে ক্ষণটির জন্যে তোমার এতো অপেক্ষা ছিল, সে মুহূর্তটি আজ এসেছে, এসো তুমি। তুমি তোমার রিয়াকে একান্ত আপনার করে পাবে আজ থেকে। আমি শুধুই তোমার।

এতো ভালোবাসে যে সুজন তাকে, সে এলো না আজ! শূন্য দৃষ্টিতে মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়ে আছে রিয়া, না কোথাও কোনো মিসড কল কিংবা এসএমএস নেই। প্রতি দশ মিনিটে এসএমএস করা সুজন আজ তাকে দিনভর একটি মেসেজও পাঠায়নি। নেই সেটা রিয়াও জানে, সুজনের প্রত্যেক ডাক যেনো শুনতে পায় সেজন্য সে তার মুঠোফোনের রিঙ্গার সবচেয়ে ওপরে তুলে রেখেছে। ফোন বেজে ওঠা মাত্র সে শৃঙ্গাররতা হরিণীর মত ছুটে এসে ফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। রিয়াকে ছাড়া কতো কষ্টে কাটে সুজনের সারাবেলা, সেকি রিয়া জানে না। তাই তার মেসেজের জন্য সুজনকে যেনো অপেক্ষার প্রহর না-কাটাতে হয়, মেসেজের এ্যালার্ম টোনটা তাই কন্টিনিউশনে দিয়ে রেখেছে। যতোক্ষণ রিয়া মেসেজ ওপেন করে না পড়বে ততোক্ষণ এ্যালার্ম বেজেই যাবে।

একদিন, দুদিন, চারদিন, দশদিন রিয়া মনে মনে অপেক্ষা করে থাকে। সুজন আসবেই, আসবে। পাগলের মতো ভালোবাসার সেই উত্তাল সব মুহূর্ত, সেগুলো তো সব মিথ্যে ছিল না। প্রতিটি দিন তার কাছে এক যুগের মতো লম্বা মনে হয়। কখনো কোনো কিছুর জন্য এভাবে অপেক্ষা করে থাকেনি। অপেক্ষার জ্বালা তার অজানা ছিলো। আরো অনেক কিছুই হয়তো ছিল অজানা। নিজ থেকে হ্যাংলার মতো সুজনকে আর ফোন করবে না রিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে। কিন্তু সুজন কি হারিয়ে গেলো নাকি তাকে ভুলিয়ে দিল? রিয়ার পৃথিবী থেকে সুজন একেবারে যে নাই হয়ে গেল। অরণ্য খুব স্বাভাবিকভাবে অফিসে যায় আসে, স্বপ্নের সাথে খেলে, সুর তাল না-থাকলেও রিয়ার সাথে এক রকম স্বাভাবিকভাবেই সংসারের কেজো কথাবার্তা বলে যায়।

এক মাস কেটে গেলে রিয়া এক ছুটির দিনে দুপুরবেলা অরণ্যের স্টাডিতে যেয়ে বসে।

অরণ্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে, অসহায় রিয়া নিরুপায় গলায় জিজ্ঞেস করে, আমি তাহলে এখন কি করবো?

যতোটা সম্ভব গলাটাকে নিস্পৃহ রেখে অরণ্য জানতে চাইলো, সেটা তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক করবে, কি করতে চাও তুমি?

অরণ্যের ভাবলেশহীন এই ভঙ্গিতে হঠাৎই রিয়ার খুব কান্না পেয়ে গেলো। কিন্তু চোখের পানি ও কিছুতেই অরণ্যকে দেখতে দিতে চায় না। কান্নার দমকে শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেও, গলাটাকে যতোটা সম্ভব পরিষ্কার করে বলল, আমি বরং দেশে ফিরে যাই, এখানে তো আর কোনো কাজ পাবো না। পড়াশোনা শেষ করিনি, অনেকদিনের ব্রেক অব স্টাডি।

ঠাণ্ডা গলায় অরণ্য বললো, দেশে গেলে কাজ পাবে?

মরিয়া রিয়া বললো, তাহলে?

অরণ্য উঠে এসে রিয়ার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, স্বপ্নকে ছেড়ে থাকতে পারবে রিয়া?

এবার আর কান্না বাঁধ মানলো না। ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলো রিয়া।

অনেকক্ষণ কাঁদতে দিল রিয়াকে, তারপর অরণ্য বললো, সব ভুলে যাও, ভাবো কোনো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলে।

আর তুমি কি করবে, প্রশ্ন করলো রিয়া।

আমিও ভুলে যাবো সব, স্বপ্নের জন্যে, তোমার জন্যে, আমাদের সবার জন্যে। ভুল ত্রুটি মানুষই করে। ক্ষমাও মানুষ করে।

AMARBOI.COM

আস্তে আস্তে দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস পার হয়। ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। রিয়ার সংসারে আবার প্রাণের হাওয়া লাগছে। ছন্দ ফিরে আসছে। রিয়া ব্যস্ত স্বপ্নকে স্কুলের হোমওয়ার্ক করাতে, ফুলদানিতে নতুন ফুল সাজানো নিয়ে, তানপুরায় সুর সাধতে। অরণ্যের যত্ন আত্তিতে। সুজনের জ্বর থেকে নিজেকে সে বহু কষ্টে সামলে নিপুণা গৃহকর্মীর মতো আবারো সংসারে মন দিয়েছে। লড়ে যাচ্ছে আপ্রাণ নিজের মতো করে বাঁচার জন্য। তার ভালবাসার এমন নিখাদ অপমান যে করেছে তার কথা না ভাবার, তাকে ভুলে যাবার। নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ভালোবেসেও যখন প্রতিদান শূন্য, তখন আপনা থেকে মন হিসেব কষতে বসে। কি দিয়ে কি পেলো। যতোই হাজারবার মনকে চোখ রাঙিয়ে বলা হোক না কেনো, আমি তো কিছু পাওয়ার জন্য ভালোবাসিনি, কিংবা আমি তো কোনো দাবি রাখিনি, তবুও অন্য মনটা বাঁধন না-মেনে বলে চলে, আমার কি দোষ ছিলো? আমি কেনো ভালোবেসে ঠকবো?

এই হিসেব-নিকেষ পর্ব চুকিয়ে দিয়ে রিয়া অপমানের গ্লানি ভুলে সোজা হয়ে ওঠার পর এক অলস দুপুরে কৌচে গড়াচ্ছিল। দুপুরের ঘুম তাড়াতে ব্ল্যাক কফি নিয়ে আনমনে বসে টিভির রিমোট কন্ট্রোল চাপছিল। দেখছিল না কিছুই এ চ্যানেল থেকে ও চ্যানেলে ঘোরাঘুরি করছিল। চোখ তার টিভির পর্দায়, মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার অন্যকোথাও। হঠাৎ সামনের টেবিলে রাখা তার সেলফোনে সেই পরিচিত সুর বেজে গেল। বিস্ফোরিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো রিয়া, হ্যাঁ তাই তো। গ্রীন স্ক্রীনে জ্বলছে নিভছে 'ডোন্ট কল হিম'...। হতভম্ভব রিয়া। রিয়া অনেকবার ভেবেছে কখনো কোথাও হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে নিজেকে অনেক শক্ত রাখবে সে। কিছুতেই আর নরম হবে না, পিছনের দিকে তাকাবে না। তার জীবন শুধু অরণ্য আর স্বপ্নেই আবর্তিত হবে। ভুল একবারই যথেষ্ট। একবার বাজলো ফোন, দুবার বাজলো, রিয়া উঠালো না। কিন্তু তার শরীরের রক্তকণায় কিসের যেনো অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। সারা গায়ে এক অজানা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। তিনবারের বেলায় আর পারলো না, ফোন তুলে বললো, হ্যালো...।

০৯.০১.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~